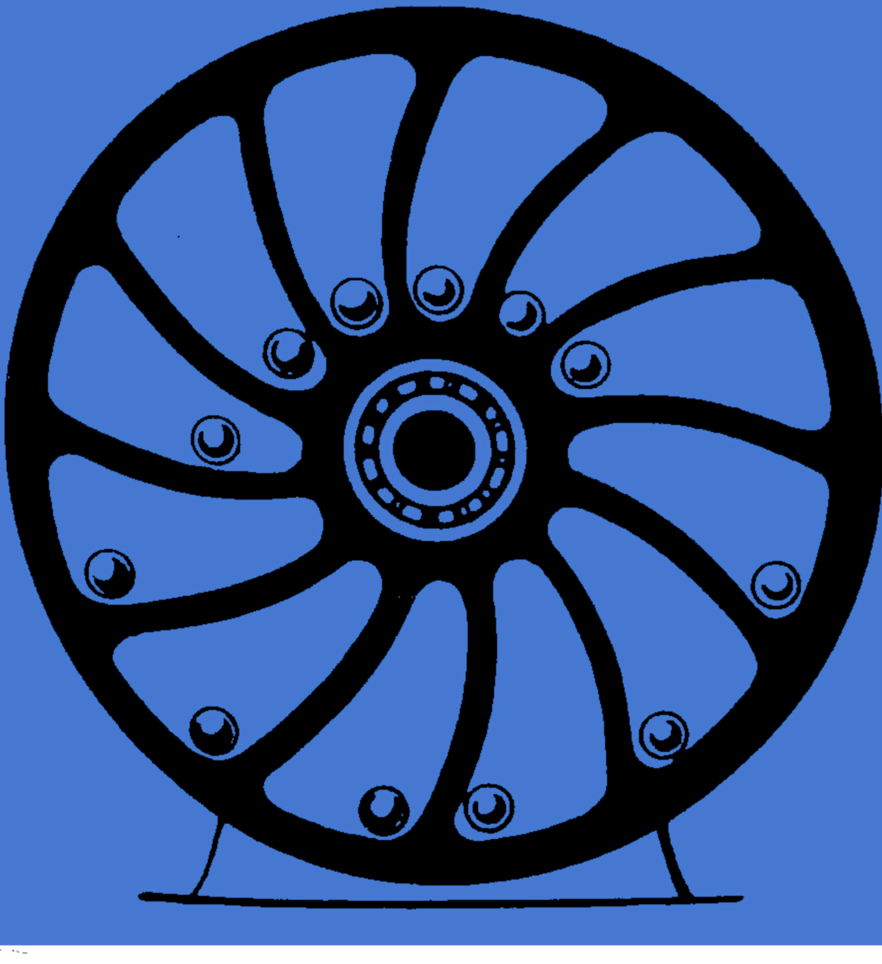
ইয়া. পেরেলমান

পদার্থবিদ্যার মজার কথা



2



পদার্থবিদ্যার মজার কথা

Я.И. Перельман

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА

Книга 2

Издательство «Наука»
Москва

ইয়া. পেরেলমান

পদার্থবিদ্যার মজার কথা

অনুবাদ: শৈলেন দত্ত

মির প্রকাশন মস্কো

মনীষা গ্রন্থালয় কলিকাতা

PHYSICS FOR ENTERTAINMENT

Ya. Perelman

Book 2.

На языке бенгали

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

ISBN 5-03-000262-6

প্রকাশকের নিবেদন

পিরেলম্যানের 'ফিজিকস্ ফর এণ্টারটেনমেণ্ট', ভাষান্তরিত ক'রে বাঙলায় যার নামকরণ হ'ল 'পদার্থবিদ্যার মজা' তা মূলত অষ্টাদশ রুশ সংস্করণ থেকে অনূদিত। গ্রন্হটির অসামান্য জনপ্রিয়তার পশ্চাতে রয়েছে এর গ্রন্হকারের বিরল প্রতিভা—যিনি পদার্থবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ সাধারণ ঘটনা ও দৃশ্যমান বিষয় বাছাই ক'রে উপভোগ্য করে উপস্থাপিত করেছেন এই গ্রন্হে। গ্রন্হটি রচনার সময় পিরেলম্যানের মনে এক বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত ধ্যান ধারণা ও বহুকাল পরিচিত নিয়মাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি আমাদের আধুনিক পদার্থবিদ্যার সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়েছেন এবং জড় বিজ্ঞানের নিরিখে আমাদের চিন্তা-ভাবনা করাতে যত্নবান হয়েছেন। অবশ্য ইলেকট্রনিকস্, নিউক্লিয়ার ফিজিকস্ এবং এই ধরনের বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে সর্বশেষ অগ্রগতির বিষয় এ গ্রন্হে যে উল্লেখ নেই—এতে বিস্ময়ের কিছু নেই সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর আগে গ্রন্হটি রচিত হ'লেও, পিরেলম্যান ক্রমাগত 1936 সালের ত্রয়োদশ সংস্করণ পর্যন্ত গ্রন্হটির সংস্কার সাধনে ও সুসংযোজনে যত্নবান হয়েছেন। 1942 খৃীষ্টাব্দে তিনি লেনিনগ্রাড ব্লকেড-এ পরলোকগমন করেন এবং পরবর্তী সংস্করণগুলি তাঁর মহাপ্রয়াণের পর প্রকাশিত হয়।

বর্তমান সংস্করণে আমরা গ্রন্হটি নতুন ক'রে লেখার চেষ্টা করি নি কেবলমাত্র গ্রন্হটিকে সমকালীন করার জন্য যত্নবান হয়েছি।

সূচীপত্র

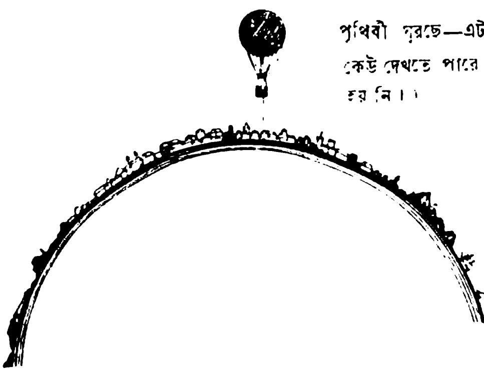
পরিচ্ছেদ ১

বলবিদ্যার ভিত্তি

সবচেয়ে সুলভে ভ্রমণের উপায়

সপ্তদশ শতাব্দীর হাস্যরসিক ফরাসী লেখক সিরানো দ্য বের্গেরাক (Cirano de Bergerac) তাঁর 'চান্দ্ররাজ্য ও চান্দ্র সাম্রাজ্যের ইতিহাস'—1657 (History of Lunar States and Empires) শীর্ষক বিদ্রূপাত্মক রচনায় এক উদ্ভট পরিকল্পনার বর্ণনা দিয়েছেন। দেখানো হয়েছে, একদিনের পরীক্ষায় তিনি তাঁর সমস্ত বকযন্ত্রগুলিসহ বায়ুমণ্ডলে উত্থিত হয়েছেন। কয়েক ঘণ্টা পরে নেমে এসে তিনি গভীর বিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, তিনি স্বদেশভূমি ফ্রান্সেও নেই, এমন কি

চিত্র 1



পৃথিবী ঘুরছে—এটা বেলুন থেকে কি কেউ দেখতে পারে? (স্কেল লক্ষ্য রাখা হয় নি।)

ইউরোপেও নেই। তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন কানাডায়। অদ্ভুতভাবে সিরানো বিশ্বাস করে বসলেন যে, তাঁর এই অতলান্তিক উত্তর পরিক্রমা বস্তুতঃ সম্ভব, কারণ তিনি যুক্তি খাড়া করলেন যে, যখন তিনি ঊর্ধ্বে বায়ুমণ্ডলে ছিলেন, পৃথিবী তখন পূর্বদিকে ক্রমাগত পাক খেয়ে চলেছে। পৃথিবীর এই আবর্তনের জন্যই তিনি ফ্রান্সে না নেমে উত্তর আমেরিকায় নেমেছেন।

বলতেই হয়, কত সস্তায় ও সহজে ভ্রমণ করা যায়! শুধু বায়ুমণ্ডলে উত্থিত হয়ে কয়েক মিনিট ঝুলন্ত অবস্থায় থাক, তা হলেই অধিকতর পশ্চিমদিকে সম্পূর্ণ নতুন জায়গায় নেমে আসবে। পৃথিবীপৃষ্ঠে ভ্রমণ করে নিজেকে পরিশ্রান্ত করে তোলার আর প্রয়োজন কি? শুধুমাত্র বায়ুমণ্ডলের মধ্যভাগে ভেসে থাক আর গন্তব্যস্থল না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।

হায়! নিছক আজগুবি পরিকল্পনা ছাড়া এটা আর কি হতে পারে! প্রথমতঃ, যখন আমরা বায়ুমণ্ডলে উঠি, বস্তুত আমরা মা ধরিত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন হই না। আমরা তখনও পরস্পর সুসংবদ্ধ থাকি, কারণ আমরা বায়ুমণ্ডলের ঘেরাটোপে ঝুলতে থাকি, যে বায়ুমণ্ডলও পৃথিবীর আপন কক্ষপথে আবর্তনে অংশগ্রহণ করে চলেছে। বায়ু বিশেষ করে তার ঘনতর স্তর পৃথিবীর সঙ্গে পাক খাচ্ছে তার সকল অনুষঙ্গীদের নিয়ে—মেঘ, উড়োজাহাজ, পাখি, কীটপতঙ্গ সবকিছু। বস্তুতঃ, যদি বাতাস আমাদের গ্রহের সঙ্গে আবর্তিত না হত তা হলে আমরা বাতাসের এমন প্রচণ্ড ধাক্কায় ছিটকে পড়তাম যে, সেই প্রচণ্ড বলের তুলনায় প্রবলতম ঘূর্ণিঝড়ও মনে হত মৃদুমন্দ বায়ু মাত্র। ঘূর্ণিঝড় বা টর্নাডো, সেকেণ্ডে 40 মিটার বা ঘণ্টায় 144 কিলোমিটার বেগে বয়। কিন্তু লেনিনগ্রাদের অক্ষাংশে পৃথিবী বায়ুসহ আমাদের বহন করবে সেকেণ্ডে 230 মিটার বা ঘণ্টায় 828 কিলোমিটার বেগে। বাতাস বয়ে যাবার সময় আমরা স্থির হয়েই থাকি বা বাতাস স্থির থাকার সময় আমরা সঞ্চরণশীল হই—এই বিধির কোন পরিবর্তন হবে না। উভয় ক্ষেত্রেই আমরা একই প্রচণ্ড বাতাসের চাপ অনুভব করব। মোটর সাইকেলে ধাবমান যাত্রী ঘণ্টায় 100 কিলোমিটার বেগে অভিযান করার সময় শান্ততম প্রাকৃতিক অবস্থাতেও অগ্রবর্তী বায়ুর চাপের সম্মুখীন হয়।

এমন কি বায়ুমণ্ডলের চূড়ায় আরোহণ করলেও, কিংবা পৃথিবীর উপর বায়ুস্তরের কোন আবরণ না থাকলেও, ফরাসী হাস্যরসিক লেখকের কল্পনা প্রসূত সস্তায় সহজ ভ্রমণের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের কোনো উপকার হবে না। প্রকৃতপক্ষে, আমরা যখন আবর্তনশীল পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি গতিজাড্যের বলে আমরা আমাদের নিচের পৃথিবীর সঙ্গে একই বেগে চলমান থাকি। পৃথিবীপৃষ্ঠে ফিরে এসে আমরা আবার নিজেদের ঊর্ধ্ব গমনের পূর্বের স্ব-স্ব স্থানে দেখতে পাই। অবস্থাটা চলমান ট্রেনের কক্ষে লাফানোর মত। আমরা যেখান থেকে লাফাই আবার সেখানেই ফিরে আসি। প্রকৃতই, গতিজাড্যের বলে আমরা সরলরৈখিক পথে (স্পর্শকের দিকে) অগ্রসর হব অথচ আমাদের নিচের পৃথিবীপৃষ্ঠ বৃত্তের চাপের (arc) পথে চলবে। সময়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্তর চিন্তা করলে, এ পার্থক্য সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা যায়।

পৃথিবী থেমে যাও

বিখ্যাত ব্রিটিশ কল্পবিজ্ঞান উপন্যাসের লেখক এইচ. জি. ওয়েল্‌স্ (H. G. Wells) একজন অফিস-কেরানীর গল্প বলেছেন যিনি অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে পারতেন। স্থূলবুদ্ধি যুবক হলেও ভাগ্যগুণে তিনি যা-ইচ্ছে-তাই করতে পারতেন। কিন্তু, এই বিস্ময়কর ক্ষমতা পরিণামে বিপদই ডেকে আনত। আমাদের ক্ষেত্রে, গল্পের শেষাংশই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একবার তাঁর চিন্তা হ'ল তিনি তার প্রতিভার সাহায্যে রাত্রিকে দীর্ঘায়িত করতে পারেন। কিভাবে এটা করা যায় চিন্তা করতে করতে তিনি তারাদের পরিক্রমণ পথে থেমে যেতে নির্দেশ দেবেন স্থির করলেন। তিনি নিজেকে এ ব্যাপারে নিযুক্ত করলেন না এবং যখন তাঁর বন্ধু বলল, তিনি চাঁদকে থামাতে পারতেন, তিনি চাঁদের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকলেন এবং পরিহাসছলে বললেন : 'ওটা একটু বেশি বড়'।

" 'কেন না ?'—মিঃ মেডিগ (Maydig) বললেন, 'অবশ্য এটা থামে না। তুমি পৃথিবীর আবর্তন থামিয়ে দাও, তুমি জানো…এতে আমরা কোনো ক্ষতি করছি না।'

" 'হুঁ !'—মিঃ ফোদেরিংগে (Fotheringay) বললেন, 'ভালো কথা।' তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'আমি চেষ্টা করব। এই তো…'

" জ্যাকেটে বোতাম লাগালেন এবং তিনি নিজেই সাধ্যায়ত্ত শক্তির উপর বিশ্বাস রেখে পৃথিবীকে বললেন, 'ঘোরা থামাও, থামাবে কি ?'

" মিনিটে ডজন ডজন মাইল বেগে তিনি মাথা উঁচু করে উড়তে লাগলেন নিয়ন্ত্রণ-হারা হয়ে। প্রতি সেকেণ্ডে অসংখ্য বৃত্ত ঘুরতে ঘুরতে রচনা করে গেলেও, তিনি ভাবতে লাগলেন ও ইচ্ছে করতে লাগলেন : 'আমাকে নিরাপদে ও সুস্থ দেহে নেমে আসতে দাও—আর যা ঘটে ঘটুক।'

" তিনি ঠিক সময়েই এরূপ ইচ্ছে করেছিলেন…তিনি খুব জোরালো কিন্তু ক্ষতিকর নয় এমন ধাক্কা খেয়ে নামলেন যেন সদ্যগড়া মাটির ঢিবিতে। ধাতু ও ঘরবাড়ির ইঁট-কাঠের এক বিরাট অংশ তাঁর উপর দিয়ে ঠিকরে পড়ল এবং পাথর-ইঁট ও ঘরবাড়ির অন্যান্য অংশ যেন উড়ে গেল—এ-যেন কোন বোমের বিস্ফোরণ ঘটল। সশব্দে ছুটন্ত গরু বড় একটা ব্লকে গিয়ে ধাক্কা খেল এবং ডিমের মত গুঁড়িয়ে গেল।…বিরাট ঝড়ের গর্জন পৃথিবী ও আকাশ কাঁপিয়ে তুলল, তার পক্ষে আর মাথা তুলে চাওয়া সম্ভব হল না…

" 'হায় বিধাতা !' ঝড়ের জন্য কথা বলতে প্রায় অক্ষম মিঃ ফোদেরিংগে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আমাকে চিঁ চিঁ করতে হচ্ছে, কোথায় গোলমাল হয়ে গেল ? ঝড় এবং বজ্রপাত…মেডিগই আমাকে এ রকম কাজে লিপ্ত করেছে।…'

" পত পত করে ওড়া জ্যাকেট নিয়ে যতটুকু পারলেন তিনি তার চারপাশে চেয়ে দেখলেন…'আকাশটা যাহোক ঠিকই আছে', মিঃ ফোদেরিংগে বললেন।… 'মাথার উপর চাঁদও রয়েছে। কিন্তু অন্যান্য সব—গ্রামটা কোথায়?—আর আর সব কোথায়? এবং পৃথিবীর উপর ঝড়টাই বা কিসে তুলল? আমি তো বাতাসকে কোনো নির্দেশ দেইনি।'

"মিঃ ফোদেরিংগে বৃথাই পায়ের উপর দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেন, এবং একবার পড়ে যাবার পর, চার পেয়ে হয়ে রইলেন। চন্দ্রালোকিত পৃথিবীটা তিনি নিরীক্ষণ করলেন, আর এই সময় তাঁর জ্যাকেটের লেজটা তাঁর মাথার উপর নড়তে লাগল। 'কোথাও মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে', মিঃ ফোদেরিংগে বললেন। 'কিন্তু সেটা কি—ভগবানই জানেন…'

"মিঃ ফোদেরিংগে বুঝতে পারলেন যে, তাঁর অলৌকিক পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে, এবং সেই সঙ্গে ভোজবাজি বা ভেল্কির প্রতি ভীষণ বিরক্তি এসে গেল তাঁর। তিনি এখন অন্ধকারে ছিলেন, কারণ মেঘের দল এসে জমা হয়েছে এবং তাঁর সাময়িক চাঁদ-দেখা ঢেকে দিয়েছে এবং বাতাস তুষার ঝড়ে জর্জরিত। জল ও বাতাসের মহা গর্জন পৃথিবী ও আকাশ ভরে দিল এবং ধুলো থেকে রক্ষা করার জন্য হাত দিয়ে চোখ আড়াল করে বাতাসের দিকে চেয়ে বিদ্যুতের খেলায় তিনি দেখতে পেলেন মস্ত এক জলের প্রাচীর তাঁর উপর ঝরে পড়ছে…

" 'থামো!' অগ্রসরমান জলের দিকে চেয়ে মিঃ ফোদেরিংগে চীৎকার করে উঠলেন। 'ভালোয়, ভালোয় থেমে যাও!'

" 'এক মুহূর্তের জন্যে' মিঃ ফোদেরিংগে বিদ্যুৎ ও বজ্রকে বললেন, 'থামো!'

"চার পেয়ে অবস্থাতেই তিনি রয়ে গেলেন…অথচ মনেপ্রাণে চাইছিলেন সব ঠিক হয়ে যাক।

" 'আঃ' তিনি বললেন। 'আমি না বলা পর্যন্ত কিছু যেন না ঘটে।…'

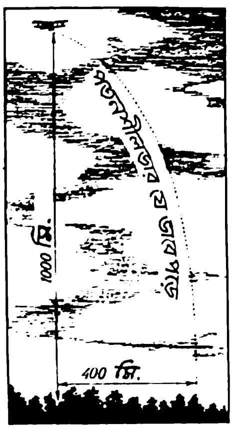
" 'এখন তা হলে!—এখানে নির্দেশ যাচ্ছে! আমি এখন যা বললাম মনে রেখ। প্রথমত, আমার যা বলার তা যখন বলা হয়ে গেছে, আমার অলৌকিক শক্তি চলে যাক আমার ইচ্ছে আর পাঁচজনের ইচ্ছার মত হোক এবং এইসব বিপজ্জনক অলৌকিক খেলা বন্ধ হয়ে যাক।…'

"দ্বিতীয়টি হল… এই অলৌকিক খেলা শুরু হবার আগে সব যে রকম ছিল সেই রকম হয়ে যাক…আর ভেল্কি বাজী নয়,—সব কিছু আগের মতন—আমিও আধ পাঁট মদ গেলার ঠিক আগে লঙ ড্রাগনে (Long Dragon) যেমন ছিলাম ঠিক তেমন…"

'বিমান ডাক'

মনে কর বিমানে চড়ে তুমি আকাশের অনেক উঁচুতে উঠেছ। নিচের দিকে তাকালে অনেক পরিচিত স্থান তোমার নজরে আসবে মনে হবে, ঐ তো তুমি তোমার বন্ধুর দিকে যাচ্ছ। তোমার মনে হতে পারে বন্ধুকে একটা খবর পাঠালে মন্দ হয় না। অতএব তুমি খুব তাড়াতাড়ি তোমার লেখার প্যাডে কয়েকটা লাইন লিখে ফেললেন, তারপর প্যাড থেকে কাগজটা ছিঁড়ে নিয়ে কোনো একটা ভারী বস্তুর (যাকে আমরা এখন থেকে বোঝার সুবিধের জন্য 'ভার' বলব) সঙ্গে জড়ালে এবং তারপর বন্ধুর বাড়ী ঠিক যখন তোমার বরাবর নিচে এসে পড়েছে তখন ওটা ছেড়ে দিলে। এখন যদি তুমি ভাব এটা তোমার বন্ধুর বাড়ির সামনের বাগানে গিয়ে পড়বে, তাহলে তুমি মস্ত ভুল করবে, তুমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হবেই, ডিম যেমন ডিম ছাড়া আর কিছু নয়, ঠিক তেমনই যদিও বন্ধুর বাড়ি তোমার ঠিক নিচেই দণ্ডায়মান।

চিত্র 2



চলমান উড়োজাহাজ থেকে কোন ভার (weight) ফেললে ওটা লক্ষ্যে পড়ে না, পড়ে বাঁকা পথে।

বস্তুটা পড়ার সময় তুমি যদি লক্ষ্য করতে, একটা অদ্ভুত ব্যাপার তোমার নজরে পড়ত। পতনশীল অবস্থায় বস্তুটি যেন কোনো অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা আছে এমনিভাবে বিমানের নিচুতে বিমানের গতির দিকে চলতে থাকবে। আর বস্তুটি যখন নিচের ভূমি স্পর্শ করবে তখন দেখবে বস্তুটি লক্ষ্য থেকে অনেকখানি দূরে ছিটকে গেছে।

এটাও আবার সেই একই গতিজাড্য নিয়মের অভিব্যক্তি যা···Bergerac-এর উপায়ে আমাদের ভ্রমণে বাধা দেয়। বস্তুটি (ভার) যতক্ষণ বিমানে ছিল ততক্ষণ ওটা বিমানের সঙ্গেই চলছিল। কিন্তু যখন ছেড়ে দেওয়া হল এবং বিমান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল তখন কিন্তু ওটা তার প্রাথমিক বেগ হারায় নি। পতনশীল অবস্থায় বিমানের যাত্রাপথ বরাবরই এটা চলতে থাকে। লম্বাভিমুখী ও অনুভূমিক উভয় প্রকার চলনই সংযুক্ত হয়, এবং ফলে ভারটি পতনশীল অবস্থায় একটা বক্রপথ রচনা করে, বিমানটি অবশ্য মূল পথ থেকে যদি বিচ্যুত না হয় বা দ্রুততর গতিতে অগ্রসর হয়। কোনো বস্তুকে অনুভূমিক ভাবে ছুঁড়ে দিলে যে বক্রপথ রচনা করে এই ভারটিও সেই রকম পথই রচনা করে। ভূমির সঙ্গে সমান্তরালভাবে বন্দুক রেখে গুলি ছুঁড়লে যেমন চাপের মত পথ রচনা ক'রে গুলিটি এসে মাটিতে পড়ে ঠিক তেমন। মনে রাখবে উপরে বর্ণিত সব কিছুই কার্যকরী হবে যদি বাতাসের পিছটান না থাকে। প্রকৃতপক্ষে বাতাসের পিছটান লম্বাভিমুখী ও অনুভূমিক উভয় প্রকার চলনকেই বাধা দেয়, ফলে ভারটি বিমান থেকে পিছিয়ে পড়ে।

বিমান যত উপরে থাকবে বা দ্রুত চলবে উলম্ব রেখা থেকে এই বিচ্যুতি তত বেশি হবে। বাতাস না থাকলে ভূমি থেকে 1000 মিটার উচ্চে অবস্থিত, ঘণ্টায় 100 কিলোমিটার বেগে ধাবমান বিমান থেকে পতিত কোনো ভার বিমানের সরাসরি নিচের লক্ষ্য বিন্দু থেকে প্রায় 400 মিটার এগিয়ে পড়বে (চিত্র 2)। প্রশ্নটির উত্তর সহজেই খুঁজে পাওয়া যাবে যদি আমরা বাতাসের পিছটান-কে উপেক্ষা করি। সমত্বরণে সঞ্চরণশীল কোনো বস্তুর পথের দৈর্ঘ্যের সূত্রটি হল $S=\frac{gt^2}{2}$, যা থেকে আমরা পাই $t=\sqrt{\frac{2s}{g}}$। এর অর্থ হল 1000 মিটার উচ্চে অবস্থিত কোনো প্রস্তরখণ্ড $\sqrt{\frac{2\times 1000}{9{\cdot}8}}$ বা 14 সেকেণ্ড সময় নেবে পড়তে। উক্ত সময়ে প্রস্তরখণ্ডটি অনুভূমিকভাবে $\frac{100{,}000}{3{,}600}\times 14$ $=390$ মিটারে অগ্রবর্তী হবে।

বিরামহীন রেলপথ

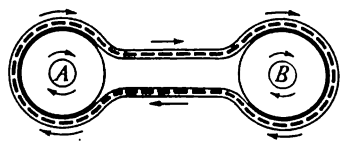
সাধারণ প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে দ্রুতগামী এক্স্প্রেস ট্রেনে লাফ দিয়ে উঠতে যাওয়া কী কৃতিত্বের সহজেই বুঝতে পার। কিন্তু প্ল্যাটফর্মটাও যদি চলমান হয় এবং অধিকন্তু যদি এক্স্প্রেস ট্রেনের সমবেগে ট্রেনটি যে দিকে ধাবমাম সেদিকে ছোটে তা হলেও কি প্লাটফর্ম থেকে ট্রেনটিতে লাফানো কঠিন হবে?

মোটেই না। দাঁড়ানো ট্রেনে প্ল্যাটফর্ম থেকে যত সহজে ওঠা সম্ভব এ ক্ষেত্রেও ঠিক তত সহজেই ওঠা যাবে। যখনই তুমি এবং ট্রেনটি সমবেগে একই দিকে চলমান, তোমার সাপেক্ষে ট্রেনটি মনে হবে স্থির অবস্থায় দণ্ডায়মান। ট্রেনটির চাকাগুলো ঘুরছে ঠিকই, কিন্তু তোমার সাপেক্ষে মনে হবে তারা শুধু কালক্ষেপ করছে।

প্রকৃতপক্ষে সমস্ত বস্তু,—যাদের আমরা আপাতদৃষ্টিতে স্থিরাবস্থায় আছে বলে মনে করি,—যেমন প্লাটফর্মে সম্পূর্ণ থেমে-থাকা ট্রেন, তারা আমাদের নিয়ে পৃথিবীর কক্ষপথে ঘুরছে, এবং সূর্যের চারিদিকেও পাক খাচ্ছে। কিন্তু যেহেতু এই গতিতে আমাদের কিছুই যায় আসে না, আমরা একে উপেক্ষা করতে পারি।

বাস্তবক্ষেত্রে আমরা এমন ট্রেনের উদ্ভাবন করতে পারি যা না থেমে যাত্রীদের ওঠানো নামানো করাতে পারে। মেলা ও প্রদর্শনীতে অনেক সময় এই ধরনের ট্রেনের ব্যবস্থা থাকে। এই রকম ট্রেনে চেপে দর্শকেরা খুব তাড়াতাড়ি এবং খুব সহজে দর্শনীয় সবকিছু অনায়াসে দেখে নিতে পারে। মেলার প্রাঙ্গণের প্রবেশ ও প্রস্থান পথ বিরামহীন রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত থাকে। যাত্রীরা তাদের ইচ্ছামত ও সুবিধামত এর ওপরের চলমান গাড়িতে ওঠা-নামা করতে পারে।

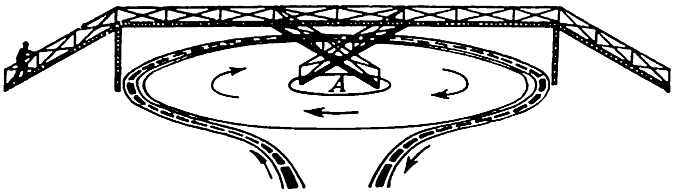
চিত্র 3



A ও B স্টেশন দুটির মধ্যে বিরামহীন রেলপথের চিত্র। পরবর্তী চিত্রে, কি ভাবে এটা কাজ করে বোঝানো হয়েছে

3নং ও 4নং চিত্র দুটি থেকে বিরামহীন রেলপথ সম্বন্ধে কিছু কৌতূহল উদ্দীপক ধারণা জন্মাবে। 3নং চিত্রে A ও B দুটি প্রান্তিক স্টেশন দেখাচ্ছে। প্রতিটি প্রান্তিক স্টেশনেই একটি করে বৃত্তাকার স্থির প্লাটফর্ম আছে। প্রতিটি প্লাটফর্ম রয়েছে একটি বড় আকারের ঘূর্ণায়মান থালার মাঝখানে। প্ল্যাটফর্ম দুটির চারপাশে ঘূর্ণায়মান থালার সঙ্গে রেলপথের গাড়িগুলি একটি শৃঙ্খল দ্বারা সংযুক্ত। এবার দেখা যাক থালা দুটি ঘুরতে থাকলে কি ঘটবে। গাড়িগুলিও থালার চারিধারে ঘুরবে থালার বহিপ্রান্তের বেড়ের সমগতিতে। ফলে, কোনো যাত্রী নিরাপদে রেলগাড়িতে উঠতে বা রেলগাড়ি থেকে নামতে পারবে। নেমে আসার পর, যাত্রীটি ঘূর্ণায়মান থালার কেন্দ্রাভিমুখে হেঁটে যাবে। এইভাবে সে মধ্যবর্তী স্থির প্লাটফর্মে এসে পড়বে। এখানে ঘূর্ণায়মান থালার ভেতরকার

(অন্তর্দেশীয়) বেড় থেকে টপকে স্থির প্ল্যাটফর্মে আসা আরও সহজ, কারণ ভেতরকার বৃত্তাকার বেড়ের ব্যাসার্ধ কম হওয়ায় এর পরিধির বেগ বাইরের বৃত্তাকার বেড়ের পরিধির বেগ থেকে অনেক কম হবে (এটা খুবই স্বাভাবিক কারণ, ভেতরকার বেড়ের প্রতিটি বিন্দু ঘূর্ণায়মান অবস্থায় বাইরের বেড়ের প্রতিটি বিন্দু অপেক্ষা অনেক ধীরে ধীরে আবর্তন করবে, কারণ একই সময় ভেতরকার বেড়ের প্রতিটি বিন্দু অনেক ক্ষুদ্রতর পরিধি রচনা করবে)। এখন রেলপথের বাইরের জমিতে আসার জন্য যাত্রীকে শুধু মাথার উপরকার সেতুটি পার হতে হবে।



চিত্র 4 বিরামহীন রেলপথের একটি স্টেশন

অনেকগুলো স্টপেজ না থাকায় এ ক্ষেত্রে অনেক কম সময় ও অনেক কম যানবাহনের শক্তি ব্যয় হবে। এটা ঘটনা যে, ট্রাম স্টপেজে দাঁড়ানোর জন্য ও স্টপেজ থেকে ছেড়ে আবার চলমান হবার বেগের জন্য অনেক বেশি সময় ও প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ভ্রমণ সহায়ক শক্তি ব্যয় করে।

প্রসঙ্গক্রমে ট্রামের বৈদ্যুতিক মোটরকে ডায়নামোর মত কাজ করিয়ে এবং তড়িৎচক্রে বিপরীত দিকে তড়িৎপ্রবাহ ঘটিয়ে ট্রামের গতি কমিয়ে আনতে ব্যয়িত শক্তির অপচয় অনেকাংশ কমানো যেতে পারে। বার্লিনের উপনগরী চারলোটেনবার্গে ট্রামের তড়িৎশক্তির ব্যয় প্রায় শতকরা 30 ভাগ কমিয়ে আনা হয়েছে এই ভাবেই।*

রেলপথের স্টেশনে বিশেষ ধরনের চলমান প্লাটফর্মের ব্যবস্থা না করেও ট্রেন চলাচলের সময় যাত্রীদের তুলে নেওয়ার ও নামিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা যায়। মনে করা যাক, একটা এক্‌স্‌প্রেস ট্রেন একটা সাধারণ স্থির প্লাটফর্ম ছুঁয়ে যাচ্ছে। আমরা চাই, না থেমে ট্রেনটি আরও কিছু যাত্রী তুলে নেবে। এটা সম্ভব হয় যদি এই যাত্রীরা ঐ ট্রেনটির পথের সমান্তরালে সংরক্ষিত অপর একটি ট্রেনে উঠে থাকে। এর জন্য পরবর্তী ট্রেনটিও চলতে থাকবে যতক্ষণ না এর গতি এক্‌স্‌প্রেস ট্রেনটির সমান হয়। যখন দুটি ট্রেনই পাশাপাশি সমান্তরাল পথে এসে যাবে তখন

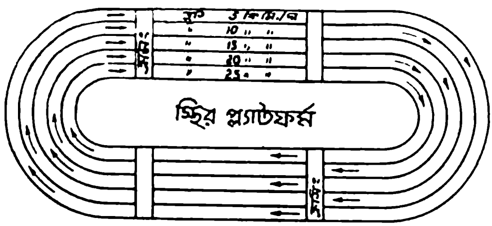
* এই প্রক্রিয়াই বর্তমানে বৈদ্যুতিক ত্রাদিভস্তক—মস্কো পথে প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্রত্যেকটি অপরটির সাপেক্ষে স্থির অবস্থায় থাকবে। তখন পরবর্তী ট্রেনের যাত্রীরা যাতায়াতের জন্য রক্ষিত পথ দিয়ে অনায়াসেই দ্রুতগামী ট্রেনটিতে উঠতে পারবে। তা হলে দেখা যাচ্ছে, ট্রেনের যাত্রীদের ওঠানোর জন্য ট্রেনের স্টেশনে দাঁড়ানোর প্রয়োজন হচ্ছে না।

চলমান ফুটপাত

আর একটি কৌশল, 'চলমান ফুটপাত'—যা এ পর্যন্ত বিশেষ করে বিভিন্ন প্রদর্শনীতে দেখানো হচ্ছে—তাও গতির আপেক্ষিকতা তত্ত্বকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগো মেলায় এই ধরনের 'চলমান ফুটপাত' প্রথম প্রদর্শিত হয়। ১৯00 খ্রীষ্টাব্দের প্যারিসের মেলাতেও এই ধরনের চলমান ফুটপাত ছিল।

চিত্র 5



বিরামহীন ফুটপাত।

5নং চিত্রে বিভিন্ন গতিতে চলমান পাঁচটি ফুটপাতের একটা খাঁচা দেখানো হয়েছে। সবচেয়ে বাইরের ফুটপাতটির গতি ঘণ্টায় মাত্র 5 কিলোমিটার। এটা আমাদের সাধারণভাবে হাঁটার গতি। অতএব এই গতিতে ফুটপাতটিতে ওঠার আমাদের কোনো অসুবিধেই হবে না। বাইরের দিক থেকে দ্বিতীয়টির গতি ঘণ্টায় 10 কিলোমিটার। স্থির কোনো ফুটপাত থেকে এই দ্বিতীয় ফুটপাতটিতে লাফিয়ে পড়া বেশ বিপজ্জনক। কিন্তু প্রথম ফুটপাতটি থেকে দ্বিতীয়টিতে ওঠা আদৌ বিপজ্জনক নয় বরং খুব সহজ, কারণ প্রথম চলমান ফুটপাতটির (যার গতি ঘণ্টায় 5 কিলোমিটার) সাপেক্ষে দ্বিতীয়টির (যার গতি ঘণ্টায় 10 কিলোমিটার) গতিও ঘণ্টায় 5 কিলোমিটার। এর অর্থ হল মাটি বা স্থির ফুটপাত থেকে প্রথম চলমান ফুটপাতে ওঠা যেমন সহজ, প্রথম চলমান ফুটপাতটি থেকে দ্বিতীয় চলমান ফুটপাতটিতে ওঠাও তেমনই সহজ। তৃতীয় চলমান ফুটপাতটির গতি ঘণ্টায় 15 কিলোমিটার। কিন্তু এক্ষেত্রেও দ্বিতীয় চলমান ফুটপাতটি থেকে তৃতীয়টিতে ওঠা তেমনই সহজ, কারণ দ্বিতীয়টির সাপেক্ষে তৃতীয়টির গতিও ঘণ্টায় 5 কিলোমিটার

(15 কি.মি. – 10 কি.মি.)। এইভাবে তৃতীয়টি থেকে চতুর্থটিতে যার গতি ঘণ্টায় 20 কিলোমিটার এবং চতুর্থটি থেকে পঞ্চম চলমান ফুটপাতে যার গতি ঘণ্টায় 25 কিলোমিটার ওঠা খুবই সহজ হবে, সাধারণ ভূমির ওপর হাঁটার গতি থাকলেই হবে। কোনো যাত্রী এইভাবে পঞ্চম ফুটপাতটিতে উঠে যাবে এবং গন্তব্যস্থলে পৌঁছে পঞ্চম থেকে চতুর্থে, চতুর্থ থেকে তৃতীয়টিতে, তৃতীয় থেকে দ্বিতীয়টিতে এবং সবশেষে দ্বিতীয়টি থেকে প্রথমটিতে ক্রমান্বয়ে নেমে এসে মাটিতে নেমে পড়বে।

বিভ্রান্তিকর সূত্র

ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া সূত্র—নিউটনের তৃতীয় গতি সূত্র নিউটনের তিনটি মূল গতিসূত্রের মধ্যে সবচেয়ে বিভ্রান্তিকর। প্রত্যেকেই এই সূত্রটি জানে এবং কেউ কেউ এই সূত্রটিকে কিভাবে নির্ভুলভাবে প্রয়োগ করতে হয় তাও জানে! কিন্তু অতি অল্প সংখ্যক লোকই সূত্রটি পুরোপুরি বোঝে। তোমরা খুবই ভাগ্যবান যে, এই গতিসূত্রটির অর্থ এখনই বুঝতে পারছ। কিন্তু বিশ্বাস কর, বিষয়টির ভিতরে প্রবেশ করতে আমার দশ বছর সময় লেগেছে।

বিষয়টি আমি যাঁদের সঙ্গে আলোচনা করেছি তারা সূত্রটিকে মোটামুটি নির্ভুল বলেই মেনে নিয়েছে। কিন্তু তারাও এই স্বীকৃতির পেছনে কয়েকটি বিশেষ ফাঁক রেখে দিয়েছে। স্থির বস্তুর বেলায় তারা বলে সূত্রটি খাটে কিন্তু তারা বুঝে উঠতে পারে না গতিময় বস্তুর বেলা এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কিভাবে কাজ করছে। সূত্রটি অনুসারে যখন একটা ঘোড়া একটা গাড়িকে টানে তখন সূত্রানুসারে গাড়িটিও ঘোড়াটিকে টানছে একই বলে। যদি তাই হয়, তাহলে গাড়িটি তো যেখানে আছে সেখানেই থাকবে, তাই নয় কি? কেন এই দুটি বল, যদি তারা সমান হয়, পরস্পরকে নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারছে না?

সূত্রটি নিয়ে আলোচনার সময় এরকম যুক্তিই সাধারণত খাড়া করা হয়। তাহ'লে কি সূত্রটি ভুল? নিশ্চয়ই না, আমাদের বোঝারই ভুল। দুটি 'বিভিন্ন বস্তুর' উপর প্রযুক্ত হয়েছে বলেই বল দুটি পরস্পরকে নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারছে না। একটি বল প্রযুক্ত হয়েছে গাড়িটির উপর আর অপরটি প্রযুক্ত হয়েছে ঘোড়াটির উপর। বল দুটি নিশ্চয়ই এক, কিন্তু সমবল কি সবসময় সমক্রিয়া দেয়? সমবল কি সবসময় সকল বস্তুর উপর একই রকম ত্বরণ সৃষ্টি করে? কোনো বস্তুর উপর কোনো বলের ক্রিয়া কি বস্তুটির উপরও নির্ভর করে না? এবং বস্তুটি বলের উপর যে 'প্রতিক্রিয়া' করে তারও মানের উপর? এই বিষয়গুলোর উপর চিন্তা করলেই তুমি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারবে ঘোড়াটি কিভাবে গাড়িটিকে টানছে যদি গাড়িটি সম-পরিমাণ বলে ঘোড়াটিকে পেছন দিকে টানে। প্রতি মুহূর্তে গাড়ির উপর যে বল ক্রিয়া করছে এবং ঘোড়াটির উপর যে বল ক্রিয়া করছে তাদের

মান সমান, কিন্তু গাড়িটি যেহেতু নিজের চাকার উপর স্বচ্ছন্দে গড়াচ্ছে আর ঘোড়াটি যেহেতু ভূমি থেকে সরে যাচ্ছে, ঘোড়া যে দিকে গাড়িটিকে টানছে গাড়ি সেদিকে যাচ্ছে। আরও বলা যায়, বুঝতে হবে গাড়িটি যদি ঘোড়ার চালক শক্তির উপর 'প্রতিক্রিয়া' না করত তাহলে সামান্য একটু ঠেলা দিয়েই বিনা ঘোড়ায় আমরা গাড়িটিকে চালিয়ে নিতে পারতাম। গাড়ির প্রতিক্রিয়া উতরানোর জন্যে আমাদের ঘোড়াটির প্রয়োজন।

সমস্ত বিষয়টা হয়তো আরও সহজ হবে যদি সূত্রটিকে অতি সংক্ষিপ্তভাবে "প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে" না বলে, বলা হয়ঃ "প্রতিক্রিয়মান বস্তুর বল ক্রিয়মান বস্তুর বলের সমান।" প্রকৃতপক্ষে কেবল মাত্র বল দুটির মানই সমান। বল দুটির ক্রিয়া যা সাধারণ অর্থে বস্তুর সরণ বোঝায় তা সচরাচর পৃথক হচ্ছে কেন না বল দুটি বিভিন্ন বস্তুর উপর প্রযুক্ত হচ্ছে।

১৯৩৪ খৃীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সোভিয়েত জাহাজ চেলিউস্‌কিন উত্তর মেরুতে পিষ্ট হয়ে যায়। নিউটনের গতির তৃতীয় সূত্র থেকে কেন এমনটি ঘটেছিল সহজেই বোঝানো যায়। বরফ যখন চেলিউস্‌কিন জাহাজের কাঠামোয় এসে চাপ দিল জাহাজের কাঠামোটাও সমবলে ওকে চাপ দিল। পেষণ সংঘটিত হল এই কারণে যে, বরফ ভেঙে না গিয়ে চাপ সহ্য করতে পারল টুকরো টুকরো না হয়ে কিন্তু ফাঁপা জাহাজের খোল বলের কাছে পরাজিত হল এবং পিষ্ট হল, যদিও জাহাজের কাঠামোটা ছিল ইস্পাত-নির্মিত।

পতনশীল অবস্থাতেও, প্রতিটি বস্তু প্রতিক্রিয়ার সূত্র মেনে চলে। আপেল পড়ে কারণ পৃথিবীর অভিকর্ষ ওকে টানে। কিন্তু, আপেলও পৃথিবীকে ঠিক সম-পরিমাণ বলে আকর্ষণ করে। ঠিকমত বলতে গেলে, আপেল ও পৃথিবী পরস্পরের উপর পড়ে, যদিও তাদের পতনের দ্রুতি বিভিন্ন। পারস্পরিক আকর্ষণে সমবল আপেলের ত্বরণ সৃষ্টি করে 10 মি./সেকেণ্ড^2; কিন্তু পৃথিবীর ক্ষেত্রে পৃথিবীর ভর আপেলের ভরের তুলনায় যত গুণ ঠিক তত গুণ কম ত্বরণ সৃষ্টি করে। স্বভাবতঃই পৃথিবীর ভর আপেলের ভরের তুলনায় অনেক অনেক গুণ বেশি। তা হলে এতে আর বিস্ময়ের কি আছে, যে পৃথিবীর গতি এতই অসম্ভব রকম কম যে, সকল ব্যবহারিক প্রয়োজনে এর অস্তিত্ব নেই বলেই ধরা চলে। এখন বুঝতে পারলে আমরা "আপেল ও পৃথিবী পরস্পরের উপরে পতিত হয়" না বলে বলি, আপেল পৃথিবীপৃষ্ঠে পতিত হয়।

স্ভিয়াটোগোর মারা পড়লেন কেন

রুশদেশের উপকথায় মস্ত বীর স্ভিয়াটোগোরের কথা আছে, যিনি পৃথিবীটা তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। কথিত আছে, আর্কিমিডিসেরও ঐ একই কাজের একটা

পরিকল্পনা ছিল। আর্কিমিডিসের শুধু প্রয়োজন ছিল লিভারের জন্য একটা আলম্ব। স্ভিয়াটোগোরের অবশ্য প্রচণ্ড শক্তি ছিল এবং তার কোনো লিভারের প্রয়োজন ছিল না। শুধু তাঁর প্রবল শক্তিশালী হাত দুটো দিয়ে তিনি কিছু একটা ধরতে চেয়েছিলেন।

"কিছু ধরতে পারলে হয়, আমি পৃথিবীটা তুলে ধরব।" স্ভিয়াটোগোর তার বিশ্বস্ত ঘোড়া থেকে নামলেন। দু হাতে পৃথিবীর থলিটাকে ধারণ করলেন, তারপর ওটা হাঁটুর একটু উপর পর্যন্ত তুললেন, যখন চোখের জল নয়, ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত তার মুখমণ্ডল বেয়ে গড়াতে লাগল। পৃথিবীর মধ্যে তিনি নিমজ্জিত হলেন। আর বেরুতে পারলেন না। এই ভাবেই তিনি মারা পড়লেন।

বেচারা স্ভিয়াটোগোর! যদি তিনি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সূত্রটা জানতেন তাহলে সহজেই বুঝতে পারতেন যে, তাঁর শক্তি যখন পৃথিবীর উপর প্রযুক্ত হচ্ছে তখন ঠিক সমপরিমাণ অপর এক প্রচণ্ড শক্তি তাঁকে পৃথিবীপৃষ্ঠে দুর্নিবার আকর্ষণে টেনে আনছে। যাই হোক, উপকথার এই গল্প প্রমাণ করছে যে, বহু আগে থেকেই বোঝা গিয়েছিল পৃথিবীর উপর বল প্রযুক্ত হলে পৃথিবীও কী প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া করে। মানুষ নিউটনের অবিস্মরণীয় প্রিনসিপ্রিয়া'য় (Principia) সন্নিবেশিত প্রতিক্রিয়ায় সূত্র না বুঝে, হাজার হাজার বছর আগে থেকেই তা প্রয়োগ করে আসছে।

অবলম্বন ছাড়া মানুষ কি হাঁটতে পারে

আমরা যখন হাঁটি তখন আমরা পা দিয়ে ঠেলে মাটি বা মেঝে থেকে এগিয়ে যাই। খুব মসৃণ মেঝেতে বা বরফের উপর দিয়ে আমরা হাঁটতেই পারি না তার কারণ আমরা পা দিয়ে পায়ের তলদেশের ভূমি ঠেলতে পারি না। বাষ্পীয় ইঞ্জিন গমন পথের উপর চাকা দিয়ে ঠেলে চলে। কিন্তু রেলপথটা যদি তৈলাক্ত করা হয়, আমাদের যানবাহন যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে। কখনো কখনো, বরফাচ্ছন্ন আবহাওয়ায়, যানবাহনের চালক-চাকার সামনের রেললাইনে বালি দেওয়া হয় ট্রেনের যাত্রা-শুরু করানোর জন্যে। জাহাজ বৈঠা বা চাকা দিয়ে জল কেটে কেটে সামনে এগিয়ে যায়। উড়োজাহাজও পাখা দিয়ে বাতাস কেটে সামনে যায়।

অল্প কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, কোনো বস্তু যে কোনো মাধ্যমেই চলুক না কেন, সে ঐ মাধ্যমকেই চলার 'অবলম্বন' হিসেবে ব্যবহার করে। তাহলে অবলম্বন ছাড়া কি কোনো বস্তু চলতে পারবে?

অসম্ভব ব্যাপার! তাই না? এটা নিজেকে নিজের চুল ধরে টেনে তোলার মত এবং তা শুধু মিথ্যুকদের রাজা ব্যারন মুনচাউসেনই (Baron Mun-

chausen) করতে পারতেন। তৎসত্ত্বেও আমরা এই আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব গতি প্রায়ই দেখতে পাই। ঠিকই, কেবলমাত্র অভ্যন্তরীণ বলের প্রচেষ্টায় কোনো বস্তু নিজে নিজে চলতে শুরু করতে পারে না। কিন্তু সে নিজের একাংশ একদিকে এবং বাকী অংশ বিপরীত দিকে চালাতে পারে। বাতাসে শোঁ শোঁ করে রকেট উড়তে তোমরা বোধ হয় দেখে থাকবে। কিন্তু ভেবে দেখেছো কি, কেমন করে, কি প্রক্রিয়ায় ওটা অমন করে ওপরে ওঠে ? আমরা এখন যে ধরনের গতির কথা আলোচনা করব, রকেটের ওপরে ওঠা তার একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

রকেট ওপরে ওঠে কেন

রকেটের উপরে ওঠার সম্পর্কে অনেক সময় ভুল ব্যাখ্যা পাওয়া যায়—এমনকি পদার্থবিদ্যার ছাত্রদের কাছ থেকেও তাঁরা দাবি করেন রকেট বাতাসকে জোরে ঠেলে ফেলে উপরে উঠে যায় বারুদের দহনের ফলে উৎপন্ন গ্যাসের সাহায্যে। ঘটনাক্রমে এটাই প্রাচীন লোকেদেরও ধারণা। রকেট তো বহুদিন আগের আবিষ্কার। কিন্তু আমরা যদি বাতাস শূন্য স্থানে রকেট জ্বালাই, বাতাসে ওড়ার চেয়েও রকেট ভালো উড়বে। রকেট-ওড়ার প্রকৃত কারণ সম্পূর্ণ আলাদা।

দ্বিতীয় জার আলেকজাণ্ডারকে হত্যার ষড়যন্ত্র করার জন্য যাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়, সেই রুশ বিপ্লবী কিবালচিচ্ মরণ কক্ষে বসে তাঁর পর্যবেক্ষণ লিপিতে রকেটের গতির সহজ ও সরল ব্যাখ্যা দেন এবং সেই লেখায় তিনি তাঁর আবিষ্কৃত উড়ন্ত যানের বর্ণনা দেন। যুদ্ধের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহারের জন্য রকেটের নকশার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি লিখলেন ঃ

"একদিকে বন্ধ এবং অপরদিকে খোলা একটা টিনের চোঙে ভালো করে ঠাসা বারুদ পূর্ণ আর একটা সম আকারের চোঙ ভরে দেওয়া হয়। ভিতরের চোঙের মাঝবরাবর একটা সুড়ঙ্গ থাকে। এই সুড়ঙ্গ পথের তলে দহন ক্রিয়া প্রথমে শুরু হয়। দেখতে দেখতে ঐ দহন ক্রিয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাইরের বারুদের স্তূপে ছড়িয়ে পড়ে। দহন ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন গ্যাস সর্বদিকে চাপ দেয়। গায়ের চাপ যদিও বিপরীত চাপের ফলে সাম্যাবস্থায় আসে, নিচের ছিদ্রের স্থানে ঐ ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হয় না, কারণ ঐখানে ঐ গ্যাসের একটা নিষ্ক্রমণের পথ রয়েছে। ঐ গ্যাসের চাপই রকেটকে ঠেলে ওপরে তোলে, জ্বালানোর আগে ওটা যে দিকে মুখ করে ছিল সেই দিকে।"

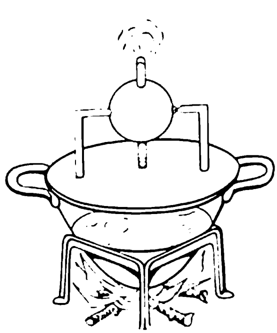
বন্দুকের থেকে যখন কোনো বস্তু ছোঁড়া হয় তখনও একই জিনিস ঘটে। বস্তুটি সামনের দিকে ছুটে যায় আর বন্দুকটি পেছনে যায়। রাইফেল বা অন্য কোনো আগ্নেয়াস্ত্রের পশ্চাদগমন বিবেচনা করা যাক। আমাদের বন্দুক যদি বায়ুমণ্ডলে ঝোলানো থাকে, এবং কোনো কিছুর উপর দাঁড় করানো বা ঠেস

দেওয়া না হয়, তবে গুলি ছোঁড়ার পর বন্দুকটা পেছনে চলে যাবে আর এই পশ্চাদগমনের বেগ হবে বস্তুটি বা গুলি অপেক্ষা ওর ভর যতগুণ বেশি ঠিক তত গুণ কম।

জুল ভার্নের 'আপসাইড ডাউন' নামক বিজ্ঞাননির্ভর উপন্যাসে এর বীরেরা "পৃথিবীর অক্ষরেখাকে সরলরেখায় আনার জন্য" ভয়ংকর কামানের পশ্চাদগমনের দুঃসাহসিক পরিকল্পনা নিয়েছিলেন।

রকেটও বন্দুকের মতই, তফাত কেবল এই, কোনো বস্তুকে উৎক্ষিপ্ত না করে এটা দাহ্য গ্যাসের চাকতে নির্গমন ঘটায়। দেওয়ালীর সময় তোমরা যে চরকি ঘুরতে দেখ তাও এই প্রক্রিয়ায় ঘটে। চরকির চাকার সঙ্গে সংলগ্ন পলতেতে যখন আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় তখন দহনের ফলে উৎপন্ন গ্যাস একটা পথ বেয়ে বেরিয়ে আসে আর তার বিপরীত দিকে পলতে সংলগ্ন চাকা ঘোরে। প্রকৃতপক্ষে, এটা সেগনারের (Segner) চাকা বলে খ্যাত পদার্থবিদ্যার যন্ত্রেরই একটু রদবদল।

চিত্র 6



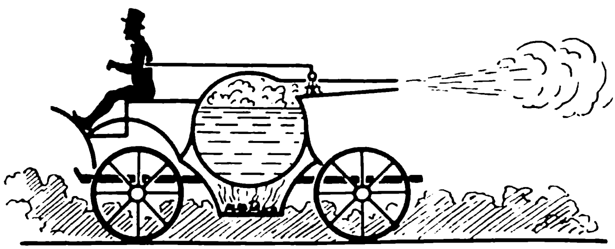
পৃথিবীর প্রাচীনতম বাষ্পচালিত যন্ত্র বা টারবাইন যার আবিষ্কার লোককাহিনী অনুসারে আলেকজান্দ্রিয়ার হেরনের উপর আরোপিত হয়েছে (সিরকা 200)।

খুবই আশ্চর্যের কথা যে, বাষ্পীয় জাহাজ আবিষ্কারের পূর্বে একই নিয়মে যান্ত্রিকভাবে জাহাজ চালানোর পরিকল্পনা করা হয়। পরিকল্পনা ছিল উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন পাম্প থেকে সরু পথে জল তোড়ে বার করে দেওয়া যাতে জাহাজটা উল্টো পথে সামনে এগোয়; স্কুলের পদার্থ বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারেও নিয়মটি বোঝানোর জন্য অনুরূপভাবে জলে ভাসমান টিনের খণ্ড পরীক্ষা করে দেখানো হয়। সেই সময় পরিকল্পনাটি সেরকমভাবে সমাদৃত হয় নি, কিন্তু পদার্থবিদ্যার এই নিয়মকে আশ্রয় করেই ফুলটনের (Fulton) বাষ্পীয় জাহাজের আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল।

আমরা এও জানি যে, আলেকজান্দ্রিয়ার হেরনের (Heron) আবিষ্কৃত দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রাচীনতম বাষ্পীয় ইঞ্জিনও পদার্থবিদ্যার এই নিয়মকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল। অনুভূমিক ভাবে রক্ষিত একটা গোলকে নলের মধ্য দিয়ে বয়লারের বাষ্প পাঠানো হয়। উপর দিয়ে নিষ্ক্রমণের সময় বাষ্প এই নলগুলোকে বিপরীত দিকে ধাক্কা দেয়। ফলে গোলকটি ঘোরে। দুর্ভাগ্যক্রমে, হেরনের বাষ্পীয় চক্রযান (টারবাইন) কৌতূহল উদ্দীপক খেলনাই রয়ে গেল। তার কারণ অবশ্য তখন শ্রম ছিল অত্যন্ত সুলভ তাই যন্ত্রের ব্যবহার লোকে পছন্দ করত না। সে যাই হোক, এর মূল নীতি লোকে বিস্মৃত হয় নি। আজকে জেট চক্রযান নির্মাণে ঐ নীতি-ই অনুসরণ করা হয়।

"ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া" গতিসূত্রের জনক নিউটন পরিকল্পিত বলে কথিত বাষ্পচালিত মোটর গাড়ী যা প্রাচীনতম বাষ্পচালিত বাহনগুলির মধ্যে একটি তাও ঐ একই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই গাড়ীতে চাকার উপর রাখা বয়লার থেকে উদ্গত বাষ্প একদিকে যায় বয়লারটিকে অপরদিকে ঠেলে দেবার বা ধাক্কা দেবার জন্য।

চিত্র 7.



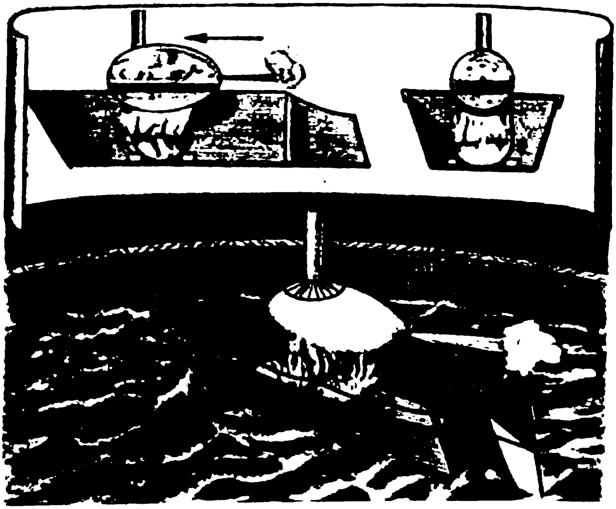
বাষ্পচালিত যান—সম্ভবত নিউটন-এর আবিষ্কারক।

আজকের রকেট যান নিউটনের যানের আধুনিক সংস্করণ। ৪নং চিত্রে নিউটনের যানের অনুরূপ কাগজের জাহাজ দেখানো হয়েছে। এর ডিমের ফাঁকা খোলার তৈরী একটা বাষ্পের বয়লার আছে।

যারা নিজে হাতে জিনিসপত্র তৈরি করতে ভালবাসে তাদের জন্য ৪নং চিত্রে নিউটনের গাড়ীর মত দেখতে একখানা কাগজের জাহাজ দেখান হয়েছে। এর বয়লার ডিমের ফাঁকা খোলা দিয়ে তৈরী, যা নিচে থেকে একটা ছোট্ট পাত্রে রাখা অ্যালকোহলে ভেজান তুলা জ্বেলে উত্তপ্ত করা হয়। ডিমের খোলা থেকে সহসা সবেগে বেরিয়ে পড়া বাষ্প জাহাজখানিকে বিপরীত দিকে ঠেলে দেয়। এই

অতীব শিক্ষাপ্রদ খেলনাটা তৈরী করতে হলে হাতের কাজে খুব পাকা হওয়া দরকার।

চিত্র ৪



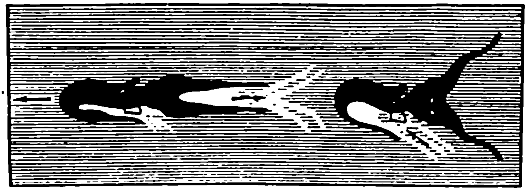
ডিমের খোলার বয়লার যুক্ত কাগজের তৈরী বাষ্পীয় জাহাজ। ছোট্ট একটা পাত্রে রাখা অ্যালকোহল থেকে তাপ সরবরাহ হয়। ডিমের খোলার বয়লার থেকে যে বাষ্প নিক্ষিপ্ত হয় তা জাহাজটিকে বিপরীত দিকে চলতে বাধ্য করে।

কাট্‌ল মাছ কিভাবে সাঁতার কাটে

একথা শুনে তোমার একটু অদ্ভুত লাগতে পারে যে, এমন বেশ কিছু প্রাণী আছে যাদের পক্ষে "নিজের চুল ধরে নিজেকে টেনে তোলা" সাঁতরানোর সাধারণ রীতি। কাট্‌ল মাছ (cuttle fish) এবং সাধারণতঃ অধিকাংশ সেফালোপোডা (cephalopoda) এইভাবে জলের মধ্যে নিজেদের সম্মুখে চালিত করে। এরা ফুলকার সাহায্যে জল টেনে নেয় পাশের একটা সংকীর্ণ ফাঁক দিয়ে এবং সামনের এক বিশেষ ধরনের নলাকার পথের সাহায্যে। তারপর তারা এই নলাকার পথ দিয়ে পিচকারীর মত জলের ধারা বার করে দেয়। প্রতিক্রিয়ার সূত্রানুসারে এটা তাদের পেছনের দিকে ধাক্কা দেয় যা তাদের দেহের পিছনের অংশকে সামনের দিকে এগিয়ে দেয়। কাট্‌ল মাছ প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে, নলাকার পথটিকে দু দিকে এবং পেছনে ঘোরাতে পারে। ফলে জলের ধারা প্রেরণ করে এরা যে দিকে খুশি যেতে বা সাঁতার কাটতে পারে।

জেলি ফিসও একই ভাবে চলে। পেশীগুলো সংকুচিত করে এরা ছাতার মত দেহের নিচে থেকে জল ছাড়ে। ফলে একটা ধাক্কা খায়। ড্রাগন মাছির

চিত্র 9



কাট্‌ল মাছ কি ভাবে সাঁতার কাটে।

শুককীট এবং আরও কিছু জলচর প্রাণী একই ভাবে সাঁতার দেয়। তবু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নিয়মের কার্যকারিতা নিয়ে আমাদের সন্দেহ!

রকেটের নক্ষত্রে পাড়ি*

চাঁদে অভিযান বা গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাত্রার মত রোমাঞ্চকর অভিযান আর কি হতে পারে? এই নিয়ে কত না বিজ্ঞানের কল্পিত কাহিনী রচিত হয়েছে। ভোল্তেয়ারের মাইক্রোমেগাস (Micromegas), জুল ভার্নের 'এ জার্নি টু দি মুন' (A Journey to the Moon) এবং হেক্টর সেরভাডেক (Hector Servadec), এইচ. জি. ওয়েল্‌স্‌-এর 'দি ফার্স্ট ম্যান ইন দি মুন' (The First Man in the Moon) এবং এঁদের চেয়ে কম প্রতিভাসম্পন্ন আরো কত লেখকের কত গল্প! কল্পনায় তাঁরা আমাদের নিয়ে গেছেন রোমাঞ্চকর যাত্রার মধ্য দিয়ে দূরের জ্যোতিষ্কলোকে। তার কারণ অবশ্য আমরা এখনো আমাদের নিজেদের গ্রহে বন্দী হয়ে আছি।

আমরা কি মানুষের এই যুগ-যুগান্তরের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারি না? যা অনেকাংশে বাস্তবের কাছাকাছি, সেই সব কল্প-বিজ্ঞানের লেখকদের সচতুর পরিকল্পনাগুলো কি কোনোদিন সার্থক হবে না?

আন্তগ্রহে যাত্রার আজগুবি পরিকল্পনাগুলো নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে। এখন আমরা রুশ বিজ্ঞানী কনস্টান্টিন জিওলকোভস্কির সর্বপ্রথম দেওয়া সম্পূর্ণ বাস্তবসম্মত পরিকল্পনাটা আলোচনা করি।

* যদিও আজকে আমরা রকেটের যুগেই বাস করছি, পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ নিয়মিত শূন্যে পাড়ি দিচ্ছে, মানুষ চাঁদে নেমেছে, চাঁদের নুড়ি-পাথর কুড়িয়ে এনেছে, মহাকাশের ও প্রতিবেশী গ্রহদের নিয়ে নানা গবেষণা চলছে তবুও মহাকাশে পাড়ি সংক্রান্ত এই আনুষঙ্গিক অধ্যায়গুলি তুলে ধরা হল এই কারণে যে, ঐতিহাসিক দিক থেকে এই অধ্যায়গুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। —স.

উড়োজাহাজে চড়ে চাঁদে পাড়ি দেওয়া কি সম্ভব ? অবশ্যই না। প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রকার উড়োজাহাজ ওড়ে তার কারণ তারা বাতাসে ভাসে এবং বাতাস কেটে এগিয়ে যায়। পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যে কোনো বাতাস নেই। সাধারণভাবে উড়োজাহাজের আন্তর্গ্রহ যাত্রার উপযোগী কোনো ঘন মাধ্যম নেই। সুতরাং এমন একটা যান আবিষ্কার করা প্রয়োজন, যা মাধ্যম ছাড়াই উড়তে পারবে। খেলনা রকেট নামক এই ধরনের যানের কথা আগেই বলা হয়েছে। বিশেষ ধরনের কক্ষ-বিশিষ্ট এবং মানুষ, খাবার ও বাতাসের জালা সম্বলিত এমন এক বিরাট রকেট আমরা কি উদ্ভাবন করতে পারি না ? কল্পনা করা যাক, এই ধরনের দৈত্যাকার রকেটে জ্বালানী রাখার বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে এবং রকেটটি যে কোনো দিকে প্রভূত পরিমাণে গ্যাসের প্রচণ্ড চাপে বিস্ফোরণ ঘটাবে। মহাশূন্যে পাড়ি দেবার জন্য এটাই হবে আদর্শ-যান যা আমাদের চাঁদে বা অন্য গ্রহে নিয়ে গিয়ে হাজির করবে। গ্যাসের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এর অভিযাত্রীরা ক্রমে ক্রমে এর গতি এমনভাবে ত্বরান্বিত করতে পারবে যে কোনো ক্ষতি হবে না। কোনো গ্রহে অবতরণ করতে হলেও তারা এর গতি মন্দীভূত করতে পারবে যাতে ধীরে ধীরে অনায়াসে নামা যায়। আবার পৃথিবীতে ফিরে আসার জন্য তারা একই প্রক্রিয়ার আশ্রয় নেবে।

আধুনিক যুগে উড়োজাহাজ ভয়ে ভয়ে সেই পথেই পা বাড়িয়েছে। আজকে উড়োজাহাজ পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে যাচ্ছে, মরুভূমি-সাগর পার হয়ে যাচ্ছে। আমরা কি কল্পনা করতে পারি না, 20 বছর কি 30 বছরের মধ্যে আন্তর্গ্রহ যাত্রায় অনুরূপ সাফল্য অর্জন করা যাবে ? তাহলে মানুষ, অবশেষে, স্মরণাতীত কাল থেকে যে অদৃশ্য শৃঙ্খল তাকে এই পৃথিবী-রূপ গ্রহে শৃঙ্খলিত করে রেখেছে তাকে ছিন্ন করতে পারবে এবং বিশ্বের অনন্ত নাগালের মধ্যে গিয়ে পেঁছবে !

পরিচ্ছেদ ২

বল-কার্য-ঘর্ষণ

ক্রিলভ (Krylov)-এর উপকথার সমস্যা

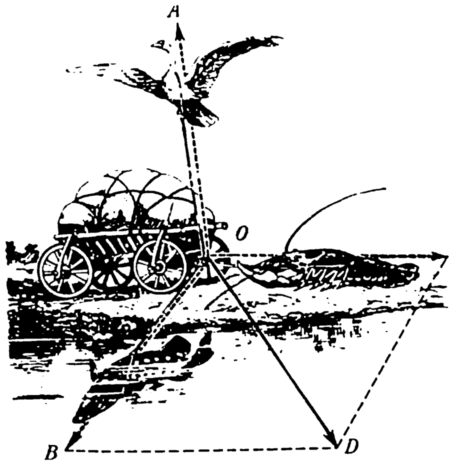
উনবিংশ শতাব্দীর রুশ লেখক আইভান ক্রিলভ (Ivan Krylov) "কি ভাবে রাজহাঁস, বাগ্দা চিংড়ি ও বাইন মাছ একটা গাড়ী চালাতে চেয়েছিল" শীর্ষক উপকথার একটা রূপ খাড়া করেন। আমার মনে হয় না তোমরা কেউ বলবিদ্যার দিক থেকে গল্পটা বিচার করে দেখেছ। ফলটা দাঁড়াবে তাহলে সম্পূর্ণ অন্যরকম। উপকথাটি বলবিদ্যার একটা সমস্যা সৃষ্টি করেছে। কতিপয় বল পরস্পরের সঙ্গে বিভিন্ন কোণে ক্রিয়াশীল। রাজহাঁস গাড়িটাকে উপরে টানছে, বাগদা চিংড়ি পেছনে, আর বাইন মাছ টানছে নদীর মধ্যে। 10 নং চিত্রে এই তিনটি পরস্পর ক্রিয়াশীল বল প্রদর্শিত হয়েছে। রাজহাঁসের উপরের দিকে টান (OA), বাইনের পার্শ্বটান (OB) এবং বাগদা চিংড়ীর পেছনের দিকে টান (OC)। ভুলে যেও না চতুর্থ আর একটা বলও কাজ করছে—এটা গাড়ীর নিজের ভার যা নিচের দিকে ক্রিয়াশীল। ক্রিলভ দাবি করেছেন যে, গাড়ীটা যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে গেল। অন্যকথায়, গাড়িটির উপর প্রযুক্ত এই সব কটি বলের লব্ধি শূন্য।

সত্যিই কি তাই? রাজহাঁস উপরে টানছে। কিন্তু বাগদা চিংড়ি ও বাইনের দিকে নয়। বিপরীতপক্ষে, এ বরং তাদের সাহায্যই করছে। তার কারণ রাজহাঁসের টান পৃথিবীর অভিকর্ষের টানের বিপরীতমুখী হওয়ায় চাকা এবং মাটির ঘর্ষণজনিত বল কমিয়ে দিচ্ছে এবং চাকা ও তাদের অক্ষের মধ্যে ঘর্ষণজনিত বল কমিয়ে দিচ্ছে। এইভাবে গাড়ির নিজের ভার কমে যাচ্ছে এবং সম্ভবত কিছুই থাকছে না—কারণ উপকথার বর্ণনা অনুসারে গাড়িটা ছিল খুবই হালকা। ব্যাপারটা আরও সহজ করার জন্য অনুমান করা যাক যে, রাজহাঁসের টান সত্যি সত্যিই গাড়ির ভার হারিয়ে দিচ্ছে। এর অর্থ দাঁড়ায় আমাদের আর দুটি বল থাকে—বাগদা চিংড়ির টান এবং বাইন মাছের টান। উপকথা থেকে আমরা এও জানতে পারছি এই দুটি বল কোন্ কোন্ দিকে প্রযুক্ত হচ্ছে—বাগদা চিংড়ি গাড়িটিকে পেছনের দিকে টানছে এবং বাইন মাছ

টানছে জলের ভিতরের দিকে। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, নদীটা পাশে ছিল এবং গাড়ীর সামনে ছিল না। কারণ উপকথায় যাই বলা হোক না কেন, ক্রিলভের তিন শ্রমিক নিশ্চয়ই চায়নি গাড়িটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে জলে ফেলে দিতে। অতএব বাগ্‌দা চিংড়ির টান ও বাইনের টান নিশ্চয় পরস্পর কোণ করে আছে। একবারও যদি প্রযুক্ত বলগুলি এক এবং অভিন্ন দিকে কার্যকরী না হয় তাহলে তাদের লব্ধি শূন্য হতে পারে না।

বলবিদ্যার (mechanics) নিয়ম প্রয়োগ করে আমরা *OB* ও *OC*-কে নিয়ে বলের সামান্তরিক অংকন করি। তাহলে চিত্রের কর্ণ *OD*, বলের লব্ধির দিক ও মান নির্দেশ করছে। এটা বোঝা খুবই সহজ যে, এই লব্ধি বল গাড়িটাকে আরও চলতে সাহায্য করবে, কারণ গাড়িটার ভার আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে রাজহাঁসের টানে নিষ্ক্রিয় হয়েছে। পরবর্তী প্রশ্ন দাঁড়ায়ঃ কোন্ দিকে গাড়িটা চলতে শুরু করবে—সামনে, পেছনে না পাশে? এটা স্বাভাবিকভাবেই নির্ভর করছে দুটি বলের অনুপাত ও তাদের অন্তবর্তী কোণের মানের উপর।

চিত্র 10



ক্রিলভের রাজহাঁস-বাগ্‌দা চিংড়ি ও বাইনের সমস্যার বলবিদ্যার নিয়মে সমাধান। লব্ধি বল (OD) গাড়িটিকে নদীতে নিয়ে ফেলবে।

তোমাদের মধ্যে যারা পূর্বে একাধিক বলের লব্ধি নির্ণয় এবং বলের বিভক্তাংশ (বা উপাংশ) নির্ণয় করেছো তারা উপলব্ধি করবে, এমন কি যদি রাজহাঁসের টান গাড়িটির ওজনের তুল্য নাও হয় তবুও গাড়িটি থেমে থাকতে পারে না। গাড়িটা কিন্তু আদৌ নড়বে না যদি চাকা ও অক্ষের মধ্যে ঘর্ষণ-

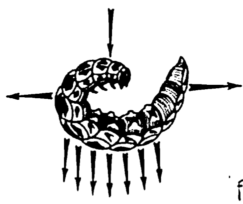
জনিত বাধা এবং চাকা ও মাটির মধ্যে ঘর্ষণজনিত বাধা প্রযুক্ত বল অপেক্ষা বেশি হয়। সে ক্ষেত্রে ক্রিলভ যেমন দাবি করেছেন—গাড়িটি অত হালকা মনে হবে না। সে যাই হোক না কেন, গাড়িটা থেমে থাকবে—কবির এই ধারণার কোনো যুক্তি নেই—যদিও তাতে গল্পের উপদেশ কিছু বদলাচ্ছে না।

ক্রিলভের যুক্তির বিরুদ্ধে

ক্রিলভের গল্পের উপদেশ হল: বন্ধুরা যখন পরস্পর বিবাদ করে টানাটানি করে মরে তখন কোনো কার্যসিদ্ধি হয় না। কিন্তু বলবিদ্যার নিয়মের সঙ্গে এ যুক্তির সব সময়ে মিল নেই। সবকটি বল একদিকে নাও প্রযুক্ত হতে পারে, কিন্তু তাতেও কিছু না কিছু ফল পাওয়া যাবে। তোমরা বোধ হয় অল্পসংখ্যক মানুষই জান যে, ক্রিলভ নিজেই যে নিরলস কর্মী পিঁপড়েদের কর্মকে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখিয়েছেন, তারাও যে কর্ম পদ্ধতির তিনি উপহাস করেছেন সেই কর্মপদ্ধতি অনুসারে নিরন্তর কাজ করে এবং কাজ সমাধাও হয়। আবার এটা হচ্ছে বলসমূহের লব্ধির নিয়মের জন্য। কর্মরত পিঁপড়েদের কাজ যদি তোমরা একটু খুঁটিয়ে দেখ, দেখবে তাদের আনুমানিক তথাকথিত সচতুর সমবায় গল্প-গাথাই, কারণ কাজ প্রতিটি পিঁপড়ে পৃথক পৃথক ভাবেই করে, অন্যরা কি করছে তার চিন্তাও করে না।

প্রাণিবিদ ইলাচিচ তাঁর 'সহজপ্রবৃত্তি' (Instinct) শীর্ষক গ্রন্থে কর্মরত পিঁপড়ের কাজ এইভাবে বর্ণনা করেছেন:

চিত্র 11

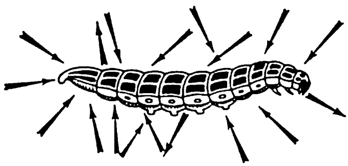


পিঁপড়েরা একটা শুঁয়োপোকা টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

"মসৃণ তলে যখন কয়েক ডজন পিঁপড়ে তলের উপর দিয়ে একটা বড় বস্তু টেনে নিয়ে যায়, তখন তারা সকলে একই ভাবে কাজ করে এবং এই কাজ লক্ষ্য করে তোমরা বলবে ওরা যৌথভাবে কাজ করে। এখন ধরা যাক, তাদের টেনে নিয়ে যাবার ট্রলি বা বস্তু উদাহরণ স্বরূপ একটা শুঁয়াপোকা। এখন নিয়ে যেতে গিয়ে পথে একটা ঘাসের বা একটা পাথরের নুড়ির বাধা পড়ল। বাধাটা পোকাটিকে নিয়ে যেতে হলে অবশ্যই সরাতে হবে। নচেৎ পোকাটিকে আর সামনে নিয়ে যাওয়া যাবে না। এক্ষেত্রেই তোমরা লক্ষ্য করবে প্রতিটি পিঁপড়ে ভিন্ন

ভিন্ন ভাবে কিভাবে বাধাটা অপসারণ করতে চাইছে, কেউই অপর অপর সঙ্গীদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজের কথা ভাবছে না। কোনোটা ডানদিকে টানছে, কোনোটা বাঁয়ে, কোনোটা সামনে, কোনোটা বা পেছনে। কখনো কখনো তারা স্থানও

চিত্র 12

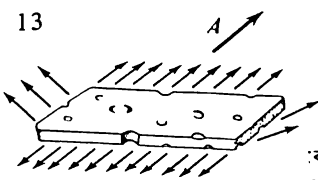


পিঁপড়েরা কিভাবে কাজ করে। তীরচিহ্ন দিয়ে প্রতিটি পিঁপড়ের কাজের আনুমানিক দিক নির্দেশ করা হয়েছে।

পরিবর্তন করছে, অন্য কোনো স্থানে শুঁয়াপোকাটিকে ধরছে কিন্তু প্রতিটি পিঁপড়ে টানছে বা ধাক্কা মারছে নিজে নিজে, অন্য কোনো পিঁপড়ের সহযোগিতায় নয়। শেষে যখন এমন ঘটবে যে, পিঁপড়েদের বলগুলি এমনভাবে প্রযুক্ত হবে যে, চারটি পিঁপড়ে টানছে একদিকে আর অপর ছয়টি টানছে আর একদিকে, তাহলে ঘটনাক্রমে ছয়টি পিঁপড়ে যে দিকে টানছে, শুঁয়াপোকাটি সেই দিকেই যাবে। এমনটি ঘটবে অপর চারটি পিঁপড়ে রোধজনিত বিপরীত বল প্রয়োগ সত্ত্বেও।"

পিঁপড়েদের কাজের আর একটা শিক্ষামূলক দৃষ্টান্ত দিই। 13 নং চিত্রে দেখান হয়েছে আয়তাকার একটি পনিরের টুকরো 25টি পিঁপড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। পনিরের টুকরোটা *A* তীরচিহ্ন দ্বারা নির্দেশিত দিকে ধীরে ধীরে চলেছে। তোমরা মনে করতে পার, যখন সামনের সারির পিঁপড়েরা তাদের সামনের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে তখন পিছনের সারির পিঁপড়েরাও তাকে সামনের দিকে ঠেলছে এবং পাশের সারির পিঁপড়েরা তাদের সহযাত্রীদের সাহায্য করে চলেছে। কিন্তু

চিত্র 13



কিভাবে পিঁপড়েরা **A** তীরচিহ্ন নির্দেশিত পথে পনিরের টুকরো টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

ঘটনাটা মোটেই তা নয়। একটা ছুরি নিয়ে পেছনের সারিটা ভেঙে দাও, দেখবে পনিরের টুকরোটা আরও দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। এটাই প্রমাণ করে যে, পেছনের সারির

3-0407

10টি পিঁপড়ে টুকরোটাকে পেছনের দিকে টানছিল, সামনের দিকে ঠেলছিল না। মোট কথা, প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পেছনের দিকে টেনে পনিরের টুকরোটাকে গর্তে নিয়ে যেতে চাইছে। ফলে, পেছনের সারির পিঁপড়েরা সামনের সারির পিঁপড়েদের কোনো সাহায্যেই আসছে না, বরং তাদের শ্রম বাড়িয়ে তুলছে। প্রকৃতপক্ষে, পনিরের টুকরোটা নিয়ে যাবার জন্য 4টি পিঁপড়েই যথেষ্ট, কিন্তু যেহেতু তাদের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা নেই, 25টি পিঁপড়ের প্রয়োজন হচ্ছে পনিরের টুকরোটাকে সামনে নিয়ে যাবার জন্য।

মার্ক টোয়েন ঘটনাক্রমে পিঁপড়ের মধ্যে এই বিশিষ্ট 'সহযোগিতা' লক্ষ্য করেছেন। একটা পিঁপড়ে ভাগ্যক্রমে একটা ফড়িং-এর ঠ্যাং পেয়ে যাওয়ায় ওদের দু'জনের মধ্যে কি রকম মারামারি লেগে গেল তা লিখতে গিয়ে মার্ক টোয়েন লিখলেন:

"...পিঁপড়ে দুটিতে ফড়িং-এর ঠ্যাং-এর দুই প্রান্ত গিয়ে ধরল। নিজ নিজ যথাসাধ্য শক্তি নিয়ে টানাটানি শুরু করে দিল দুই বিপরীত দিকে। তারা চিন্তা করে স্থির করল কোনো একটা অঘটন ঘটেছে, কিন্তু কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না সেটা কি। পরস্পরের প্রতি দোষারোপ শুরু হয়ে গেল, নিজেরা উত্তেজিত হয়ে উঠল, মুখের ঝগড়া শেষে মারামারিতে এসে দাঁড়াল। ঝগড়া মিটলে আবার তারা পাগলের মত টানাটানি শুরু করল, কিন্তু আহত পিঁপড়েটা অসুবিধায় পড়ল; অন্য পিঁপড়েটা তখন তাকে শুদ্ধ টেনে নিয়ে চলল শেষ পর্যন্ত। আহত পিঁপড়েটা ছেড়ে দেওয়া দূরে থাক, ঝুলতে থাকল ফড়িং-এর ঠ্যাং-এর উপর..."
যদিও টোয়েন কৌতুক উদ্রেক করার চেষ্টা করেছেন, মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি কিন্তু যথার্থই বলেছেন:

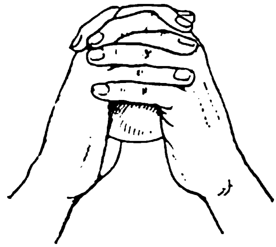
"কেউ না দেখলে লোকে কাজ করে না এবং যখন একজন পর্যবেক্ষক পরমাগ্রহে কোনো কাজ সবিশেষ লক্ষ্য করছে বলে মনে হয়—তখন সে কাজ করে।"

ডিমের খোলা ভাঙা

ঊনবিংশ শতাব্দীর রুশ লেখক গোগোলের 'ডেড সৌলস্' (মৃত আত্মারা) উপন্যাসের প্রবল বুদ্ধিজীবী চরিত্র কিফা মোকিয়েভিচ্ তাঁর দার্শনিক প্রশ্নগুলির মধ্যে অন্যতম যে প্রশ্নটির সমাধান নিয়ে মাথা খুঁড়ে মরেছেন তা হল: "হাতীরা যদি ডিমের ভিতরে জন্মায়, তা হলে সেই ডিমের খোলাগুলো নিশ্চয়ই খুব পুরু হবে? আমার সুদৃঢ় ধারণা কামানের গোলাও তাকে বিদ্ধ করতে পারবে না এবং ওটা ভেদ করার জন্য নতুন আগ্নেয়াস্ত্র আবিষ্কারের প্রয়োজন হবে।"

আমার দৃঢ় ধারণা গোগোলের দার্শনিক বিস্ময়াবিভূত হতেন যদি তাঁকে বলা হত যে, সাধারণ ডিমের খোলা সাধারণভাবে যতটা মনে হয় অতটা ভঙ্গুর নয়। 14 নং চিত্রে প্রদর্শিত উপায়ে হাতের দুই তালুর মধ্যে রেখে ওকে ভাঙা

খুবই শক্ত। ওটা ভাঙতে বেশ বলের প্রয়োজন হবে। (যদি কখনো চেষ্টা কর, ছিটকে আসা খোলার টুকরো থেকে সাবধান থাকবে)।

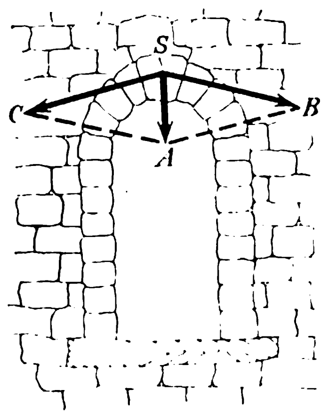


চিত্র 14. এইভাবে ডিম ভাঙার জন্য বিশেষ বলের প্রয়োজন।

ডিমের খোলা অত শক্ত কেন ? একমাত্র ওটা বক্র আকারের বলে। ভল্ট বা আর্চের শক্তিও ঐ একই কারণে।

15 নং চিত্রে একটা ছোট পাথরের তৈরী জানালার খিলান দেখান হয়েছে। *S* ভার (এর উপরের পাথরের ভার), *A* তীর চিহ্ন দ্বারা সূচিত দিকে বল প্রয়োগ করছে। কিন্তু উপরের ভার পড়ে যাচ্ছে না এর অমন আর্চের মত আকার বলে। এটা কেবলমাত্র পাশের দুই প্রতিবেশীর উপর চাপ দিচ্ছে। *A* বলকে বলের সামান্তরিক সূত্রানুসারে *C* এবং *D* তীর চিহ্ন দ্বারা নির্দেশিত দুই বিভক্তাংশে ভাগ করা যায়। এই দুই বল সংলগ্ন পাথরের রোধে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাচ্ছে। তারা আবার অন্যদের মধ্যে পিষ্ট হচ্ছে। এইজন্য আর্চের উপর

চিত্র 15. খিলান বা আর্চ অত শক্ত কেন ?



থেকে নিম্নাভিমুখে ক্রীয়াশীল বল ওকে ভাঙতে পারছে না। বিপরীত পক্ষে, আর্চটিকে সহজেই ভাঙা যাবে যদি ভেতরের দিক থেকে উপরের দিকে বল প্রয়োগ করা হয়।

ইটগুলি গোঁজের মত আকৃতি নেওয়ায় তারা নিচের দিকে ভেঙে না পড়লেও, এটাকে উপরের দিকে ঠেলে দেওয়া বন্ধ হচ্ছে না।

আমাদের ডিমের খোলাও একটা আর্চ বিশেষ, পার্থক্য কেবল এই যে, এটার সব দিকই বক্রাকার। বাইরের বল, যা তোমরা মনে কর, অত সহজে ওকে ভাঙতে পারে না। ওক্ কাঠের তৈরী একটা টেবিলকে চারটে পায়ার নিচে চারটে ডিম রেখে সহজেই বসানো যায়, ডিমগুলো ভাঙবে না। (প্লাস্টার অব প্যারিসের উপর ডিমগুলো বসিয়ে নিলে ভালো হয়, ডিমের খোলার চুনে ওটা সহজেই আটকে যাবে)।

এখন তোমরা সহজেই বুঝতে পারছ, কেন মুরগীর নিজের দেহের চাপে ডিম ভেঙে যাবে ডিমে তা দেবার সময়—এই ভয় পাবার কোনো প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সদ্যভূমিষ্ঠ মুরগীর বাচ্চারা ডিমের ভেতর থেকে সহজেই খোলা ভেঙে 'প্রকৃতির জেলখানা' থেকে বেরিয়ে আসে।

চামচে দিয়ে পাশে ঘা মেরে ডিমের উপরের খোলা ভাঙতে গেলে তোমরা বিশ্বাস করতে পারবে না যে, প্রকৃতির চাপ ডিম কিভাবে রোধ করে। প্রকৃতি অভ্যন্তরীণ ভ্রূণের বৃদ্ধির জন্য কি সূক্ষ্ম অথচ শক্ত বর্মই না সৃষ্টি করেছে।

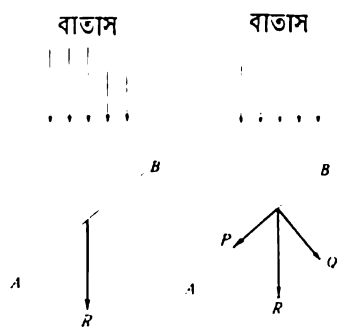
ডিমের খোলা আপাতদৃষ্টিতে ভঙ্গুর তড়িৎ-বাল্বেরও অলৌকিক শক্তির ব্যাখ্যা দেয়। ভাবলে আরও বিস্মিত হতে হয় যে, বাইরের বাতাসের যথেষ্ট চাপ রোধ করার জন্য তড়িৎ-বাল্বের ভেতর কিছুই থাকে না। শুনলে তোমরা বিস্মিত হবে যে, 10 সেমি একটা তড়িৎ-বাল্ব একজন পরিণত আকারের মানুষের ওজনের সমান 75 কেজি-রও বেশি সম্মিলিত চাপ রোধ করতে পারে। ঘটনাক্রমে, পরীক্ষা করে দেখানো হয়েছে যে, একটা বাল্বের চেয়েও $2\frac{1}{2}$ গুণ বেশি চাপ সহ্য করতে পারে।

পালের সাহায্যে জাহাজের প্রায় প্রতিবাত গতি

পালের সাহায্যে বাতাসের প্রায় বিরুদ্ধে জাহাজ চলে কিভাবে নাবিককে প্রশ্ন করলে বলবে, পালের সাহায্যে সরাসরি বাতাসের বিরুদ্ধে জাহাজ চালনা করা যায় না, কিন্তু বাতাস যে দিকে বইছে সেই দিকের সঙ্গে সূক্ষ্মকোণ করে বাতাসের বিপক্ষে জাহাজ চালান যায়। এই সূক্ষ্মকোণের কৌণিক মান অবশ্য হবে খুবই কম, এক সমকোণের এক-চতুর্থাংশ মাত্র। এটা বোঝা কঠিন যে বাতাসের সরাসরি ঠিক বিপরীত দিকে যাওয়ার আর বাতাসের দিকের সঙ্গে মাত্র 22° কোণ করে যাওয়ার মধ্যে কি পার্থক্য থাকতে পারে।

পার্থক্য অবশ্যই আছে এবং বুঝিয়ে বলব কিভাবে জাহাজ বাতাসের বলের সাহায্য পায় এই সূক্ষ্মকোণ করে অগ্রসর হলে, বাতাসের বিরুদ্ধে অগ্রসর হবার

সময়। প্রথমে দেখা যাক, বাতাস কিভাবে জাহাজের পালের উপর কাজ করে ; অন্যভাবে বলতে গেলে, বাতাস কিভাবে পালটা ঠেলে যখন ওর বিপরীত দিকে বইতে থাকে। তোমরা মনে করছ, বাতাস যে দিকে বয় সেইদিকেই পালকে ঠেলে। বস্তুত তা নয়। বাতাস যে দিকেই বয়ে যাক না কেন, সে সব সময়ই পালের তলের সঙ্গে সমকোণে বা লম্বালম্বিভাবে পালকে ঠেলা দেবে। মনে করা যাক, 16 নং চিত্রে যেভাবে দেখান হয়েছে, বাতাসের দিক তীর চিহ্ন দিয়ে দেখান হচ্ছে, *AB* রেখা পাল প্রদর্শন করছে। যেহেতু বাতাস সমভাবে পালের উপরিভাগে চাপ দিচ্ছে, আমরা বাতাসের চাপকে *R* দ্বারা দেখাতে পারি যা



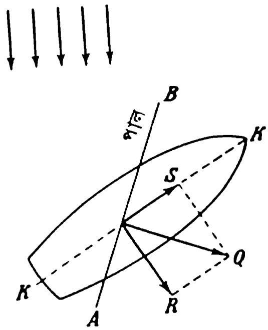
চিত্র 16. বাতাস সবসময় পালের তলের সঙ্গে সমকোণে পালকে ঠেলবে।

পালের মধ্যভাগে প্রযুক্ত হচ্ছে। এই বলকে উপাংশে ভাগ করে আমরা *Q* বল পাই, যা পালের উপর লম্ব এবং *P* বল পাই যা এর তল বরাবর ক্রিয়া করছে। (16 নং চিত্রের ডান অংশ) দ্বিতীয়টি পালটিকে একটুও ঠেলছে না কারণ বাতাস ও পালের ক্যানভাসের মধ্যে ঘর্ষণজনিত বল আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি। তাহলে থাকছে *Q* বল, যা জাহাজের পালকে এর সঙ্গে সমকোণে ঠেলবে।

এটুকু বুঝলেই আমরা সহজেই ধরতে পারব কোনো জাহাজ বাতাসের সঙ্গে সূক্ষ্ম কোণ করে কিভাবে বাতাসের বিপরীত দিকে যেতে পারে। ধরা যাক 17 নং চিত্রের *KK* রেখা জাহাজের তলের মাঝ বরাবর রেখা। বাতাস তীর চিহ্ন দ্বারা প্রদর্শিত রেখা বরাবর জাহাজের এই রেখার সঙ্গে সূক্ষ্মকোণে বইছে। *AB* জাহাজের পাল। পালটি এমনভাবে আছে যে, এর তল জাহাজের তলার *KK* রেখা ও বাতাসের দিকের সঙ্গে সৃষ্ট কোণকে সমদ্বিখণ্ডিত করেছে। এখন বল কি ভাবে বিভক্ত হবে 17 নং চিত্রে তা দেখান হয়েছে। বাতাসের পালের উপর চাপকে *Q* বল দ্বারা সূচিত করা হচ্ছে। এই *Q* বল, আমরা জানি, পালের সঙ্গে

লম্বভাবে আছে। এখন বলকে ভাঙলে আমরা পাই *R* বল যা জাহাজের তলায় মাঝ বরাবর রেখার সঙ্গে লম্ব আর বল *S* যা ঐ জাহাজের তলের মাঝ বরাবর

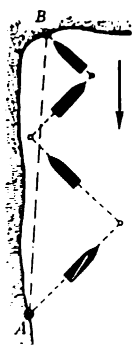
চিত্র 17



প্রায় প্রতিবাত গতিতে কিভাবে জাহাজ চালানো যায়।

রেখা ধরে প্রযুক্ত হচ্ছে। এখন যেহেতু জাহাজের *R* দিকে চলন জলের প্রচণ্ড রোধ (জাহাজের তল জলের অনেকখানি নিচে থাকে।) বোধ করছে, *R* বল

চিত্র 18



পালতোলা হাল্কা নৌকার তির্যকভাবে প্রতিবাত গতি।

জলের রোধ দ্বারা প্রায় সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে। তাহলে থাকছে শুধু *S* বল, যা সম্মুখবর্তী এবং যা বাতাসের বিরুদ্ধেও জাহাজকে ঠেলে নিয়ে যাবে (এই *S* বল বৃহত্তম হবে যখন পালের তল জাহাজের তলের রেখা এবং বাতাসের মধ্যে উৎপন্ন কোণকে সমদ্বিখণ্ডিত করতে পারবে)। সাধারণত এ কাজটা করা হয় এঁকেবেঁকে জাহাজ চালনা করে 18 নং চিত্রে যেমন দেখান হয়েছে,

যাকে নাবিকদের ভাষায় বলা হয় 'ট্যাকিং' বা জাহাজের তির্যকভাবে প্রতিবাত গতি।

আর্কিমিডিস কি কখনো পৃথিবীটা নাড়াতে পেরেছিলেন ?

"আমায় দাঁড়ানোর মত একটা জায়গা দিন, আমি পৃথিবীটা নাড়িয়ে দেব" !— প্রাচীন বিজ্ঞানী যিনি লিভারের নিয়ম আবিষ্কারের জন্য খ্যাত, গ্রীক প্রতিভাবান ব্যক্তি আর্কিমিডিস (Archimedes) না কি এক সময় উচ্চারণ করেন এ কথা। প্লুটার্ক বলেছেন, "সিরাকুজের রাজা হিয়েরোর (Hiero) আত্মীয় ও বন্ধু আর্কিমিডিস একবার লিখেছিলেন যে, এই বল যে কোনো ভার নাড়ানোর জন্য ব্যবহার করা যায়। এই যুক্তির জোরে অভিভূত হয়ে তিনি আরও বলেন, যদি আর একটা পৃথিবী থাকত, তিনি সেখানে যেতেন এবং সেখান থেকে আমাদের এই গ্রহকে উত্তোলন করতেন।"

আর্কিমিডিস জানতেন যে, লিভারের সাহায্যে মানুষ ন্যূনতম বল প্রয়োগ করে সব চেয়ে ভারী বস্তুও উত্তোলন করতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন লিভারের বৃহত্তর বাহুতে বলটা প্রয়োগ করা এবং ক্ষুদ্রতর বাহুটাকে বোঝাটার উপর কাজ করানো। সুতরাং তিনি ভেবেছিলেন অনেক বড় একটা লিভারের বৃহত্তর বাহুতে হাত দিয়ে চাপ দিয়ে তিনি পৃথিবীর ভরের সমতুল্য ভর তুলতে সক্ষম হবেন। স্পষ্টতার জন্য আমরা পৃথিবীকে 'নড়ানো' বা 'তোলা' বলতে বোঝাব পৃথিবীর তলের উপর এমন একটি ওজনকে তোলা যার ভর পৃথিবীর ভরের সমতুল্য।

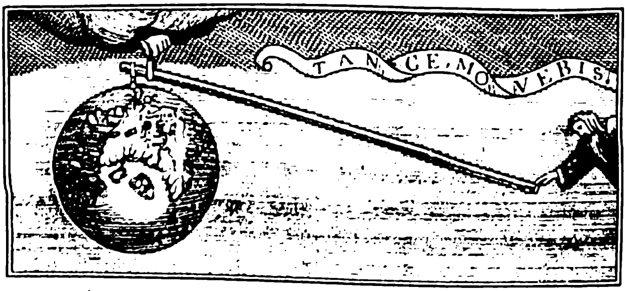
আমি বিশ্বাস করি, যদি এই প্রাচীনকালের বিশিষ্ট পণ্ডিত জানতেন পৃথিবীর কী বিপুল ভর, তা হলে তিনি নিজেই নিজের কথা প্রত্যাহার করতেন। একবার ধরা যাক যে, আর্কিমিডিসের নাগালের মধ্যে রয়েছে আর এক পৃথিবী এবং তাঁর অভিপ্রেত স্থানও তিনি খুঁজে পেয়েছেন। আরও মনে করা যাক, তিনি তাঁর মনমত দৈর্ঘ্যের লিভারও একটা তৈরি করেছেন। তা হলেও মাত্র 1 সেণ্টিমিটার পৃথিবীর সমতুল্য ভর তুলতে তাঁর কত সময় লাগত ভাবতে পার ?—ত্রিশ লক্ষ কোটি বছর এবং তার কম নয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর ভর জানেন (কি করে এটা নির্ণয় করা হয়েছিল তা জানবার জন্য আমার জ্যোতির্বিদ্যার খোস খবর* দেখ)। পৃথিবীতে এরকম ভরের কোনো বস্তুর ওজন হবে প্রায় 6,000,000,000,000,000,000,000 টন। তা হলে কোনো মানুষ যে 60 কেজি ওজন সরাসরি তুলতে পারে, তার এই ওজন তুলতে যে লিভার লাগবে তার বৃহত্তর বাহুর দৈর্ঘ্য ক্ষুদ্রতর বাহু অপেক্ষা 100,000,000,000,000,000,000,000 গুণ বড় হবে। এখন তোমরা গণনা

* ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজেস পাবলিশিং হাউস, মস্কো, 1958।

করে সহজেই দেখতে পাবে যে, ক্ষুদ্রতর বাহুর প্রান্তদেশ 1 সেমি তুলতে অপর বাহুর প্রান্তকে শূন্যে 1,000,000,000,000,000,000 কিলোমিটারের এক বিশাল বৃত্তচাপ সৃষ্টি করতে হবে। অতএব এই অসম্ভব রকমের বড় দূরত্ব আর্কিমিডিসকে ঠেলতে হত পৃথিবীকে মাত্র 1 সেন্টিমিটার তুলতে। সুতরাং কত কত কত সময় লাগত তাঁর! এমন কি এক অশ্বশক্তির সমান কাজ করতে অর্থাৎ অনুমান করা যাক, আর্কিমিডিস 60 কেজি ওজন 1 সেকেন্ডে 1 মিটার তুলতে পারলেও পৃথিবীকে মাত্র 1 সেমি তুলতে তাঁর 1,000,000,000,000,000,000,000 সেকেন্ড সময় লাগত অর্থাৎ ত্রিশ লক্ষ কোটি বছর। দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন গ্রীক পণ্ডিত আর্কিমিডিস। কিন্তু এই জীবদ্দশাতেও আর্কিমিডিস ও তাঁর কল্পিত লিভার পৃথিবীকে সূক্ষ্মতম চুল পরিমাণ অংশ তুলতে পারেনি।

চিত্র 19



"আর্কিমিডিস পৃথিবী নড়াচ্ছেন" [ভ্যরিগননের বলবিদ্যার (১৭৮৭)-র পুস্তক থেকে খোদাই চিত্র]

আর্কিমিডিসের শত পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও কোনো রকম কলাকৌশলই এই সময়কে সংক্ষিপ্ত করতে পারে না। কারণ বলবিদ্যার মহামূল্য নিয়মানুসারে যান্ত্রিক সুবিধা সব সময়ই সরণের হ্রাসের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত অথবা অন্য কথায় সময়ের সঙ্গে জড়িত। এমন কি আর্কিমিডিস যদি সেকেন্ডে 300,000 কিমি বেগেও কোনো লিভারকে ঠেলতে পারতেন—যা প্রকৃতির সবচেয়ে দ্রুততম বেগ বা আলোকের বেগ, তা হলেও তিনি পৃথিবীকে মাত্র 1 সেমি তুলতে পারতেন 1 কোটি বছর ঠেলার ফলে।

জুল ভার্নের শক্তিশালী মানুষ এবং অয়লারের (Euler) সূত্র

মাতিফুকে মনে পড়ে : জুল ভার্নের এক উপন্যাসের দৈত্যাকার চরিত্র! "তার একটা বিশাল মাথা ছিল—দৈত্যাকার চেহারার সঙ্গে বেশ মানানসই। তার

বক্ষ ছিল কামারের হাঁপরের মত, পা দুটো মোটা কাঠের স্তম্ভের মত এবং হাত দুটো ছিল বাস্তব জগতের ক্রেনের মত যার চেটো দুটো যেন মস্ত হাতুড়ী।

"মাথিয়াস সানডর্ফ (Mathious Sandorf) উপন্যাসে বর্ণিত তার কৃতিত্বের অন্যতম হল ট্রাবাকোলো (Trabacolo) জাহাজের আশ্চর্যজনক ব্যাপার, যে জাহাজকে আমাদের দৈত্য ঠিক জায়গায় রেখেছিলেন তার বলিষ্ঠ বাহুদুটির বলে। জুল ভার্নের বর্ণনাটা এই রকম ঃ

"ট্রাবাকোলো প্রায় নোঙর করতে যাচ্ছে। সামান্য একটু বাকী এবং প্রায় ছজন ছুতোর হাতুড়ী পেটায় ব্যস্ত। অলস মানুষের একটা দল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে।

"ঠিক সেই মুহূর্তে একট সুন্দর পালতোলা নৌকা পশ্চাৎভাগে দেখা গেল। যেহেতু এটাকে ট্রাবাকোলো ছাড়িয়ে বন্দরে পৌঁছতে হবে, নোঙরের কাজ সাময়িক ভাবে স্থগিত রাখা হল। কারণ যদি দুটিতে ধাক্কা লাগত, পালতোলা সুন্দর নৌকাটা ভরাডুবি হত।

"সমস্ত চোখ সুন্দর নৌকাটার দিকে চেয়ে আছে, যার সাদা পাল রোদের আলোয় সোনার মত ঝিক্‌মিক্‌ করছে। সবে এটা পার হয়ে এসেছে, একটা ভয়ের চীৎকার বাতাস ভারী করে তুলল। ট্রাবাকোলো আতঙ্কে শিউরে উঠল এবং নেমে যেতে লাগল।

"সহসা একজন মানুষ সামনে লাফিয়ে এলেন এবং গুণ টানতে শুরু করে দিলেন এবং চোখের পলকের মধ্যে মাটির কাছাকাছি এসে একটা লোহার দণ্ডের সঙ্গে গুণটাকে আচ্ছা করে জড়িয়ে দিলেন। নিজে সম্পূর্ণভাবে পিষে যাবার ঝুঁকি নিয়ে তিনি জাহাজটাকে প্রায় দশ সেকেণ্ড ধরে রেখেছিলেন যতক্ষণ না গুণটা কট করে ছিঁড়ে গেল। কিন্তু এটাই যথেষ্ট ছিল কারণ, ট্রাবাকোলো ডুবন্ত পালতোলা নৌকাটাকেও সামান্য স্পর্শ করল। এ বীর আমাদের পুরাতন বন্ধু মাতিফু ছাড়া আর কেউ নয়।"

জুল ভার্ন নিজে কত বিস্মিত হতেন যদি জানতেন মাতিফু যা করেছিল তা করার জন্য ব্যাঘ্রের বলের সমতুল্য বলশালী দৈত্য না হলেও চলে। উপায় উদ্ভাবনে দক্ষ যে কোনো মানুষই সে রকম করতে পারে।

বলবিদ্যা থেকে আমরা শিখি যে, একটা ড্রামে যদি একটা দড়ি জড়ানো হয় তাহলে ঘর্ষণজনিত যে বল উৎপন্ন হবে তা হবে প্রচণ্ড। দড়ির পাক যদি সমান্তর শ্রেণীতে বাড়ে, এই ঘর্ষণজনিত বল বৃদ্ধি পাবে গুণোত্তর শ্রেণীতে। এর অর্থ হল, একটা ছোট শিশুও কোনো খুঁটির সঙ্গে তিন চার পাক দড়ি জড়িয়ে মস্ত বোঝা ধারণ করতে পারে। নদীর ঘাটে ঠিক এই পদ্ধতিতেই কিশোর ছেলেরা শত শত যাত্রী বোঝাই নৌকাগুলোকে ঘাটে এনে নামায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর গণিতশাস্ত্রবিদ অয়লার এই ঘর্ষণজনিত বলের একটা সূত্র প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর সূত্র হল বীজগাণিতিক সংক্ষিপ্ত ভাষায়, $F=fe^{k\alpha}$ যেখানে F বলের বিরুদ্ধে আমরা f বল প্রয়োগ করছি, e, স্বাভাবিক লগারিদ্‌ম বেস 2·718···, k বদ্ধ দড়ির ঘর্ষণজনিত বলের সহগ, এবং α পাকের কৌণিক মান অথবা দড়ির দ্বারা সৃষ্ট চাপের দৈর্ঘ্যের ও তার ব্যাসার্ধের অনুপাত।

জুল ভার্নের ক্ষেত্রে সূত্রটি প্রয়োগ করলে আমরা বিস্ময়কর ফল পাই। আমাদের ক্ষেত্রে F সরে যাওয়ার সময় জাহাজের টান। উপন্যাসটি থেকে আমরা পাই জাহাজটির ভার 50 টন। জাহাজটির কাত হওয়ার অনুপাত সমগ্র জাহাজের তুলনায় 1 : 10 যদি হয়, তা হলে জাহাজের পুরো ভার নয়, মাত্র তার দশ ভাগের এক ভাগ দড়ির উপর পড়ে অর্থাৎ মাত্র 5 টন বা 5,000 কেজি। অনুমান করা যাক এক্ষেত্রে k—লোহার খুঁটির উপর দড়ির ঘর্ষণের সহগ $\frac{1}{3}$। তাহলে এর থেকে আমরা α বার করতে পারি, কারণ আমরা জানি মোতিফু দড়িটিকে খুঁটির সঙ্গে মাত্র তিনবার পাক দিয়েছিল।

সেক্ষত্রে $\alpha=\dfrac{3\times 2\pi r}{r}=6\pi$

সমীকরণটি পাবার জন্য আবার অয়লারের সূত্রে ফিরে এসে আমরা পাই :

$$5{,}000=f\times 2{\cdot}72^{\,6\pi\times\frac{1}{3}}=f\times 2{\cdot}72^{2\pi}$$

যার থেকে, আমাদের যে বলের প্রয়োজন হবে তা লগারিদ্‌ম প্রয়োগে আমরা নির্ণয় করতে পারি।

$$\log 5{,}000=\log f+2\pi\log 2{\cdot}72$$

যা থেকে পাই $f=9{\cdot}3$ কেজি

সুতরাং জাহাজটি ধরে রাখতে হলে দৈত্যকে মাত্র 10 কেজি বল প্রয়োগ করে দড়িটিকে টানতে হবে।

মনে করলে ভুল হবে যে, 10 কেজি বল ওটা কথার কথা, আদতে বল প্রয়োগ করতে হয় অনেক বেশি। পক্ষান্তরে অংকটা আরও বড় হবে, কারণ যখন নারকেলের দড়ি দিয়ে কাঠের খুঁটি বাঁধা হবে তখন ঘর্ষণের সহগ k আরও বড় হবে এবং তোমার চেষ্টা বা বল f হয়ে পড়বে অত্যন্ত ছোট। তা হলে ছোট একটা ছেলেও খুঁটির সঙ্গে তিনবার বা চারবার দড়ি জড়িয়ে জুল ভার্নের শক্তিশালী মানুষটিকেও হার মানাতে পারে।

গিঁট বাধার ফলে অতিরিক্ত ধারণ ক্ষমতা

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা অয়লারের সূত্র থেকে অনেক সুবিধা পাই। গিঁট তো ছোট বেলন বা চোঙের উপর সুতো পাক দিয়ে ছাড়া কিছু নয়। সুতোর আর একটা অংশ দিয়ে এক্ষেত্রে বেলনের কাজটা করানো হয়।

বিভিন্ন গিঁটের শক্তি, নাবিকরা যা ব্যবহার করে, ঘর্ষণের উপরই নির্ভর করে। তার বা তারের শৃঙ্খলকে বার বার জড়িয়ে যা বৃদ্ধি করা হয়, যেমন বার বার পাক দিয়ে গিঁটের শক্তি বৃদ্ধি করা হয়। যতগুলো মোড় দেওয়া হয়, যত বেশি সংখ্যায় শৃঙ্খলটিকে এর উপর জড়ানো হয় ততই পাকের কোণের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, ততই শক্ত হয় গিঁট।

বোতাম সেলাই করার সময় দর্জিও একই পন্থা অবলম্বন করে। কাপড়ের মধ্য দিয়ে সে সেলাই-এর উপর বার বার সুতো টানে, তারপর ছিঁড়ে নেয়। সুতো যতদিন শক্ত থাকে, বোতাম লেগে থাকবে। এখানেও সেই প্রচলিত নিয়ম খাটছে : পাক বৃদ্ধি পায় সমান্তর শ্রেণীতে আর যে শক্তিতে বোতামটা কাপড়ের উপর আটকে থাকে তা বৃদ্ধি পায় গুণোত্তর শ্রেণীতে। ঘর্ষণ ছাড়া আমরা কাপড়ের উপর বোতাম লাগাতে পারতাম না। ঘর্ষণ যদি না থাকত, তাদের ভার সুতোর মোড় খুলে দিত এবং তারা খসে পড়ত।

ঘর্ষণ যদি না থাকত ?

কত বিচিত্রভাবে, কত আশাতীতভাবেই না ঘর্ষণ কাজ করে। ক্ষেত্র বিশেষে এটাই মূল শক্তি, যদিও আমরা কল্পনাও করতে পারি না যে, এটা সেখানে কাজ করছে। যদি ঘর্ষণ অকস্মাৎ অন্তর্ধান হত, তাহলে বহু জিনিস যাতে আমরা অভ্যস্ত তা বিগড়ে যেত।

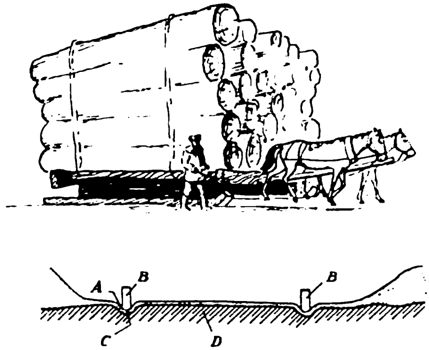
ফরাসী, পদার্থবিদ গুইলাম (Guillame) ঘর্ষণের ভূমিকার একটা প্রাণবন্ত বর্ণনা তুলে ধরেছেন।

"বরফের ফুটপাতের উপর দিয়ে নিশ্চয়ই তোমাদের কখন কখন হাঁটতে হয়েছে। সন্দেহ নেই, তোমাদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, কত কষ্টকর এই বরফের উপর দিয়ে হাঁটার সময় দেহের ভারসাম্য রক্ষা করা। কত কৌতুকপ্রদ আঁকাবাঁকা পথই না তোমাকে যেতে হয়েছে। সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে তোমাদের মানতেই হয়েছে যে, এই পৃথিবী যার উপর আমরা বাস করি ও হাঁটা-চলা করি তা এক মূল্যবান গুণসমন্বিত, যে গুণের বলে কোনো বিশেষ চেষ্টা না করেই আমরা স্থির থাকতে পারি। পিচ্ছিল পথে সাইকেল চালানোর সময় বা যখন কোনো ঘোড়া এসফল্টে পড়ে যায় তখনও ঐ একই শক্তির অভাব কাজ করে। এইসব ঘটনা পর্যালোচনা করলেই আমরা ঘর্ষণের ফলাফল সম্বন্ধে জানতে পারি। ইঞ্জিনীয়াররা যন্ত্রপাতিতে ঘর্ষণ যত কম হয় তার চেষ্টা করে। এটাই স্বাভাবিক। বলবিদ্যার প্রয়োগ ক্ষেত্রে ঘর্ষণকে অনভিপ্রেত হিসেবে গণ্য করা হয়—এটাও বিশেষ কয়েকটি সংকীর্ণ ক্ষেত্রে ছাড়া স্বাভাবিক। অন্য সকল ক্ষেত্রে ঘর্ষণের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত। ঘর্ষণই আমাদের হাঁটতে,

বসতে এবং কাজ করতে সাহায্য করে। আমরা নির্ভয়ে থাকি যে, বই বা দোয়াত পড়ে যাবে না মেঝেতে বা কলম আমাদের আঙুল থেকে খসে পড়বে না।

"ঘর্ষণ এতই সাধারণ যে, কয়েকটি বিরল ক্ষেত্র ছাড়া আমাদের একে ডেকে আনতে হয় না বা বলে কাজ করাতে হয় না। স্বেচ্ছায় যেন এটা আসে। ঘর্ষণ স্থায়িত্ব আনে। ছুতোর টেবিল চেয়ার ঠিক মত দাঁড় করিয়ে রাখার জন্য মেঝে সমতল করে। চীনামাটি বা কাচের জিনিস রাখার পর আমরা ভাবি না বা ভয় পাই না যে, ওগুলো গড়িয়ে বা উল্টে পড়ে যাবে—একমাত্র তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ জাহাজে রাখলে অন্য কথা। আমরা যদি ঘর্ষণ একেবারে ত্যাগ করতাম, তাহলে বড় পাথরের চাঁই-ই হোক আর বালির দানাই হোক—একস্থানে কি থাকত? সব জিনিসই গড়াতে গড়াতে একই সমতলে না আসা পর্যন্ত চলতে থাকত। ঘর্ষণ না থাকলে পৃথিবীর আকার হত মসৃণ গোলকের মত—অনেকটা জলের ফোঁটা যেমন।"

চিত্র 20



উপরে: বরফের রাস্তায় একটি স্লেজ গাড়ি: দুটি ঘোড়া 70 টন ভার টানছে: নিচে: বরফের পথ: A—পথ: B—পথচারী: C—জমাট-বাঁধা বরফ: D—পৃথিবীর ভূমি।

আবার ঘর্ষণ না থাকলে স্ক্রু-পেরেক দেওয়াল থেকে খসে পড়ত, কোনো জিনিসই আমরা ধরে রাখতে পারতাম না, কোনো ঘূর্ণিঝড়ই থামত না, কোনো শব্দই স্তব্ধ হত না—অন্তহীন প্রতিধ্বনি হয়ে ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরত, কখনই ক্ষীণতর হত না।

বরফ আচ্ছাদিত ফুটপাত আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় ঘর্ষণ কত গুরুত্বপূর্ণ। এই রকম বরফ-পড়া দিনে বাইরে বেরিয়ে আমরা কত না অসহায় বোধ করি।

সব সময় ভয় থাকে পড়ে যাবার। 1927 সালের ডিসেম্বর মাসের সংবাদ পত্র থেকে কয়েকটা উদ্ধৃতি দেওয়া হল ঃ

"লন্ডন, 21। বরফপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য পথের ও ট্রামের যানবাহন প্রভৃত দুর্ভোগ ভোগ করছে। প্রায় 1400 লোক হাড়-গোড় ভেঙে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।"

"পেট্রোলে আগুন ধরে গেছে এবং তিন তিনটে গাড়ি হাইড পার্কের কাছে দুটো ট্রামগাড়ীর সঙ্গে সংঘর্ষে সম্পূর্ণ রূপে বিধ্বস্ত হয়েছে।"

"প্যারিস 21। বরফ পূর্ণ আবহাওয়ার জন্য প্যারিস-এ এবং এর উপকণ্ঠে অনেক দুর্ঘটনা ঘটেছে।"

কিন্তু বরফের উপর সামান্য যেটুকু ঘর্ষণ আমরা পাই তারও ব্যবহারিক প্রয়োগ যথেষ্ট। সাধারণ স্লেজ গাড়ী এর একটি উদাহরণ। আরও ভালো দৃষ্টান্ত বড় বড় কাঠের গুঁড়ি বরফের উপর দিয়ে রেল স্টেশনে বা স্থানান্তরিত করার স্থানে সহজে নিয়ে যাওয়া। এই রকম পথে (20 নং চিত্র) মসৃণ পিচ্ছিল বরফ রেলের উপর দিয়ে দুটি ঘোড়া 70 টন ভারবাহী স্লেজ গাড়ি টেনে নিয়ে যেতে পারে।

চেলিউস্কিন (Chelyuskin) ধ্বংসের ভৌত কারণ

দেখা যাচ্ছে, বরফের উপর ঘর্ষণ যে সব সময়ই অকিঞ্চিৎকর, এ সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই তোমরা করবে না। এমন কি প্রায় শূন্য তাপমাত্রায় এই ঘর্ষণ অনেক সময় প্রচণ্ড হতে পারে। জাহাজের ইস্পাতের খোলে উত্তর মেরু অঞ্চলের বরফের ঘর্ষণ যে কি রকম তার সম্যক পর্যালোচনা করা হয়েছে। এর সহগ আশাতীত রকমের বড়—প্রায় 0·2—লোহার উপর লোহার ঘর্ষণের কাছাকাছি। ধ্বংসকারী বরফের এই সহগের গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করার জন্য আমরা 21 নং চিত্রটা পর্যালোচনা করব। চিত্রে, বরফ যখন *MN* খোলে চাপ দিচ্ছে তখন যে যে বল কাজ করছে তার দিক দেখানো হয়েছে। বরফের চাপ *P*-বল, দুটি বলে বিভক্ত করা হয়েছে ঃ R-বল কাঠামোর উপর লম্বভাবে ক্রিয়া করছে, আর *F*-বল কাঠামোর সঙ্গে স্পর্শকভাবে ক্রিয়া করছে। *P* এবং *R*-এর মধ্যবর্তী কোনো জাহাজের ধারের সঙ্গে উল্লম্ব তলে নত α কোণের সমান।

কাঠামোর উপর বরফের ঘর্ষণ বল, বল-*Q*, ঘর্ষণের সহগ 0·2-এর সঙ্গে *R*-বলের গুণফলের সমান অর্থাৎ $Q = 0{\cdot}2R$। যখন *Q*, *F*-এর চেয়ে ছোট, তখন *F* জলের নিচের যে বরফ চাপ দিচ্ছে তাকে টানবে, ফলে কাঠামো বেয়ে বরফ সরে যাবে, জাহাজের কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু *Q*-বল যদি *F*-বলের চেয়ে বড় হয় তখন ঘর্ষণ কাঠামো বেয়ে বরফকে গড়িয়ে যেতে বাধা দেবে এবং কিছু সময়

পরে জাহাজের কাঠামো ভেঙ্গে দিতেও পারে। কিন্তু Q কখন F-এর চেয়ে ছোট হয়? স্পষ্টতই F, $R \tan \alpha$-র সমান।

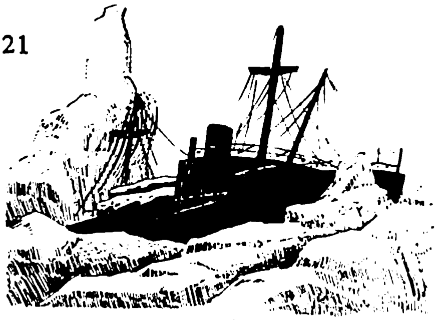
সুতরাং $Q < R \tan \alpha$; এখন যেহেতু $Q = 0{\cdot}2R$, $Q < F$ অসমীকরণ থেকে আর একটি অসমীকরণ পাই ঃ

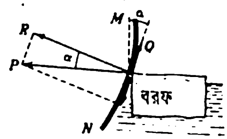
$$0{\cdot}2R < R \tan \alpha$$

$$\text{বা } \tan \alpha > 0{\cdot}2$$

এখন কোণটি বার করার জন্য সারণীর সাহায্য নিতে হবে, যে কোণের ট্যানজেন্ট হবে 0·2 : দেখা যাবে তা হল 11° কোণ। এর থেকে আমরা জানতে

চিত্র 21





. বরফ ঘেরা চেলিউস্কিন। নিচে : বরফ চাপ দেবার সময় জাহাজের MN কাঠামোয় যে বলসমূহ ক্রিয়া করছে।

পারছি জাহাজের কাঠামোর উল্লম্ব তলের সঙ্গে কত ডিগ্রী কোণে থাকলে বরফের উপর দিয়েও জাহাজ নিরাপদে চলতে পারে।

এবার চেলিউস্কিন ধ্বংসের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। চেলিউস্কিন (এটা বরফ ভাঙার জাহাজ ছিল না) উত্তর সাগরের পথে সাফল্যের সঙ্গে পাড়ি দিয়ে ফিরছিল কিন্তু বেরিং প্রণালীতে এসে বরফ-ঘেরাও হয়ে পড়ে। চলমান বরফ চেলিউস্কিনকে ঠেলে উত্তরের দিকে নিয়ে গেল এবং শেষ পর্যন্ত একে ধ্বংস করল (ফেব্রুয়ারী 1934-এ)। দু-মাস ব্যাপী চেলিউস্কিন-এর বিপর্যয়পূর্ণ যাত্রা ও সোভিয়েত বিমান বাহিনী কর্তৃক এর যাত্রীদের উদ্ধারের ঘটনা হয়তো এখনো অনেকের স্মরণে আছে।

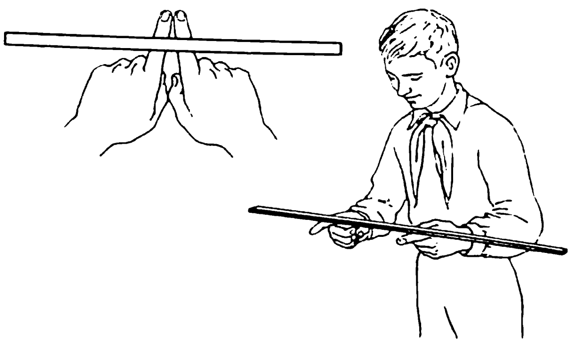
ধ্বংসের ঘটনাটা এই রকম ঃ "কাঠামোর শক্ত মোড়ক সঙ্গে সঙ্গে হার মানেনি", অভিযানের নায়ক ওটো স্মিদ (Otto Schmidt) বেতারে ঘোষণা করলেন। "আমরা দেখতে পাচ্ছি বরফ জাহাজের উপর চাপ দিচ্ছে এবং এর উপরে পাতগুলো ফুলে ফুলে উঠছে। বরফ চাপ দিয়েই চলল, আস্তে আস্তে কিন্তু অনিবার্যভাবে। তারপর ইস্পাতের পাত জোড়ের মুখে ফেটে গেল এবং সমস্ত রিভেট উড়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে জাহাজটা ধ্বংস হয়ে গেল।"

এখন নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছ, কি কারণে ধ্বংসটা ঘটল। সিদ্ধান্তটা এই যে, বরফ সাগরে পাড়ি দেবার জন্য জাহাজের ধারের নতি বা কৌণিক মান অবশ্যই হবে কমপক্ষে 11°।

লাঠির স্বয়ং সাম্যাবস্থা

22 নং চিত্রে প্রদর্শিত অবস্থায় তোমার প্রসারিত তর্জনী দুটোর উপর একটা মসৃণ লাঠি সাম্যাবস্থায় রাখ। তারপর আঙুল দুটো সরাও, যতক্ষণ

চিত্র 22



রুলার নিয়ে পরীক্ষা

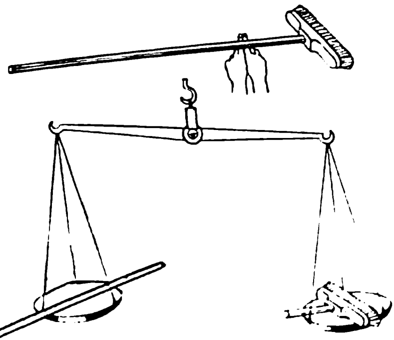
না তারা একত্রিত হয়। লাঠি তখনও সাম্যাবস্থায় থাকে। খেলাটা বার বার করতে পারো তোমার আঙুলের প্রাথমিক অবস্থার পরিবর্তন করে, কিন্তু সর্বদা ফল একই দাঁড়াবে। রুলার, বেড়ানোর ছড়ি, ঝাঁটা যাই ব্যবহার কর না কেন, সবই সাম্যাবস্থায় থাকবে।

কেন ?

প্রথমত, তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে, যখন আঙুল দুটো পরস্পরের কাছাকাছি আসছে তখনই লাঠিটা সাম্যাবস্থায় থাকছে, তাহলে আঙুল দুটো নিশ্চয়ই লাঠির ভরকেন্দ্রের ঠিক নিচে রয়েছে। (কোনো বস্তু সাম্যাবস্থায়

থাকে যখন তার ভরকেন্দ্র বরাবর লম্ব বাহক ভূমির মধ্যে পড়ে।) যখন আঙুল দুটো বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, লাঠির ভরকেন্দ্রের নিকটবর্তী আঙুলের উপর বেশি চাপ পড়ে। যত বেশি চাপ, তত বেশি ঘর্ষণ। ফলে, লাঠির ভরকেন্দ্রের নিকটবর্তী আঙুলটি দূরবর্তী আঙুলটির চেয়ে বেশি ঘর্ষণ উপভোগ করে। সেই কারণে ভরকেন্দ্রের নিকটবর্তী আঙুলটি লাঠির নিচে সরে যাচ্ছে না। যে আঙুলটি সরে যাবে সেটা হল ভরকেন্দ্র থেকে দূরবর্তী আঙুলটি। যেই মাত্র একটা আঙুল ভরকেন্দ্রের নিকটবর্তী হয়, অপরটি তৎক্ষণাৎ পড়ে যেতে চায়, যতক্ষণ না দুটো আঙুলই একত্রিত হচ্ছে। ভরকেন্দ্রের থেকে যখনই একটা আঙুল দূরে যায়, তারা তখনই আবার একত্রিত হবার চেষ্টা করে, ভরকেন্দ্রের ঠিক নিচ বরাবর এসে।

চিত্র 23



ঝাঁটা নিয়ে একই পরীক্ষা। পাল্লা সাম্যাবস্থায় থাকছে না কেন ?

একই পরীক্ষা এবার ঝাঁটা নিয়ে করা যাক (চিত্র 23)। এখন 23 নং চিত্রের নিচের অংশে যেমন দেখানো হয়েছে, আঙুল দুটো যেখানে একত্রিত হয় এবং ঝাঁটা-টা সাম্যাবস্থায় থাকে সেইখানে যদি ঝাঁটা-টাকে ভেঙে দুভাগ করা হয় এবং প্রত্যেকটি অংশ যদি পাল্লার দুটি পাত্রে একটা একটা করে রাখা হয় তাহলে কোন্ অংশটা বেশি ভারী হবে ? কাঠ সমেত অংশটা না শুধুই ঝাঁটার অংশটা ? তোমরা ভাবছ, কাটার আগে আঙুলের উপর যেহেতু দুটো অংশই সাম্যাবস্থায় ছিল, এখনও পাল্লার পাত্রের উপরও তারা সাম্যাবস্থায় থাকবে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে দেখা যাবে, ঝাঁটার যে অংশটা সেটাই বেশি ভারী হবে। উত্তরটা খুবই সহজ। এটা বোঝা দরকার যে, হাতের আঙুলের উপর যখন ঝাঁটা সাম্যাবস্থায় ছিল, ঝাঁটার দুটো অংশের ভার যে বল প্রয়োগ করছিল লিভারের অসম দুটো

অংশের উপর তা প্রযুক্ত হচ্ছিল। পাল্লার পাত্রের উপর অবশ্য, ঐ একই বল কিন্তু সম-বাহু বিশিষ্ট লিভারের দুই প্রান্তে প্রযুক্ত হচ্ছে।

লেনিনগ্রাদ রিক্রিয়েশন পার্কে 'বিজ্ঞানের মজা'র দর্শকমণ্ডলীকে আমি এক গুচ্ছ লাঠি নিতে বললাম। লাঠিগুলোর ভরকেন্দ্রগুলি বিভিন্ন স্থানে ক্রিয়া করছে। এবার সাধারণত দুটি অসম অংশে, প্রত্যেকের ঠিক ভরকেন্দ্রে তাদের আলাদা করে ফেলা হল। দর্শকরা দেখে অবাক হয়ে গেল যে, যখন তাদের পাল্লায় তোলা হল, ছোট ছোট অংশবিশিষ্ট ক্ষুদ্রতর অংশটি, বৃহত্তর অংশটি অপেক্ষা ওজনে ভারী হয়েছে।

পরিচ্ছেদ ৩

ঘূর্ণন

ঘূর্ণায়মান লাটিম পড়ে যায় না কেন ?

ছোটবেলায় তোমরা যারা অনেকেই লাটিম ঘুরিয়েছো তাঁরা বোধ হয় অনেকেই এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারবে না। বস্তুতই ঘূর্ণায়মান লাটিম, তা সে সোজাভাবেই ঘুরুক বা একটু হেলেই ঘুরুক, পড়ে যায় না কেন ? কোন্ বল তাকে এই আপাত অস্থায়ী অবস্থায় ধরে রাখে ? অভিকর্ষ বল কি তার উপর কোনো ক্রিয়া করে না ? এখানে বলসমূহের অদ্ভূত পারস্পরিক ক্রিয়া ঘটছে। লাটিমের ঘোরার তত্ত্বটি যেহেতু একটু জটিল, আমি এখানে কেবল প্রধান কারণটি উল্লেখ করব।

24 নং চিত্রে দুটি তীর দ্বারা চিহ্নিত পথে লাটিম ঘুরছে। বৃত্তাংশ *A* এবং এর বিপরীত বৃত্তাংশ *B*-র দিকে নজর দাও। বৃত্তাংশ *A* তোমার কাছ থেকে

চিত্র 24. ঘূর্ণায়মান লাটিম পড়ে যায় না কেন ?



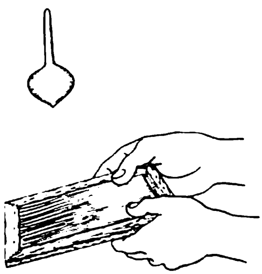
দূরে যেতে চাইছে এবং বৃত্তাংশ *B* তোমার দিকে আসতে চাইছে। লক্ষ্য কর তোমার দিকে নাড়ালে *A* এবং *B* কিভাবে নড়ে। *A* উপরের দিকে এবং *B* নিচের দিকে নড়ে। উভয় বৃত্তাংশই তাদের নিজ নিজ গতির সমকোণে একটা আবেগ পায়। কিন্তু যেহেতু এর দ্রুত ঘূর্ণনে বৃত্তাংশ দুটির পরিধিস্থ বৃত্তীয় গতি অত্যন্ত বেশি, সামান্য গতি যা তুমি এতে সঞ্চারিত কর এর পরিধিস্থ বৃত্তীয় গতির কোনো বিন্দুতে, তা যে লব্ধি গতি দেয় তার মান পরিধিস্থ বৃত্তীয় গতির মানের প্রায় সমান এবং ফলে লাটিমের ঘূর্ণনের কোনো পরিবর্তনই হয় না।

এখন তুমি বুঝতে পারবে কেন ঘূর্ণায়মান লাটিম একে ঠেলে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা রোধ করে। লাটিমের ভর যত বেশি হবে এবং যত দ্রুততার সঙ্গে লাটিম ঘুরবে, একে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা তত বেশি এ রোধ করবে।

জাড্যের সূত্রের সঙ্গে বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। লাটিমের প্রতিটি পরমাণু ঘূর্ণনের অক্ষের সঙ্গে সমকৌণিক তলে বৃত্তীয় কক্ষপথে আবর্তন করে। জাড্যের সূত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এই পরমাণু বা কণা প্রতি মুহূর্তে চেষ্টা করে এর বৃত্তীয় কক্ষপথ থেকে চ্যুত হয়ে কক্ষের সঙ্গে স্পর্শক হয়ে সরল রেখায় গমন করতে। কিন্তু যেহেতু প্রত্যেক স্পর্শকের পথই বৃত্তের পরিধির সঙ্গে একই তলে অবস্থিত, তাই প্রত্যেক কণাই সর্বদা আবর্তন-অক্ষের সঙ্গে উল্লম্ব তলের মধ্যে তার গতি বজায় রাখে। এর অর্থ—আবর্তন অক্ষের সঙ্গে উল্লম্ব উপরের সকল তলই নিজ অবস্থানে থাকতে চায় এবং আবর্তন অক্ষও তার মূল দিক বজায় রাখতে চায়।

আধুনিক কারিগরী বিদ্যায় এই ধর্ম প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। নাবিকেরা ও বৈমানিকেরা যে কম্পাস ও জাইরোস্কোপ ব্যবহার করেন তা এই ধর্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত। ঘূর্ণন সেল (Shell) ও বুলেটে গতির স্থায়িত্ব আনে ও

চিত্র 25



ঘূর্ণায়মান লাটিমকে উপরের দিক ক'রে রাখলে ও ওর অক্ষের প্রাথমিক দিক ঠিক রাখে।

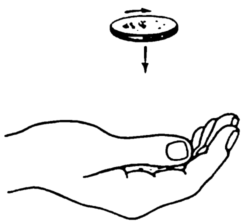
কৃত্রিম উপগ্রহ ও রকেটের উড্ডয়ন সুনিশ্চিত করে। একটা সাধারণ খেলনার ক্ষেত্রে যেমন, এই সব ক্ষেত্রেও সেই সব সুযোগ-সুবিধাগুলো কাজে লাগানো হয়।

ভোজবাজি

ঘূর্ণায়মান বস্তুর আবর্তন অক্ষের দিক ঠিক রাখার ধর্মের উপর ভিত্তি করে যাদুকরেরা অনেক বিস্ময়কর ও বৈচিত্র্যপূর্ণ খেলা দেখান। ব্রিটিশ পদার্থবিদ, অধ্যাপক জন পেরীর (John Perry) 'স্পিনিং টপস্' (Spinning Tops) গ্রন্থ থেকে এখন কিছু উদ্ধৃত করা যাক ঃ

"আমি একদা কফিপায়ী ও ধূমপায়ী দর্শকমণ্ডলীর কাছে লণ্ডনের খুব সুন্দর প্রতিষ্ঠান 'ভিক্টোরিয়া মিউজিক হল'-এ ঘূর্ণায়মান লাটিমের কয়েকটি খেলা দেখাই।...আমি গভীরভাবে দর্শকমণ্ডলীকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলাম যে, কোনো আঙটা ছুঁড়লে যদি কিভাবে নিচে নামবে সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে হয় তবে তাকে ঘূর্ণায়মান করতে হবে। যদি কাউকে লাঠির ডগায় কোনো হুপ বা টুপি ধরতে দিতে হয়, তবে হুপ বা টুপিটাকে ঘুরিয়ে ছুঁড়তে হবে; অক্ষের দিক পরিবর্তন করার জন্য যে ঘূর্ণায়মান বস্তু হেলে না—এই ধর্ম নির্ভরযোগ্য। আমি তাঁদের বলেছিলাম এই জন্যই নির্ভুল হওয়ার জন্য মসৃণ গর্ত সম্পন্ন বন্দুক নির্ভরযোগ্য নয়;

চিত্র 26



ঘুরিয়ে ছুঁড়লে মুদ্রা কিভাবে পড়ে।

চিত্র 27



না ঘুরিয়ে ছুঁড়লে মুদ্রা কি রকম ব্যবহার করে।

সাধারণ বুলেট যে ঘূর্ণন গ্রহণ করে তা নির্ভর করে বুলেটটি বাইরে যাবার সময় বন্দুকের নলকে কিভাবে স্পর্শ করে তার উপর। কিন্তু বর্তমানে নলের মধ্যে চক্রাকার গর্ত কাটা থাকে। আধুনিক বন্দুক-রাইফেলে, বারুদের বিস্ফোরণের বলের সঙ্গে সঙ্গে, অক্ষের চতুর্দিকে যাতে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় গুলি উৎক্ষিপ্ত হয় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অতএব বুলেট নির্দিষ্ট ও সুপরিজ্ঞাত ঘূর্ণন সমেত বন্দুক থেকে বার হয়।...আমার ভাষণ শেষ হলে, দু'জন যাদুকর মঞ্চে উঠে আসে এবং এই ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোক তাদের প্রতিটি খেলায় উপরের ঘূর্ণন ধর্মের যে দৃষ্টান্ত দিলেন আমার কাছে তার চেয়ে ভালো দৃষ্টান্ত ছিল না। তারা টুপি, হুপ, প্লেট, ছাতা ছুড়ে দিতে লাগল, যা এক জনের হাত থেকে ঘুরতে ঘুরতে অপর জনের কাছে গেল। তাদের মধ্যে একজন এক ঝাঁক ছুরি বাতাসে ছুঁড়ে দিল, আবার লুফে নিল এবং আবার উপরে ছুঁড়ে দিল নিখুঁতভাবে এবং

আমার এ বিষয়ে সবে মাত্র শিক্ষিত শ্রোতৃমণ্ডলী আনন্দের সঙ্গে চিৎকার করে উঠল যে, তারা লক্ষ্য করেছে যে যাদুকর প্রতিটি ছুরি ছোঁড়ার সময় তাকে ঘুরিয়ে দিচ্ছে এবং তারা বুঝতে পেরেছে যে, সে কিভাবে তার হাতে ঐ ঘূর্ণায়মান ছুরি ফিরে আসছে তা ভালোভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে। আমি বিস্ময়াভিভূত হয়ে লক্ষ্য করেছিলাম যে, সেই সন্ধ্যার প্রতিটি ভোজবাজিই ঘূর্ণনের ঐ ধর্মকে ভিত্তি করেই প্রদর্শিত হয়েছিল।"

চিত্র 28



খুব সহজে টুপিটা উপরে ছুড়ে দিয়ে ধরতে পারবে যদি ছোঁড়ার সময় একটু ঘুরিয়ে দেওয়া হয়।

কলম্বাস ও তাঁর ডিমের নতুন সমাধান

কলম্বাস তাঁর বিখ্যাত সমস্যা—ডিমকে কিভাবে ওর একপ্রান্তের উপর দাঁড় করানো যায়, তা অতি সহজেই সমাধান করেন। তিনি ডিমের মাথাটা একটু ফাটিয়ে নিয়েছিলেন। ঘটনাক্রমে কলম্বাস ও তাঁর ডিমের এই জনপ্রিয় উপাখ্যান প্রকৃতপক্ষে সত্য নয়। জনশ্রুতি এই যে, এই ডিম বসানোর ঘটনাটি এই বিখ্যাত আবিষ্কারকের অনেক আগে আর একজন লোক সম্পূর্ণ অন্য কারণে সংঘটিত করেন। ইনি হলেন ইতালীর স্থপতি ব্রুনেলেসকি (Brunnelleschi) যিনি ফ্লোরেনটাইন ক্যাথিড্রালের বিরাট গম্বুজ নির্মাণ করেন। তিনি দাবি করেন: "আমার নির্মিত গম্বুজ ওর জায়গায় থাকবে ঠিক তেমনি ভালোভাবে যেমনভাবে একটা ডিম তার সরু প্রান্তের উপর দাঁড়িয়ে থাকে।"

প্রকৃত পক্ষে কলম্বাসের সমাধান সম্পূর্ণ ভুল। কলম্বাস যখন ডিমটিকে ফাটিয়ে নিলেন তখনই তিনি ডিমের আকারের পরিবর্তন সাধন করলেন। এর অর্থ দাঁড়ায় ওটা আর আগের ডিমটি রইল না, অন্য বস্তু হয়ে দাঁড়াল, যাকে

তিনি তার প্রান্তের উপর দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। সমস্যাটা মূলত ডিমের অমন আকারের জন্যই। যখনই সেই আকারের পরিবর্তন সাধন করা হল, তখনই ডিমের পরিবর্তে অন্য কিছু দাঁড়াল। সুতরাং কলম্বাস যে সমাধান করলেন তা আর প্রকৃত যে বস্তু পূর্বে ছিল তার জন্য হল না। কিন্তু আমরা ঐ বিখ্যাত নাবিকের সমস্যাটার সমাধান করতে পারি, ডিমের আকারের পরিবর্তন সাধন না করেই লাটিমের ঘূর্ণনের ধর্মকে কাজে লাগিয়ে। ডিমটাকে কেবল ওর প্রান্তের উপর ঘোরাও। না পড়ে গিয়ে কিছুক্ষণ অন্তত ওটা ওর প্রান্তের উপর দাঁড়িয়ে থাকবে। 29 নং চিত্রে দেখান হয়েছে কিভাবে ওটা করা যাবে। কেবল মাত্র সিদ্ধ ডিমই নাও। কলম্বাসের সমস্যার সঙ্গে এর কোনো গরমিল হবে না, কারণ তিনিও পরীক্ষাটা দেখানোর সময় নিশ্চয়ই খাবার টেবিল থেকে ডিমটা সংগ্রহ করেছিলেন। সুতরাং ঐ ডিমটাও নিশ্চয়ই সিদ্ধ ডিম ছিল। কাঁচা ডিম ঘোরানো সম্ভব নয়, কারণ এর জলীয় অংশ ঘোরার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। প্রসঙ্গক্রমে এটা বহু গৃহিনীর জানা একটা সরল পন্থা দেখিয়ে দেয় যার সাহায্যে কোন্‌টা কাঁচা ডিম এবং কোন্‌টা শক্ত করে সিদ্ধ করা ডিম তা বলা যায়।

চিত্র 29



কলম্বাসের ডিমের সমস্যা কিভাবে সমাধান করা হয়। ঘুরিয়ে দিলে ডিম তার প্রান্তের উপর দাঁড়ায়।

পৃথিবীর অভিকর্ষের বিনাশ

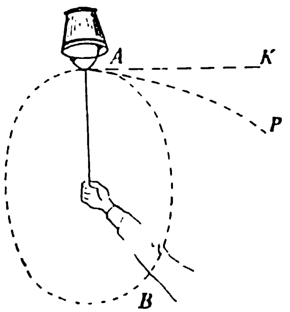
"ঘূর্ণায়মান পাত্র থেকে জল পড়ে যাবে না, এমনকি পাত্রটাকে উল্টে দিলেও। ঘূর্ণনই জল পড়ে যেতে বাধা দেয়।"

প্রায় দু'হাজার বছর আগে অ্যারিস্টটল এ কথা লিখেছিলেন। 30 নং চিত্রে পরীক্ষাটা সার্থকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সন্দেহ নেই পরীক্ষাটা তোমাদের অনেকের কাছেই সুপরিচিত। তুমি যদি এক পাত্র জল নিয়ে খুব দ্রুত ঘোরাতে

থাকো, চিত্রে যেমন দেখানো হয়েছে, জল পড়বে না, পাত্রটা উল্টে ধরলেও না।

সাধারণত লোকে 'অপকেন্দ্র বল'-এর দরুন এরূপ হয় বলে ব্যাখ্যা করে। অপকেন্দ্র বল বলতে এমন এক কাল্পনিক বল বোঝায় যা ধরে নেওয়া হয় বস্তুটির

চিত্র 30



জল চলকে পড়ে যায় না কেন ?

উপর প্রযুক্ত হয়েছে বলে এবং যাকে ভারকেন্দ্র থেকে সরে যাওয়ার প্রবণতার জন্য দায়ী করা হয়। এই বলের অস্তিত্ব নেই। যে প্রবণতার কথা বলা হল তা জাড্যের এক রকম প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয় এবং জাড্যজনিত গতি সৃষ্টির জন্য কোনো বলের প্রয়োজন হয় না। পদার্থতত্ত্ববিদেরা অপকেন্দ্র বল বলতে সম্পূর্ণ আলাদা কিছু বোঝেন, তাঁদের কাছে এটা হল সেই প্রকৃত বল, যে বলে একটি ঘূর্ণায়মান বস্তু তাকে বেঁধে রাখার সুতলীর উপর টান দিচ্ছে বা তার বক্ররৈখিক কক্ষপথের উপর চাপ দিচ্ছে। এই বল চলমান বস্তুর উপর প্রযুক্ত হচ্ছে না, কিন্তু প্রযুক্ত হচ্ছে সেই বাধার উপর যা একে সরলরৈখিকভাবে চলার প্রতিরোধ করছে, যেমন সুতলী, রেলপথের একটা বাঁকা অংশ ইত্যাদি।

আবার ঝুলন্ত জল-পাত্রের বিষয়ে ফিরে আসা যাক। দেখি আমরা এই ঘটনার কারণ বার করতে পারি কিনা 'অপকেন্দ্র বলের' দ্ব্যর্থক ধারণা একেবারেই ব্যবহার না করে। নিজেকেই প্রশ্ন করো, যদি পাত্রের মধ্যে একটা ছিদ্র করা যায়, জল কোন্ পথে গড়িয়ে পড়বে? অভিকর্ষজ বল যদি না থাকতো, জল তা হলে, জাড্যের জন্য, *AB* পরিধির *AK* স্পর্শকের পথে পড়বে (চিত্র 30)। অভিকর্ষ কিন্তু জলের পড়ার পথকে বাঁকিয়ে দেবে *AP* অধিবৃত্তের পথে। যদি পরিধির দিকে গতি খুব বেশি হয়, বক্ররেখা *AB* পরিধির বাইরে থাকবে, পাত্রের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হলে, যে পথে ঘূর্ণায়মান পাত্রের জল যাবে সেই দিক প্রদর্শন করবে। জল,

তাহলে দেখা যাচ্ছে উল্লম্বভাবে নিচে পড়বে না। এই কারণেই জল পড়ে যায় না। জল পড়বে কেবল তখনই, যখন পাত্রের উপরের দিক এর ঘূর্ণনের দিকে মুখ করে থাকে।

এখন চিন্তা করা যাক পাত্রটিকে কি বেগে ঘোরালে জল পড়বে না। ঘূর্ণায়মান পাত্রের অপকেন্দ্র ত্বরণ অভিকর্ষজ ত্বরণের চেয়ে যেন কম না হয়। তাহলে পাত্রের জল যে পথ অনুসরণ করার চেষ্টা করবে তা পাত্রের দ্বারা সৃষ্ট পরিধির বাইরে থাকবে এবং কোনো কিছুতেই জল পাত্রের পেছনে থাকবে না। অপকেন্দ্র ত্বরণ W (Centrifugal accelaration) গণনা করার জন্য আমরা যে সূত্র প্রয়োগ করব তা হল ঃ

$$W = \frac{v^2}{R},$$

যেখানে v হল পরিধির দিকে বেগ, R বৃত্তীয় কক্ষের ব্যাসার্ধ। যেহেতু উপরিভাগের অভিকর্ষজ ত্বরণ $g = 9{\cdot}8$ মি. সে.^{2}, আমরা যে অসমীকরণে উপনীত হই তা হল ঃ $\frac{v^2}{R} \geqslant 9{\cdot}8$

R সমান 70 সে.মি. ধরলে,

$\frac{v^2}{0{\cdot}7} \geqslant 9{\cdot}8$ এবং $v \geqslant \sqrt{0{\cdot}7 \times 9{\cdot}8}$; $v \geqslant 2{\cdot}6$ মি./সে.

এই মানের বৃত্তীয় বেগ পেতে হলে আমাদের প্রতি সেকেণ্ডে $1\frac{1}{2}$ বার ঘোরাতে হবে। এটা খুবই সম্ভব। আমাদের পরীক্ষা বিশেষ কোনো অসুবিধাই করবে না। **অপকেন্দ্র ঢালাই** (Centrifugal casting)-এর জন্য ইঞ্জিনীয়াররা তরল পদার্থের পাত্রের দেওয়ালে চাপ দেওয়ার প্রবণতাকে তরল পদার্থকে অনুভূমিক কক্ষে ঘুরিয়ে কাজে লাগায়। এক্ষেত্রে অসমসত্ব তরল আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুসারে ঘূর্ণন কক্ষ থেকে দূরে বা ঘূর্ণন কক্ষের সামনে জমা হবে। ফলে গলিত ধাতু যে সব গ্যাস বহন করে এবং যা বুদবুদ সৃষ্টি করে, তা ঢালাই-এর কেন্দ্রীয় পথে ঢুকে পড়ে। তাই এইভাবে ঢালাই করলে ভালো ও ঘন কাঠামো তৈরী হয় এবং ভেতরে ফাপা থাকে না। এই প্রক্রিয়া সাধারণ ছাঁচে চাপ দিয়ে ঢালাই করার চেয়ে অনেক সুলভ এবং এই প্রক্রিয়ায় কোনো সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতিরও বিশেষ প্রয়োজন হয় না।

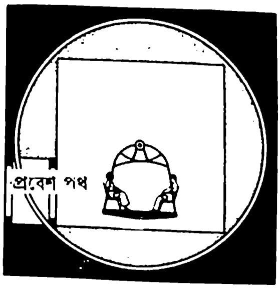
গ্যালিলিও রূপে তুমি

বড় রকমের ঘূর্ণনের মজা যাঁরা ভোগ করতে ভালোবাসেন তাঁরা এই মজার উপলব্ধি করতে পারেন 'শয়তানের দোলনা' নামে খ্যাত মৌলিক আকর্ষণ থেকে। একসময় লেনিনগ্রাদে এরকম এক দোলনা ছিল। আমি অবশ্য এ দোলনা কখনও

চড়ি নি। তাই ফেডোর (Fedor) বিজ্ঞানের মজার সংগ্রহ থেকে উদ্ধৃত করে শোনাচ্ছি।

"দোলনাটা শক্ত অনুভূমিক দণ্ড থেকে ঝোলানো। ঘরের মেঝে থেকে খানিকটা উপরে ঘরের চারিদিকে পাক খাচ্ছে। সকলে আসন গ্রহণ করার পর পরিচালক দরজাটা বন্ধ করে দেন, তারপর দোলনাটাকে খাঁড়া করে রাখার তক্তাটা সরিয়ে নেন এবং তারপর 'আরোহীদের বাতাসে একটা ছোটোখাটো পাড়ি দেবার জন্য নিয়ে যাচ্ছেন'—বলে দোলনাটায় একটা ধাক্কা দেন। এরপর তিনি পেছনে দাঁড়িয়ে থাকেন। গাড়ির পা-দানিতে পরিচারক যেমন দাঁড়িয়ে থাকে অথবা বিদায় নেয়। ইত্যবসরে দোলনাটা ক্রমশঃই উপরে উঠতে থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত ওটা একটা

চিত্র 31



শয়তানের দোলনা।

পূর্ণ বৃত্ত রচনা করছে। দোলনাটার গতি লক্ষণীয়ভাবে দ্রুত থেকে দ্রুততর হয় এবং আরোহীরা প্রশ্নাতীতভাবে ঘূর্ণনজনিত নাড়া ভোগ করতে থাকেন—যদিও প্রত্যেককেই আগে থেকেই সাবধান করে দেওয়া হয়—ভাবেন নিজেদের মাথা নিচের দিকে করে শূন্যে উড়ছেন এবং প্রাণপণে নিজ নিজ আসন চেপে ধরেন যাতে না পড়ে যান। তারপর আস্তে আস্তে ঘূর্ণন কমে আসে যতক্ষণ না কয়েক সেকেণ্ড পরে দোলনাটা একেবারে থেমে যাচ্ছে।

প্রকৃতপক্ষে দোলনাটা বরাবর থেমেই ছিল। ঘরটাকেই অতি সাধারণ এক যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় দোলনার আসনে উপবিষ্ট আরোহীদের চারিদিকে ঘোরান হচ্ছিল আসবাবপত্র মেঝেতে বা দেওয়ালের সঙ্গে সাঁটা ছিল। সহজেই নড়াচড়া করতে পারে এমনভাবেই টেবিলের সঙ্গে বাতিটা ঢালাই করা ছিল। তার সঙ্গে ছিল বিরাট সেডের সঙ্গে যুক্ত বাল্ব। পরিচারক দোলনাটাকে ঠেলছে বলে মনে হচ্ছিল, সে আদতে ঘরটির দোলনের সঙ্গে দোলনার দোলার তাল ঠিক রাখা ছাড়া আর কিছুই করছিল না। দোলনাটা ঠেলার ভান করছিল মাত্র সে। সমস্ত পরিকল্পনাটাই ছিল ফলপ্রসূ ধাপ্পা।"

নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো রহস্যটা জলবৎ তরলম। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে, বিভ্রান্তিকর পরিকল্পনা এত মজবুত যে, সব জেনে শুনেও তুমিও এর ফাঁদে পড়বে।

পুশ্‌কিনের 'গতি'র উপর একটা ছোট কবিতা আছে ঃ

"গতি বলে কিছু নেই"—কহিলেন দাড়ি নেড়ে মুনি*
শিষ্য** তার হাঁটা শুরু করেন তখুনি ;
উচিত জবাব—কথার চেয়েও জোর রহিয়াছে যাতে
অথবা যা মেলে ভাই মুদ্রিত পাতে।
অথচ ভদ্রমহোদয়, সেই হাস্যকর ঘটনা
স্মরণে হাজির করে আরও একজনা।
যদিও মনে হয় দিনে সূর্য দেয় পাড়ি,—
তবুও গ্যালিলিও ঠিক, সত্য পক্ষে তাঁরই।

দোলনায় উপবিষ্ট আরোহীদের মধ্যে তোমারই যথার্থ বিজ্ঞানের কলাকৌশল সম্বন্ধে ধারণা থাকায় তুমিও এর রহস্য সম্বন্ধে অজ্ঞ আরোহীদের কাছে গ্যালিলিও হয়ে যাবে—যদিও উল্টোভাবে। গ্যালিলিও যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, সূর্য এবং নক্ষত্রেরা স্থির আছে এবং আপাত দৃষ্টিতে যা মনে হয় তার ঠিক উল্টো—আমরা নিজেরাই ওদের চারিদিকে ঘুরছি। আর তুমি যুক্তি দেখাবে যে, দোলনাটা স্থির এবং সমস্ত ঘরটাই ওর চারিপাশে আবর্তন করছে। খুব সম্ভবত তোমাকেই তাহলে গ্যালিলিও-র মত দুর্ভাগ্য বহন করতে হবে এবং বলা হবে, আপাত দৃষ্টিতে যা স্বয়ংসিদ্ধ তুমি তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছো।

আমার সঙ্গেই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা হোক ঃ তুমি কি মনে কর খুব সহজেই যুক্তি দিয়ে ব্যাপারটা বোঝাতে পারবে? যদি তাই মনে করে থাক, তাহলে তুমি ভুল করছো। মনে কর তুমি শয়তানের দোলনায় বসে আরোহীদের বোঝাতে চাইছো যে, তারা এক প্রবঞ্চনার ফাঁদে পা দিয়েছে। আমি পরামর্শ দি, আমার সঙ্গে আলোচনা কর। শুরু করার আগে, এস দোলনাটা যতক্ষণ না পুরো এক চক্কর ঘুরে আসছে বলে প্রতিভাত হচ্ছে আমরা অপেক্ষা করি। একটা শর্ত আছে ঃ যখন তুমি যুক্তি দেখাবে তখন তুমি

---

* গ্রীক দার্শনিক জেনন (Xenon) যিনি খ্রীষ্টপূর্ব 500 অব্দে জীবিত ছিলেন এবং যিনি দাবি করতেন পৃথিবীর সব কিছুই স্থির আছে, ইন্দ্রিয়ের ভ্রান্তির জন্যই আমাদের কাছে বস্তুসমূহ সচল মনে হয়।

** ডিওজিনেস (Diogeness)

দোলনায় বসে থাকবে। আমরা আগে থেকে যা যা প্রয়োজন সব নিয়ে রাখব।

তুমি: কেমন করে তুমি সন্দেহ করবে যে, ঘরটা ঘুরছে আর আমরা স্থির আছি? প্রকৃত পক্ষে, আমাদের দোলনা যদি বস্তুতই উল্টে যায়, আমরা পড়ে যাব। কিন্তু যেহেতু আমরা পড়ে যাচ্ছি না, এটাই প্রমাণ করছে যে, ঘরটা ঘুরছে, দোলনাটা নয়।

আমি: পাত্রের ঘূর্ণায়মান জলের কথা স্মরণ রাখ। এটাও পড়ে যাচ্ছিল না, যাচ্ছিল কি, যদিও পাত্রটাকে ওল্টানো হয়েছিল? অথবা সেই সাইকেল আরোহীর কথাই ভাবো না, যে দড়ির ফাঁস জড়ানো রূপ আকর্ষণে আকৃষ্ট ছিল। সেও তো পড়ে যায় নি, যদিও সাইকেল চালানোর সময় তার মাথা ছিল নিচের দিকে।

তুমি: তাহলে অপকেন্দ্র বলের (Centrifugal accelaration) ত্বরণ নিয়ে দেখা যাক যে, এই ত্বরণ আমাদের পতন থেকে রক্ষা করার মত শক্তিশালী কি না। যেহেতু আমরা জানি আমরা ঘূর্ণন-অক্ষ থেকে কত দূরে এবং প্রতি সেকেন্ডে আমরা ক'বার পাক খাচ্ছি, আমরা সূত্র থেকে সহজেই বার করতে পারি……

আমি: চিন্তা করো না। পরিচালক বলেছিল সমস্ত জিনিসটা বোঝানোর জন্য আমরা প্রয়োজন মত অনেকবার পাক খাব। অতএব তুমি এটা বার কর আর নাই কর, কিছুই যায় আসে না।

তুমি: কিন্তু তোমাকে বোঝানোর আশা আমি ছেড়ে দিয়েছি। তুমি দেখতেই পাচ্ছো গ্লাসের জল পড়ে যাচ্ছে না। কিন্তু আমার ধারণা, তুমি আবার সেই ঘূর্ণায়মান পাত্রের কথা তুলবে। এগিয়ে যাও। আমার এখানে একটা ওলনদড়ি আছে, এবং আমি দেখছি ঐ দড়ি সব সময়ই নিচের দিকে মুখ করা। আমরা যদি ঘুরতাম আর ঘর যদি স্থির থাকত, ওলনদড়িও আমাদের সঙ্গে ঘুরত, যেহেতু এটা সব সময়ই নিচু-মুখো।

আমি: তুমি ভুল করছো। আমরা যদি খুব দ্রুত ঘুরতাম, ওলনদড়ি সব সময়ই অক্ষ থেকে ঘূর্ণনের ব্যাসার্ধের দিকে দূরে ছিটকে যেত, অথবা অন্য কথায় বলা যায়, এটা আমাদের পায়ের দিকে মুখ করে থাকত। এবং যথার্থ এটা তাই করছে।

যুক্তিটাকে ধরে থাকবে কিভাবে?

তোমার প্রতিপক্ষকে বোঝাতে হলে তোমাকে এইভাবে এগোতে হবে। দোলনায় উপবিষ্ট থাকাকালীন তোমার সঙ্গে একটা স্প্রীং তুলা (স্প্রীং ব্যালেন্স) নাও। ওর পাত্রে কিছু ওজন, ধর এক কিলোগ্রাম, চাপাও এবং এর নির্দেশকটা

লক্ষ্য কর। এই ভার যে একই থাকছে, এটাই প্রমাণ করে তোমার যুক্তি ঠিক।

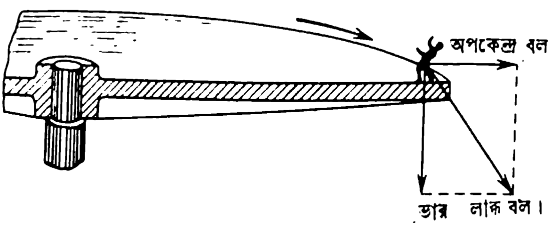
প্রকৃতপক্ষে, আমরা যদি প্রকৃতই তুলা সমেত অক্ষের চারিদিকে ঘুরতে থাকি, ভার প্রভাবিত হবে অভিকর্ষজ ত্বরণ ছাড়াও। এবং অপকেন্দ্র বল (Centrifugal force) দ্বারাও প্রভাবিত হবে। এর ফলে নিচে নামার সময় ওজন বাড়বে আর উপরে ওঠার সময় ওজন কমবে। কিন্তু তুলার নির্দেশক যেহেতু স্থির আছে, ওজন বাড়ছেও না কমছেও না। সুতরাং, ঘুরছে ঘরটাই, আমরা নয়।

'যাদু-করা বল'

জনৈক উদ্যোগী আমেরিকান ভদ্রলোক জনসাধারণের আমোদ-প্রমোদের পার্কে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও মজার এক নাগরদোলা চালু করেন। এই ঘূর্ণায়মান গোলাকৃতি (Ball-shaped) ঘরে যাঁরা ঘুরেছিলেন তাঁরা এক অদ্ভুত অনুভূতির অভিজ্ঞতা লাভ করেন যা একমাত্র নিদ্রায় বা রূপকথার স্বপ্নপুরীতেই মেলে।

প্রথমে স্মরণ কর কি ঘটবে, যখন তুমি নিজে দ্রুত ঘূর্ণায়মান কোনো প্লাটফর্মের প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াও। ঘূর্ণন তোমাকে দূরে ছিটকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করবে এবং তুমি যত মধ্যভাগ থেকে দূরে থাকবে, ততই তুমি বেশি ধাক্কা ভোগ করবে। এবার তুমি চোখ বন্ধ কর। তোমার মনে হবে খুবই কষ্টের সঙ্গে তুমি অনুভূমিক নয় এমন নততলে নিজের ভারসাম্য রক্ষা করার চেষ্টা করছো। কেন? দেখা যাক, কি কি বল এই বিশেষ ক্ষেত্রে তোমার দেহের উপর ক্রিয়া করছে (চিত্র 32)। ঘূর্ণন আমাদের দূরে ঠেলতে

চিত্র 32

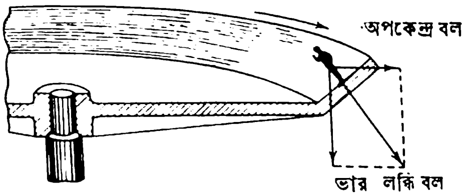


ঘূর্ণায়মান প্ল্যাটফর্মের প্রান্তে লোকে কেমন বোধ করে।

চেষ্টা করে যখন অভিকর্ষ আমাদের নিচে টানে। এই দুই বল একত্রিত হয়, বলের সামান্তরিক সূত্রানুসারে নিম্নাভিমুখে লব্ধি বল দেওয়ার জন্য। যত দ্রুত হবে এই ঘূর্ণন তত বেশি হবে লব্ধি বল এবং তত স্থূল হবে কোণটি।

এবার ধরা যাক প্লাটফর্মের প্রান্তটিকে উপরে তোলা হল এবং তুমি এর উপরে দাঁড়িয়ে আছো (চিত্র 33)। প্লাটফর্মটা যখন নড়ছে না তখন তুমি ওর উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না ; তুমি নিশ্চয়ই গড়িয়ে পড়বে বা একেবারে পড়ে যাবে। কিন্তু ব্যাপারটা তোমার সাপেক্ষে সম্পূর্ণ পাল্টে যাবে যখন প্লাটফরমটা ঘুরছে এখন, প্ল াটফর্মটা যদি খুবই দ্রুত ঘোরে, এই নততল তোমার কাছে অনুভূমিক লাগবে, কারণ অপকেন্দ্রের বলের (Centrifugal push) এবং অভিকর্ষজ টানের লব্ধি বল অনুরূপভাবে নত হবে, কেবল উত্তোলিত প্রান্তের সঙ্গে সমকোণে। (প্রসঙ্গ-ক্রমে এটাই প্রমাণ করে রেলপথের বক্র অংশের বাইরের রেল কেন ভেতরের রেলের থেকে একটু উঁচু হয়। দৌড়ের বৃত্ত এই একই কারণে ভেতরের দিকে একটু চাপা হয় এবং দৌড়-প্রতিযোগীরা খুব নত বৃত্তীয় পার ঘেঁষে দৌড়াতে সক্ষম হয়।)

চিত্র 33



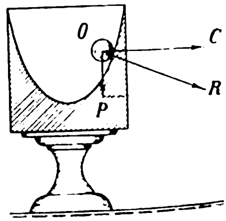
ঘূর্ণায়মান প্ল্যাটফর্মের নততলের প্রান্তে দাঁড়িয়ে তুমি পড়ে যাবে না।

বৃত্তাকার নাগরদোলার প্রান্তদেশ যদি এমনভাবে বাঁকানো থাকে যে, নির্দিষ্ট বেগে ঘোরার সময় এর তলের প্রতিটি বিন্দু লব্ধি বলের সঙ্গে সমকোণ করে থাকে তাহলে এতে দণ্ডায়মান আরোহী ভাববে সে অনুভূমিক চ্যাপ্টা তলে দাঁড়িয়ে আছে, তা সে যেখানেই থাকুক না কেন। গণিতবিদেরা দেখেছেন যে, এই বক্রতল জ্যামিতিক দিক থেকে হবে অধিবৃত্তজ (Paraboloid)। পথটি বোঝানো যায় জলে অর্ধপূর্ণ একটি গ্লাসকে উল্লম্ব অক্ষে খুব দ্রুত ঘুরিয়ে। এক্ষেত্রে প্রান্তভাগের জল উপরে উঠবে আর কেন্দ্রের জল ক্রমশই নিচে নামবে, ফলে এক অধিবৃত্তজের সৃষ্টি হবে। জলের বদলে যদি গলা-মোম ব্যবহার করা যায় এবং মোম জমে না যাওয়া পর্যন্ত গ্লাসটিকে ঘোরান যায় তবে আমরা অবিকল এক অধিবৃত্তজ পাব। নির্দিষ্ট বেগে যখন ঘোরান হবে, এই ধরনের শক্ত দ্রব্য তখন এক অনুভূমিক তল প্রদর্শন করবে এবং একটা ছোট গোলক এর উপর এর ঘূর্ণায়মান তলে রাখলে গোলকটা গড়িয়ে পড়বে না, যেখানে রাখা হবে সেখানেই থেকে যাবে (চিত্র 34)।

এখন তুমি সহজেই বুঝতে পারবে 'যাদু-করা' গোলকটির কিভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এর নিচের তল (চিত্র 35) অধিবৃত্তজাকারের

একটি বড় ঘূর্ণায়মান প্লাটফর্ম। যদিও গুপ্ত যান্ত্রিক উপায়ে খুব অবাধে এটা ঘোরানো হয়, ভেতরের আরোহীরা বোধ করে যে, তাদের মাথা ঘুরছে গোলকাকার কক্ষের আসবাবপত্রও তাদের সাথে সাথে না ঘোরে। প্লাটফর্মটা

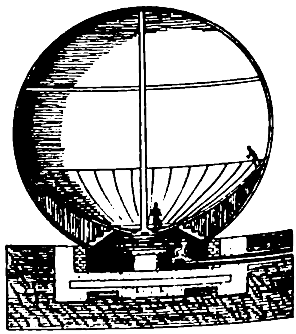
চিত্র 34 জলের বালতি যদি খুব দ্রুত ঘোরানো হয়, তা হ'লে পার্শ্বের গোলক (ball) যথাস্থানে থেকে যাবে।



ঘুরছে না এমন বোধ জন্মানোর জন্য এটাকে প্লাটফর্মের সঙ্গে সমবেগে ঘূর্ণায়মান একটা অনচ্ছ (Opaque) গোলকে স্থাপন করা হয়।

এখন এর মধ্যে তুমি কি দেখবে এবং কি বোধ করবে? এটা যখন ঘুরবে, তোমার পায়ের নিচের মেঝে সমতল ঠেকবে তা তুমি যেখানেই দাঁড়াও না কেন—অক্ষের উপরই হোক যেখানে মেঝে প্রকৃতই অনুভূমিক অথবা প্রান্তদেশেই হোক যেখানে মেঝে 45° নততলে আছে। তোমার চোখ স্পষ্টই মেঝের অবতলরূপ দেখতে পাবে কিন্তু তোমার পেশীসমূহ বোধ করবে যে, তুমি চ্যাপ্টা সমতল মেঝেতে দাঁড়িয়ে আছ। চোখে-দেখা বা দাঁড়িয়ে-থাকা এই

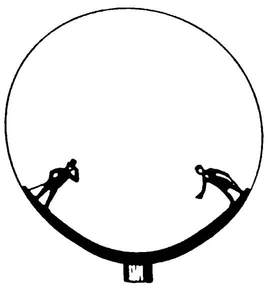
চিত্র 35 যাদু-করা গোলক (প্রস্থচ্ছেদ)



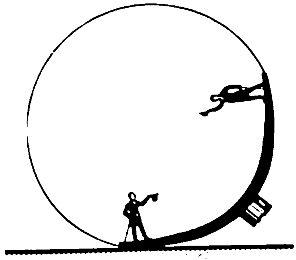
দু'রকম বোধ পরস্পর বিরোধী মনে হবে। প্লাটফর্মের প্রান্ত থেকে প্রান্তে হেঁটে বেড়ানোর সময় মনে হবে যেন সমস্ত গোলকটা তার অত বড় আকার সত্ত্বেও তোমার ভারে দুলে উঠেছে সাবানের ফেনার মত। যখন তুমি মনে করবে

যে, তুমি সবসময় সমতল ভূমিতে দাঁড়িয়ে আছ, তোমার সামনের অন্যান্য আরোহীদের মনে হবে গোলকের অভ্যন্তরে তারা মাছির মত উপর নিচে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে। মেঝেতে জল ফেললে তা ওর অবতল পৃষ্ঠে সমভাবে ছড়িয়ে পড়বে এবং তোমার মনে হবে তোমার সামনে এক নততলের জলের দেওয়াল রয়েছে।

চিত্র 36 [illegible]-কর গোলকে দুই ব্যক্তির প্রকৃত অবস্থান।

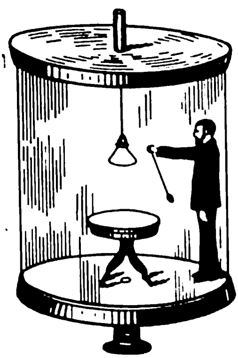


চিত্র 37 দুজনের প্রত্যেকেই তাদের দে[illegible] বিষয়ে যা ভাবে।

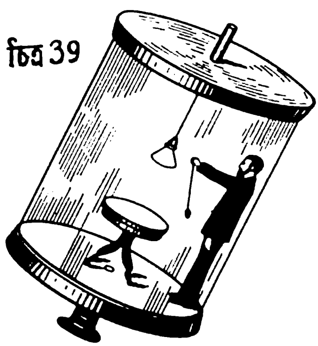


তোমার অভিকর্ষ সম্বন্ধে সমস্ত চিরাচরিত - ধারণা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। বিমান চালক মোড় ফেরার সময় অনুরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করবে। ঘণ্টায় 200

চিত্র 38।



চিত্র 39



ঘূর্ণায়মান পরীক্ষাগার / প্রকৃত অবস্থান। ঘূর্ণায়মান পরীক্ষাগার / আপাত অবস্থান।

কিলোমিটার বেগে 500 মিটার ব্যাসার্ধের বাঁকা পথে ওড়ার সময় নিচের পৃথিবী অস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে এবং 15° কোণ করে আছে মনে হবে।

জার্মানীর গ্যোটিংগেন (Goettingen) শহরে বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যে অনুরূপ একটা ঘূর্ণায়মান পরীক্ষাগার তৈরী হয়েছে। এটা একটা 3 মিটার চওড়া চোঙাকৃতি কক্ষ, যা সেকেণ্ডে 50 বার আবর্তন করে (চিত্র 38)। এর মেঝে চ্যাপ্টা বা সমতল হওয়ায় এর দেওয়ালের গায়ে দাঁড়ানো দর্শক মনে করে যে, ঘূর্ণায়মান কক্ষটি পেছনে হেলে রয়েছে। দর্শক আরও মনে করবে, সে নিজে নততল বিশিষ্ট দেওয়ালে অর্ধশায়িত অবস্থায় রয়েছে (চিত্র 39)।

তরল বস্তুর টেলিস্কোপ

প্রতিফলক দূরবীক্ষণ যন্ত্রের (Reflecting telescope) পক্ষে সবচেয়ে ভালো দর্পণ হল অধিবৃত্তাকার দর্পণ, অনেকটা ঘূর্ণায়মান পাত্রের তরল বস্তুর তল যেমন হয়। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের উদ্ভাবকরা এই আকারের দর্পণ প্রস্তুত করতে প্রভূত ক্লেশ স্বীকার করেন, বছরের পর বছর এর প্রস্তুতির কাজে অতিবাহিত হয়। আমেরিকার পদার্থবিদ উড (Wood) অনেকটা এই সমস্যা উৎরে ছিলেন তরল দর্পণের উদ্ভাবন করে। খুব বড় মুখ-ওয়ালা এক পাত্রের চারিধারে তিনি পারদ জড়ালেন এবং এইভাবে তিনি এক আদর্শ অধিবৃত্তাকার তল পেলেন যা, পারদ সুন্দরভাবে আলোকের প্রতিফলন ঘটায় বলে, ভালোভাবে দর্পণের কাজ করতে পারে। উড একটা অগভীর কূয়োর উপর দূরবীক্ষণ যন্ত্রটিকে বসালেন। পারদ ও উডের মুখের প্রতিবিম্ব সম্বলিত পাত্রটিকে ঘোরানোর জন্য চালক বেল্ট ব্যবহার করা হল। যন্ত্রটির অবশ্য ত্রুটি ছিল। সামান্যতম নাড়ায় তরল দর্পণের পৃষ্ঠতলে আলোড়ন ঘটাত এবং প্রতিবিম্বকে বিকৃত করে তুলতো। অনুকরণীয় সরলতা সত্ত্বেও উডের পারদ দূরবীক্ষণ কোনো ব্যবহারিক প্রয়োগে এল না। আবিষ্কারক নিজে বা সমসাময়িক পদার্থবিদেরা কেউই এটাকে তেমন আমল দেন নি। এখানে, আমেরিকার এক বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক এ. জি. ওয়েবস্টারের (A. G. Webster) এই যন্ত্রের মূল উদ্ভাবন দেখে যে প্রতিক্রিয়া হয়, তা তুলে ধরা হল ঃ তিনি লিখলেন—

ডিং ডং ঘণ্টা বেজে চলেছে
প্রফেসর ঐ তো কূপে রয়েছে,
ঐখানে তিনি কি রাখলেন ?
পাত্রটা পুরোপুরি টিনে ঢাকলেন।
পেলেন না কিছুটি, শুধু ডামাডোল
নানা তোড়জোড় শুধু বাধিয়েছে গোল।

লুপ ঘুরে লুপ করা

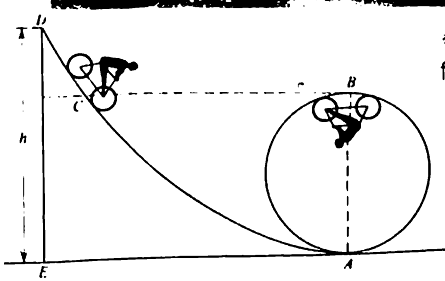
তোমরা সার্কাসে মাথা-ঘুরে-যাওয়া সাইকেলের খেলা দেখে থাকবে। সাইকেল আরোহী লুপ ঘুরে লুপ করে উপরে উঠে মাথা নিচের দিকে করে।

40 নং চিত্রে এই আকর্ষণীয় খেলার একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ক্রীড়াবিদ্ নততলের বাঁকানো পথে সাইকেল চালিয়ে নেমে আসে, দ্রুত উপরে উঠে গিয়ে পূর্ণ এক বৃত্ত রচনার জন্য মাথা নিচের দিকে করে, যতক্ষণ না আর একবার নিরাপদে মাটিতে পৌঁছচ্ছে। [চমকপ্রদ ও অবাক করে দেওয়া এই খেলা 1902 সালে যুগপৎ দুজন সার্কাস ক্রীড়াবিদ আবিষ্কার করেন—'দিয়াবোলো' জনসন ('Diabolo' Johnson) এবং 'মিফিস্টো' নয়সেটি (Mephisto Noisette)]।

সাইকেলের এই মাথা-গুলিয়ে দেওয়া খেলা মল্ল-ক্রীড়ার পরাকাষ্ঠা বলে মনে হয়। হতভম্ব হয়ে দর্শক ভাবতে থাকে কোন্ যাদু বল এই দুঃসাহসী ক্রীড়াবিদকে পতন ও ঘাড় ভেঙে যাওয়া থেকে রক্ষা করে! সন্দেহবাদীর দল

চিত্র 40





লুপ ঘুরে লুপ করার খেলা।
নিচে বামে: গণনা করার চিত্র।

সন্দেহ করে এটা একটা চালাকি মাত্র। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এর মধ্যে অতি প্রাকৃত কিছুই নেই। বলবিদ্যা (Mechanics) সুন্দরভাবে প্রক্রিয়াটার ব্যাখ্যা দিতে

সমর্থ। অনুরূপ পথে সঞ্চরণশীল কোনো বিলিয়ার্ড বলও একই কৌশল দেখাতে পারে। স্কুলের পদার্থবিদ্যার পরীক্ষাগারে তোমরা হয়ত শিশু 'লুপ ঘুরে লুপ করা' কৌশলটা দেখে থাকবে।

সমস্ত ব্যবস্থাটার স্থায়িত্ব যাচাই করার জন্য, বিখ্যাত সাইকেল ক্রীড়াবিদ মিফিস্টো নিজের ওজনের সমান একটা ভারী লোহার গোলক ও বাইসাইকেলটি ব্যবহার করেন। যখন দেখলেন সব ঠিক আছে কেবলমাত্র তখনই নিজে এই খেলা দেখানোর ঝুঁকিটা নিলেন।

এতক্ষণে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো যে, এই অদ্ভুত খেলাটাও আমাদের পূর্বের পরীক্ষার জলপূর্ণ ঘূর্ণায়মান বালতির নিয়মের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে। লুপের শীর্ষের বিপদাঞ্চলে নিরাপদে ওঠার জন্য সাইকেল আরোহীর প্রয়োজনীয় বেগ থাকা প্রয়োজন যা নির্ভর করে কোথা থেকে আরোহী শুরু করছে তার উচ্চতার উপর। সর্বনিম্ন যে বেগ গ্রহণীয় তা নির্ভর করবে লুপ ব্যাসার্ধের উপর। এই জন্যই কৌশলটা সব সময় কাজ করে না। কোন্ উচ্চতা থেকে শুরু করা হবে তা নির্ভুলভাবে গণনা করা প্রয়োজন, অন্যথায় আরোহীর ঘাড় ভাঙার সম্ভাবনা।

"আমি ভালভাবেই জানি যে, এক সারি নীরস সূত্র, যত নীরস হওয়া সম্ভব তাই, পদার্থবিদ্যা ভালবাসে এমন কিছু লোককে ভয় দেখিয়ে দূরে সরিয়ে দিতে পারে। কিন্তু গাণিতিক দিকটা বাদ দিয়ে সে রকম লোকেরা ঘটনার গতি সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করার এবং ঘটনা ঘটার আবশ্যকীয় শর্তগুলি নির্ধারণ করার আনন্দ থেকে নিজেদের সোজাসুজি বঞ্চিত করেন। আলোচ্য ক্ষেত্রে আমার বিশ্বাস দু চারটে সূত্রই এই রোমাঞ্চকর চমকপ্রদ খেলা 'লুপ ঘুরে আসা' সার্থকভাবে সম্পন্ন করার আবশ্যকীয় শর্তগুলি যথেষ্ট সঠিকভাবে নির্ধারণ করার জন্য সুপর্যাপ্ত।

সার্কাসের গণিত

এখানে সেগুলো দিচ্ছি। প্রথমে যে সমস্ত মান নিয়ে আমরা কাজ করবো, সেগুলো চিহ্নিত করি। ধরা যাক, যেখান থেকে সাইকেল আরোহী শুরু করছে তার উচ্চতা h, x লুপের শীর্ষবিন্দু থেকে h-এর অংশ, 40 নং চিত্রে দেখানো হয়েছে $x = h - AB$, r—লুপের ব্যাসার্ধ, m—আরোহী ও বাই-সাইকেলের মোট ভর (তাদের ওজন mg দিয়ে বোঝানো হবে, যেখানে g অভিকর্ষজ ত্বরণ এবং যার মান জানা আছে 9·8 মি./সে.^{2}) এবং সর্বশেষে লুপের শীর্ষে আরোহীর বেগ।

এখন এই সব মান থেকে আমরা দুটো সমীকরণ লিখতে পারি।

(1) বলবিদ্যা থেকে আমরা জানি নততলে C বিন্দুতে আরোহীর গতিবেগ যা B-এর সঙ্গে সমতলে আছে (40 নং চিত্রের নিচের অংশে এই অবস্থান দেখানো হয়েছে)। লুপের শীর্ষে B বিন্দুতে গতিবেগের সমান, আমাদের প্রথম গতিবেগ লেখা যায় $v = \sqrt{2gx}$ বা $v^2 = 2gx$ (আমরা সাইকেলের ঘূর্ণায়মান চাকার রিমের শক্তি বাদ দিতে পারি কেননা ফলের উপর এর প্রভাব অতি সামান্য) ; ফলে আরোহীর B বিন্দুতে গতিবেগ $v = \sqrt{2gx}$, অর্থাৎ $v^2 = 2gx$।

(2) B বিন্দুতে পৌঁছে সাইকেল-আরোহী যাতে পড়ে না যায় তার জন্য অপকেন্দ্র ত্বরণ (Centrifugal accelaration) অভিকর্ষজ ত্বরণের চেয়ে বড় হওয়া দরকার, অথবা অন্যভাবে বলা যায়, $\frac{v^2}{r} > g$, $v^2 > gr$ এবং যেহেতু

$v^2 = 2gx$, ফলে, $2gx > gr$ বা, $x > \frac{r}{2}$।

সুতরাং এই বিস্ময়কর খেলাটা সাফল্যজনকভাবে অনুষ্ঠিত করার জন্য পথের নততলের অংশের শীর্ষের চাপ লুপের শীর্ষবিন্দু থেকে এর অর্ধ ব্যাসার্ধ অপেক্ষা বড় হওয়া প্রয়োজন। পথটা কত কোণে নত তা অত গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হল যে, যাত্রা শুরুর বিন্দু লুপের শীর্ষবিন্দুর চেয়ে তার (লুপের) ব্যাসের সিকিভাগের চেয়ে বেশি উপরে থাকবে। 16 মিটার ব্যাসের লুপের জন্য সাইকেল আরোহীকে অন্তত 20 মিটার উচ্চতা থেকে শুরু করতে হবে। যদি সে তা না করে, সে লুপের উপর ঘুরে আসতে পারবে না, সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছানোর আগে সে পড়ে যাবে।

এখানে আমরা সাইকেলের উপর ঘর্ষণজনিত বলের প্রভাব অগ্রাহ্য করেছি এবং ধরে নিয়েছি C ও B বিন্দুতে বেগ সমান। সেইজন্য আমরা পরিক্রমণ পথটা বেশি দীর্ঘ করবো না, এবং বেশি ঢালু করবো না, কারণ, তাহলে ঘর্ষণের জন্য B বিন্দুতে পৌঁছানোর সময় সাইকেলের বেগ C বিন্দুর বেগের চেয়ে কম হবে।

আরও মনে রাখা দরকার যে, এই চমকপ্রদ খেলার জন্য সাইকেল আরোহী প্যাডেল করে না, সাইকেল নিজেই ভরবেগ (Momentum) সংগ্রহ করে। সে তার গতি ত্বরান্বিত বা মন্দীভূত করতে পারে না এবং করা তার পক্ষে উচিতও নয়। যা তার অবশ্য কর্তব্য তা হল পরিক্রমণ পথের মধ্যখানে থাকা, কারণ এর থেকে সামান্য বিচ্যুতি তাকে ফেলে দেবে। যে বেগে সে লুপ ঘুরে আসে তা বড়। 16 মিটার লুপে সাইকেল-আরোহী তিন সেকেন্ডে লুপ ঘুরে আসবে যা ঘণ্টায় 60 কিলোমিটার বেগের সমান। অবশ্য এত অতিরিক্ত বেগে সাইকেল চালনা করা কঠিন। বস্তুত সাইকেল আরোহীর এর জন্য দুশ্চিন্তারও কারণ

নেই। তার শুধু বলবিদ্যার নিয়মের উপর আস্থা রাখতে হবে। "সাইকেলের এই চোখ ধাঁধানো খেলা," পেশাদার এক সাইকেল আরোহীর এক পুস্তিকায় আছে, "কোনো সমস্যার সৃষ্টি করে না, কেবলমাত্র যদি সমস্ত ব্যবস্থাটা নিখুঁত ও সু-সংহতভাবে গঠিত হয়। সাইকেল আরোহী নিজেই আসল সমস্যা। তার হাত যদি কাঁপে, যদি সে উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং মাথা ঠিক রাখতে না পারে, অথবা তার মাথা যদি হঠাৎ ঘুরে যায়, অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারে।"

বিখ্যাত 'নেসটেরভ (Nesterov) লুপ' এবং অন্যান্য এই ধরনের খেলা একই নিয়মের ভিত্তিতে গড়া। লুপ ঘুরে আসা খেলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ক্রীড়াবিদের সুনিপুণ গাড়ি চালনা এবং প্রয়োজনীয় প্রাথমিক গতি।

ওজনে ঘাটতি

জনৈক খামখেয়ালী লোক একদা বলেছিল যে, ক্রেতাকে প্রবঞ্চিত না করেই কি ভাবে ওজন কম দিতে হয়, সে জানে। তার ধারণা এই জন্য নিরক্ষীয় অঞ্চলে জিনিস ক্রয় করে মেরু অঞ্চলে বিক্রয় করলেই হবে। অনেক দিন থেকেই জানা আছে যে, নিরক্ষীয় অঞ্চলে বস্তুর ওজন মেরু অঞ্চল অপেক্ষা কম। নিরক্ষীয় অঞ্চলের এক কিলোগ্রাম ওজনের কোনো বস্তু মেরু অঞ্চলে আরও পাঁচ গ্রাম বেশি ওজন দেবে। এইজন্য অবশ্য সাধারণ তুলা ব্যবহার না করে নিরক্ষীয় অঞ্চলে প্রস্তুত বা স্কেল ঠিক করা স্প্রীং-তুলা ব্যবহার করতে হবে। অন্যথায় কোনো সুবিধে হবে না। বস্তু গুরুভার হয়ে উঠবে সত্য কিন্তু সাথে সাথে ওজন করার বাঁটখারাগুলোও গুরুভার হবে, পেরুতে এক টন সোনা কিনে আইসল্যাণ্ডে এনে বিক্রয় করলে বেশ লাভ হবে, যদি পরিবহণ ব্যয় না লাগে।

এখন আমি যদিও বিশ্বাস করি না যে, কেউ এভাবে ব্যবসা করে ধনবান হবে, তবুও এ কথা সত্য যে, আমাদের খামখেয়ালী লোকটি ঠিকই বলেছিল। অভিকর্ষজ বল যত নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে যত দূরে যাওয়া যায় তত বৃদ্ধি পায়। এমনটি ঘটার কারণ পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে নিরক্ষীয় অঞ্চলে বস্তুপুঞ্জ বৃহত্তম বৃত্ত রচনা করে এবং এর আর একটি কারণ নিরক্ষীয় অঞ্চলে পৃথিবী যেন স্ফীত হয়ে উঠেছে। যাই হোক, 'কম ওজনের' প্রধান কারণ পৃথিবীর ঘূর্ণন। এই কারণেই মেরু অঞ্চলের কোনো বস্তুর ওজন অপেক্ষা নিরক্ষীয় অঞ্চলে ঐ বস্তুর ওজন প্রায় $\frac{1}{290}$ ভাগ কম।

ওজনের এই প্রভেদ এক অক্ষাংশ থেকে অপর কোনো অক্ষাংশে নিয়ে যাবার সময় হালকা জিনিসের বেলায় স্বভাবতই খুব নগণ্য হবে, কিন্তু খুব ভারী বস্তুর বেলা বেশ লক্ষণীয়। আমার মনে হয়, তুমি হয়ত জানই না যে, মস্কোয় 60 টন ওজনের কোনো ট্রেন আরখানজেল্স্ক-এ এলে ওজনে 60 কিলোগ্রাম বেশি ভারী হবে আবার ওডেসায় গেলে ওজনে 60 কিলোগ্রাম হালকা হবে।

এক সময় ছিল যখন স্পিৎসবার্গেন প্রতি বছর দক্ষিণের বন্দরগুলোতে 300,000 টন কয়লা পাঠাত। যদি ঐ পরিমাণ কয়লা নিরক্ষীয় অঞ্চলের কোনো বন্দরে পাঠান হত তাহলে দেখা যেত ওজন 1200 টন কম—অবশ্য বন্দরে আসার পর যদি কয়লাটা স্পিৎসবার্গেনের স্প্রীং তুলায় ওজন করা হত। আরখাননেল্স্ক-এ 20,000 টন ওজনের যুদ্ধ জাহাজ ওজনে প্রায় 80 টন হালকা হয়ে যাবে নিরক্ষীয় জলে এলে। কিন্তু আমাদের এটা নজরে পড়ে না, কারণ সবকিছুই এমন কি সাগরের জল পর্যন্ত হালকা হয়ে যাবে। ঘটনাক্রমে, সেই কারণেই জাহাজ নিরক্ষীয় অঞ্চলে ও উত্তর মেরু অঞ্চলে একই পরিমাণ জল টানে। যদিও জাহাজ একটু হালকা হয়ে যায়, এ যে জল সরায় তাও সমপরিমাণে হালকা হয়ে ওঠে।

পৃথিবী যদি এখনকার চেয়ে আরও দ্রুত আবর্তন করত, অন্য কথায়, আমাদের যদি 24 ঘণ্টার পরিবর্তে 4 ঘণ্টায় দিন হত—তা হলে নিরক্ষীয় ও মেরু অঞ্চলে কোনো বস্তুর ওজনের পার্থক্য আরও অনেক বেশি হত। সেই ক্ষেত্রে মেরু অঞ্চলের 1 কিলোগ্রাম ওজনের কোনো বস্তু নিরক্ষীয় অঞ্চলে মাত্র 875 গ্রাম হত। শনিগ্রহে আমাদের অনেকটা এই ধরনের অবস্থা। এর মেরু অঞ্চলে সমস্ত বস্তু এর নিরক্ষীয় অঞ্চলের চেয়ে ওজনে $\frac{1}{6}$ ভাগ বেশি হবে।

যেহেতু অপকেন্দ্র ত্বরণ (Centrifugal accelaration) বেগের বর্গের সঙ্গে সমানুপাতিকভাবে বাড়ে, আমরা সহজেই বার করতে পারি অপকেন্দ্র ত্বরণ 290 গুণ বৃদ্ধি করতে হলে পৃথিবীকে বা, অন্যকথায়, অভিকর্ষজ বলের সঙ্গে ভারসাম্য রাখতে কত দ্রুত আবর্তন করতে হবে। পৃথিবী এখানকার চেয়ে 17 গুণ দ্রুত বেগে আবর্তন করলে এটা ঘটত (17-র 17 গুণ প্রায় 290), বস্তুপুঞ্জে তা হলে কোনো চাপা দিত না এবং ওদের কোনো ওজনও থাকত না। শনি গ্রহে একই জিনিস ঘটবে যদি গ্রহটি এখনকার চেয়ে 2·5 গুণ দ্রুততর বেগে আবর্তন করত।

পরিচ্ছেদ 8

মহাকর্ষ

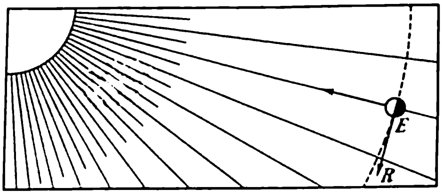
অভিকর্ষ বল কি তাৎপর্যপূর্ণ ?

বিখ্যাত ফরাসী জ্যোতির্বিদ আরাগো লিখেছিলেন, "আমরা যদি পতনশীল বস্তুদের প্রতি মুহূর্তে না দেখতে পেতাম, তবে একে আমরা সবচেয়ে বিস্ময়কর এক ব্যাপার বলেই ধরে নিতাম।" অভ্যাসবশত, আমরা অভিকর্ষকে বা পৃথিবীর উপর সমস্ত বস্তুর জন্য এর আকর্ষণকে স্বাভাবিক এবং সাধারণ ব্যাপার বলেই মনে করি। কিন্তু যখন আমাদের বলা হয় যে, বস্তুরাও পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে, আমরা একে প্রায় বিশ্বাসই করতে পারি না, কারণ, সাধারণত, কখনোই এ ঘটনা আমাদের চোখে পড়ে না।

সত্যিই, কেন এমন হয় যে, মহাকর্ষের সূত্রের সব সময় বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে না ? কেন আমরা কখনোই টেবিল, তরমুজ কিংবা মানুষদের একে অপরকে আকর্ষণ করতে দেখি না ? কারণ ছোট বস্তুদের ক্ষেত্রে, এই আকর্ষণ বল অত্যন্ত কম। একটা লৌকিক উদাহরণ নেওয়া যাক। একে অপরের থেকে দুই মিটার দূরে অবস্থিত দুটি লোক অবশ্যই পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করবে। কিন্তু এই প্রযুক্ত বল অত্যন্ত সূক্ষ্ম, যা কিনা সাধারণ ওজনের মানুষের জন্য 0·01 মিলিগ্রামেরও কম। অন্যকথায় বলা যায়, দুটি লোক পরস্পরকে আকর্ষণ করে সেই বলে, 0·00001 গ্রাম ভার যে বল তুলাপাত্রে প্রয়োগ করে। কেবলমাত্র সেই সব অত্যন্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মাপনীই এইরকম ছোট ওজন পরিমাপ করতে পারবে, যা বিজ্ঞানীরা তাদের পরীক্ষাগারে ব্যবহার করেন। বলা বাহুল্য যে, এই বল কখনোই আমাদের প্রভাবিত করবে না, যেহেতু এটি আমাদের পায়ের তলা ও মাটির মধ্যে ঘর্ষণের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অবদমিত হয়। কাঠের মেঝের উপর দাঁড়ানো একটা লোককে ঠেলতে তোমাকে অন্তত 20 কিলোগ্রামের একটা বল প্রয়োগ করতে হবে—যেখানে লোকটার পায়ের তলা ও মেঝের মধ্যে ঘর্ষণকে তার ওজনের 30 শতাংশের সঙ্গে তুলনা করা চলে। এবং এই বলের সঙ্গে 1 মিলি-গ্রামের একশো ভাগের এক ভাগের সমান একটা নগণ্য আকর্ষণের তুলনা করা হাস্যকর ছাড়া আর কিছুই নয়। 1 মিলিগ্রাম 1 গ্রামের সহস্রাংশ ঃ এক গ্রাম এক

কিলোগ্রামের এক সহস্রাংশ, এইভাবে 0·01 মিলিগ্রাম হল সঠিকভাবে সেই বলের একশো কোটি ভাগের এক ভাগেরও অর্ধেক, যে বল একটা লোককে টেনে সরাতে পারে। এটা তাই ছোট্ট বিস্ময় যে, সাধারণ অবস্থায় বস্তুদের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ কখনোই আমাদের চোখে ধরা দেয় না।

চিত্র 41



সূর্যের আকর্ষণ পৃথিবীর (E) প্রক্ষেপ থেকে বাঁচায়। জাড্য (inertia) পৃথিবীকে ER স্পর্শকের দিকে সরিয়ে দিতে পারতো।

কিন্তু যদি ঘর্ষণ না থাকত, তাহলে কোনোকিছুই বস্তুদের কাছাকাছি নিয়ে আসার ক্ষীণতম আকর্ষণকেও বাধা দিতে পারত না। আমাদের 0·01 মিলিগ্রাম বলের ক্ষেত্রে অবশ্য, যে দ্রুতিতে লোক দুটি পরস্পরের দিকে আকর্ষিত হবে তা হবে নগণ্য। ঘর্ষণের অনুপস্থিতিতে, দুই মিটার দূরত্বে অবস্থিত দুটি লোক প্রথম ঘণ্টায় পরস্পরের কাছে আসবে 3 সেমি, দ্বিতীয় ঘণ্টায় 7 সেমি এবং তৃতীয় ঘণ্টায় 15 সেমি ; দেখা যাচ্ছে, যতই দুজন কাছাকাছি আসে, গতিবেগ বাড়ে, তৎসত্ত্বেও দুজন একসঙ্গে মিলিত হতে আরও পাঁচ ঘণ্টা লাগবে।

যেখানে ঘর্ষণ কোনো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে না, বা, অন্যকথায় স্থির বস্তুদের ক্ষেত্রে অভিকর্ষ বল স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এই বল একটুকরো সুতোয় ঝোলানো একটা ওজনের উপর ক্রিয়া করে একে উল্লম্বভাবে নিচের দিকে ঝুলিয়ে রাখে। কিন্তু এর কাছাকাছি যদি কোনো ভারী বস্তু থাকে, তবে তা ওজনটিকে নিজের দিকে টানবে, ফলে সুতোটি উল্লম্বদিক থেকে কিছুটা সরে গিয়ে অভিকর্ষ বল ও ভারী বস্তুটির আকর্ষণের লব্ধি বলের দিক বরাবর ঝুলে থাকবে। মাস্‌-কেলিন 1775 খ্রীষ্টাব্দে স্কটল্যাণ্ডের এক বড় পর্বতের কাছে এই ঘটনা প্রথম লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি পর্বতটির দুই দিকে সৌর মেরুর দিকের সঙ্গে ওলন-দড়ির (Plumb line) বিচ্যুতির তুলনা করেন। পরবর্তীকালে বিশেষভাবে নির্মিত স্কেলের সাহায্যে করা বিশদ পরীক্ষাগুলি থেকে বিজ্ঞানীরা সঠিকভাবে অভিকর্ষ বলের পরিমাপ করতে বলেছিলেন।

ছোট ছোট ভরের মধ্যে আকর্ষণ বল নগণ্য। ভারগুলি বাড়তে থাকলে আকর্ষণ বলও সেই অনুসারে তাদের গুণফলের সমানুপাতে বাড়তে থাকে। অনেকের কিন্তু আবার এই বলকে বাড়িয়ে বলার প্রবণতা আছে। একজন বিজ্ঞানী—সত্যি বলতে কি তিনি পদার্থবিজ্ঞানী ছিলেন না, একজন প্রাণিবিদ—

আমাকে নিশ্চিত করে বলতে চেয়েছিলেন যে, সমুদ্রে প্রায়ই জাহাজদের মধ্যে যে পারস্পরিক আকর্ষণ দেখা যায় তা মহাকর্ষের জন্যই ঘটে। একটা হিসাব করলেই সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাবে যে, মহাকর্ষের ঐ ঘটনাতে কোনো প্রভাবই নেই। দুটি 25,000 টনের যুদ্ধজাহাজ পরস্পরকে মাত্র 400 গ্রামের একটা বলে আকর্ষণ করে, যখন তারা 100 মিটার দূরত্বে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই, এই বল জাহাজদের সরানোর পক্ষে অত্যন্ত ক্ষুদ্র। আমরা জাহাজদের মধ্যে এই অদ্ভুত আকর্ষণের প্রকৃত কারণ তরলের ধর্ম বিষয়ক পরের অধ্যায়ের পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করব।

ছোট ছোট ভরের ক্ষেত্রে নগণ্য হলেও, মহাকর্ষ বল বিরাট বলের আকারে দেখা দেয়, যখন আমরা আকাশের বস্তুদের প্রকাণ্ড ভরের দিকে তাকাই। সৌরজগতের বাইরের কক্ষপথের ঠিক উপরে দূরে অবস্থিত গ্রহ নেপচুনও পৃথিবীকে 180 লক্ষ টন বলে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। আমাদের এবং সূর্যের মধ্যেকার প্রকাণ্ড দূরত্ব সত্ত্বেও, মহাকর্ষই একমাত্র পৃথিবীকে তার কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হতে দেয় না। যদি সূর্যের আকর্ষণ থেমে যেত, তাহলে আমাদের এই গ্রহ এর কক্ষপথের স্পর্শক বরাবর ছিটকে গিয়ে অসীম মহাকাশে অবিরাম ছুটতেই থাকত।

সূর্য-পৃথিবী সংযোজী ইস্পাত তার

একবার কল্পনা কর, সূর্যের শক্তিশালী আকর্ষণ যেন সত্যিই থেমে গেছে এবং পৃথিবী যেন অন্ধকার মহাবিশ্বের গহনে হারিয়ে যাবার মত অদ্ভুত ভয়ংকর এক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে। আরও কল্পনা কর, যেন একদল কারিগর এই পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাওয়ার একটা উপায় খুঁজে পেয়েছে—তাঁরা মহাকর্ষের সেই অদৃশ্য 'রজ্জু'র বদলে একটা শক্ত ইস্পাতের তার উদ্ভাবন করেছেন যা কিনা পৃথিবীকে তার সূর্য বেষ্টনকারী কক্ষপথের উপর রাখবে। তাছাড়া ইস্পাতের চেয়ে শক্তিশালী আর কি হতে পারে, যা কিনা প্রতি বর্গ মিলিমিটারে 100 কেজি টান সহ্য করতে পারে?

যেহেতু এর প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল 20,000,000 বর্গমিলিমিটার, কেবলমাত্র 2,000,000 টন ওজনই এই স্তম্ভকে ভাঙতে পারবে। এরপর মনে কর, এই স্তম্ভ পৃথিবী থেকে সূর্য পর্যন্ত সমস্ত পথ জুড়ে রয়েছে এবং দুই প্রান্তে দৃঢ়ভাবে আটকানো আছে। তুমি কি জান, পৃথিবীকে তার কক্ষপথের উপর ধরে রাখতে এইরকম কটা স্তম্ভ লাগবে? এক লক্ষ কোটি! সমস্ত মহাদেশ ও সাগর ব্যাপী ইস্পাতের স্তম্ভের ঘন জঙ্গলের একটা পরিষ্কার ছবি পেতে হলে আরও বলতে হয় যে, যদি এদের সূর্যের মুখোমুখি পৃথিবীর দিকের উপর সমভাবে

বণ্টন করা হত, তাহলে দুটি পাশাপাশি স্তম্ভের মধ্যে জায়গাটার ক্ষেত্রফল স্তম্ভটার ক্ষেত্রফলেরই প্রায় সমান হত। ইস্পাতের স্তম্ভের এই প্রকাণ্ড জঙ্গল ভাঙতে যে বল প্রয়োজন হবে, তা কল্পনা করলেই আপনি অবশেষে বুঝতে পারবেন কত শক্তিশালী সেই অদৃশ্য বল যা পৃথিবীকে সূর্যের দিকে আকর্ষণ করে।

এই প্রকাণ্ড বল পৃথিবীর পথকে বাঁকিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে, এবং পৃথিবীকে একটা স্পর্শক থেকে প্রতি সেকেণ্ডে 3 মিমি সরিয়ে আনে। পৃথিবী যে একটা বাঁধা উপবৃত্তাকার পথে ঘোরে, এটাই তার একমাত্র কারণ। পৃথিবীকে প্রতি সেকেণ্ডে মাত্র 3 মি.মি. (অর্থাৎ এই লাইনের উচ্চতা) সরাতে একটা প্রকান্ড বলের প্রয়োজন, এটা কি বিস্ময়কর নয়? এটাই তোমাকে দেখায় কি বিশাল এই পৃথিবীর ভর হতে পারে—যাকে এরকম এক দৈত্যাকৃতি বল মাত্র 3 মি.মি. সরাতে পারে।

আমরা কি অভিকর্ষজ বলের থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারি?

আমরা এইমাত্র ভেবে অবাক হচ্ছিলাম যদি পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে কোনো পারস্পরিক আকর্ষণ না থাকত, তাহলে কি হত? আমি তোমাদের বলেছিলাম সেই বিশেষ ক্ষেত্রে পৃথিবী সেই আকর্ষণের অদৃশ্য শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাওয়ায় মহাবিশ্বের গহনে অবিরাম ছুটতে থাকত। যদি অভিকর্ষ বল হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যেত, তাহলে আমাদের এবং এই গ্রহের উপর এখানে আমাদের চারপাশের সবকিছুর কি অবস্থা হত? আমাদের নিচের দিকে আটকে রাখার কিছু থাকত না, এবং সেইজন্য সামান্যতম ধাক্কাও আমাদের ঠেলে মহাকাশে পাঠিয়ে দিত। এমনকি সত্যিকারের কোনো ধাক্কা দেওয়ারও দরকার হত না, কারণ আলগাভাবে সংলগ্ন থাকা বস্তুদের মহাকাশে নিক্ষেপ করতে পৃথিবীর ঘূর্ণনই যথেষ্ট হত।

এইচ. জি. ওয়েলস্ একেই তার 'দি ফার্স্ট মেন ইন্ দি মুন' উপন্যাসের জন্য মূলভাব রূপে গ্রহণ করেছিলেন। এই উপন্যাসে চাঁদের পথে এক কাল্পনিক যাত্রার বর্ণনা দেওয়ার পর তিনি এক গ্রহ থেকে আরেক গ্রহে ভ্রমণের এক খুবই খাঁটি এবং কৌশলীকৃত উপায় তুলে ধরেন। ওয়েলসের প্রধান চরিত্র একজন বিজ্ঞানী যিনি আবিষ্কার করেছেন এক বিশেষ ধরনের সংকর ধাতু। সংকর ধাতুটির এক অদ্ভুত ধর্ম হল যে, অভিকর্ষ বল একে ভেদ করে যেতে পারে না। যখন এই সংকর ধাতুর তৈরী একটা পর্দা পৃথিবী এবং একটা বস্তুর মধ্যে রাখা হল, গ্রহটির আকর্ষণ সম্পূর্ণ অদৃশ্য হল এবং বস্তুটি তৎক্ষণাৎ অন্য বস্তুদের দ্বারা আকর্ষিত হল। ওয়েলস্ কাল্পনিক আবিষ্কর্তার নামানুসারে এই সংকরের নামকরণ করলেন 'ক্যাভোরাইট'।

"এখন সবাই জানে মহাকর্ষ বল বস্তুদের ভেদ করে যেতে পারে অর্থাৎ বস্তুমাত্রই মহাকর্ষ বলের পক্ষে 'স্বচ্ছ'। আলো বা তাপকে বা সূর্যের বৈদ্যুতিক

প্রভাব কিংবা পৃথিবীর উত্তাপ থেকে কোনো কিছুকে বাঁচাতে তুমি বিভিন্ন ধরনের পর্দা ব্যবহার করতে পার ; মার্কনির রশ্মিকে অগ্রাহ্য করার জন্য তুমি বস্তুদের ধাতুর পাতের পর্দা দিয়ে ঢাকতে পার। কিন্তু সূর্যের মহাকর্ষ বল কিংবা পৃথিবীর মহাকর্ষ বলকে কোনো কিছুই বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। কিন্তু কেন কোনো কিছুই এটা করতে পারবে না তা বলা কঠিন। ক্যাভর এটা বুঝতে পারেন নি যে, কেন এরকম বস্তু থাকবে না, এবং…তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে, তিনি এরকম সম্ভাব্য মহাকর্ষ-অভেদ্য একটা বস্তু তৈরি করতে পারবেন…

"যার বিন্দুমাত্র কল্পনাশক্তি আছে এমন যে কেউ এমন বস্তুর অসাধারণ সব সম্ভাবনার কথা বুঝতে পারবে…উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যদি কেউ একটা বিরাট ওজন তুলতে চাইত, তবে তাকে ঐ ওজনের তলায় ঐ বস্তুর (সংকর ধাতুর) একটা পাত রাখলেই চলত, এবং সে ওজনটাকে একটা খড় দিয়েই তুলতে পারত।"

এই আশ্চর্যজনক সংকর ধাতুকে ব্যবহার করে, ক্যাভর এবং তাঁর বন্ধু একটা মহাকাশযান তৈরি করেছিলেন, যেটাতে চড়ে তাঁরা চাঁদের পথে এক দুঃসাহসিক অভিযান করেন। তাঁদের গাড়ীটা ছিল অত্যন্ত সরল প্রকৃতির, এতে কোনো ইঞ্জিন ছিল না ; কেবলমাত্র সৌরজগতের বস্তুদের মহাকর্ষ বলের দ্বারাই এটা চালিত হয়েছিল। ওয়েলস্ এইভাবে তাঁর মহাকাশযানের বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

"একটা গোলক কল্পনা কর, যা এত বড় যে, দু'জন মানুষ ও তাদের তল্পি-তল্পা ধারণ করতে পারে। এটা পুরু কাচের সীমানা দেওয়া ইস্পাতের তৈরী ঘনীভূত বাতাস এবং ঘন খাদ্য, জল পরিশোধিত করার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি মজুতের ব্যবস্থা এতে থাকবে। ক্যাভোরাইটের ইস্পাতের বাইরের দিকটা হবে এনামেল করা। ভেতরের কাচের গোলকটি হবে বায়ু নিরোধক এবং ম্যানহোলটি ছাড়া এক ঢালা। ইস্পাতের গোলকটি ভাগে ভাগে তৈরি করা যেতে পারে, রোলার ব্লাইন্ডের ধাঁচে, যেন তাদের প্রয়োজনবোধে গুটিয়ে নেওয়া যায়। স্প্রীং-এর সাহায্যে এগুলো সহজেই কার্যকর করা যাবে এবং তড়িতের সাহায্যে মুক্ত এবং সংবরণ করে রাখা যাবে। প্লাটিনাম তারের সাহায্যে এই তড়িৎ প্রবাহ চালু করা হবে। এই তার অতিরিক্ত তড়িৎ প্রবাহ নিবারণের জন্য কাঁচের মধ্য দিয়ে যাবে। এই সমস্তই বিস্তারিত বিবরণের খাতিরে। তাহলেই দেখছ, ব্লাইন্ড রোলারগুলোর ঘনত্ব ছাড়া, ক্যাভোরাইটের গোলকের বাইরের দিকে জানলা থাকবে বা খড়খড়ি থাকবে—তুমি যেমন খুশি বলতে পার। ভাল কথা, যখন এই সব জানলা বা খড়খড়ি বন্ধ থাকবে তখন আলো, উত্তাপ, মাধ্যাকর্ষণ, কোনো-রকম প্রোজ্জ্বল শক্তি ইত্যাদি কিছুই এর মধ্যে প্রবেশ করবে না, তুমি বলতে পার এটা সরলরেখায় মহাশূন্যে উড়ে চলবে। কিন্তু একটা জানলা খোলো, মনে কর

একটা জানলা খোলা আছে। তাহলে তৎক্ষণাৎ কোনো ভারী বস্তু ওর দিকে এসে পড়লে সেটা আমাদের আকৃষ্ট করবে। ..

"বস্তুত পক্ষে আমরা ঠিক যেমন খুশি তেমনই শূন্য পরিক্রমা করে বেড়াব।"

কিভাবে ক্যাভোর এবং তার বন্ধু চাঁদে গিয়েছিলেন

ওয়েলস্ তাঁর মহাকাশযানের প্রস্থানের ভারী সুন্দর উৎসাহ উদ্দীপক বর্ণনা দিয়েছেন। ক্যাভোরাইটের বাইরের পাতলা পরদা একে সম্পূর্ণ ভারহীন করে রেখেছে। ফলে কোনো হ্রদের তলদেশে ছেড়ে দেওয়া কোনো শোলা যেমন ওর জলের উপরে উঠে আসে, ঠিক তেমন ভাবেই ক্যাভোরাইট বাতাসের সমুদ্রের মাথায় উঠে যেতে পারে। তার পরও এর যাত্রা অব্যাহত থাকে—পৃথিবীর ঘূর্ণনের গতি-জাড্যের কথা ভুলে যেও না—বায়ুমণ্ডলের সীমানা ছাড়িয়ে ক্যাভোরাইট মুক্তভাবে শূন্যে উড়তে থাকবে। ক্যাভোর এবং তার বন্ধু যখন নিজেদের মহাশূন্যে দেখল তখন তাঁরা খড়খড়ি তুলে দিল এবং যতক্ষণ না শেষ পর্যন্ত আমাদের উপগ্রহে এসে পৌঁছল ততক্ষণ কখনো সূর্যের, কখনো পৃথিবীর, কখনো বা চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে টেনে নিল। পরে দুই মহাকাশ যাত্রীর একজন ঐ একই প্রজেক্টাইলে চেপে এই পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করল।

এই গ্রন্থে আমার ওয়েলস্-এর প্রকল্পটিকে বিশ্লেষণ করার মাথা-ব্যথা নেই। বরং ওয়েলস্-এর গল্পটাই এখনকার মত পুরোপুরি মেনে নিয়ে ক্যাভোর ও তার বন্ধুর সঙ্গে চলো আমরাও চাঁদে পাড়ি দিয়ে আসি।

চাঁদের অর্ধ ঘণ্টা

পৃথিবীর অভিকর্ষজ বলের চেয়ে অনেক কম অভিকর্ষজ বল সম্পন্ন চাঁদের এই পৃথিবীতে তাঁরা কি অভিজ্ঞতা লাভ করলেন? পৃথিবীরই মানুষদের একজন যে গল্প করেছেন তাই পাঠ করা যাক। তাঁরা সবে মাত্র চাঁদের মাটিতে অবতরণ করেছেন।

"আমি চন্দ্রযানের প্যাঁচ খুলতে শুরু করলাম...আমি হাঁটু গেড়ে বসলাম, তারপর ম্যানহোলের প্রান্তে বসে, ওর দিকে চাইতে লাগলাম। নিচে, আমার দৃষ্টির এক গজের মধ্যে পদচিহ্ন হীন চাঁদের বরফ পড়ে আছে।...ক্যাভর তাঁর চাদরটার জন্য হাতটা বাড়াল, মাথাটাকে ওর মধ্যের গর্তে ঢুকিয়ে দিল এবং তারপর সারা গা ভালো করে মুড়ে নিল। ম্যানহোলের প্রান্তে সে বসে পড়ল এবং চাঁদের মাটি থেকে ছ-ইঞ্চির মধ্যে না আসা পর্যন্ত পা-দুটো নামাতে লাগল। এক মুহূর্তের জন্য সে একটু ইতস্ততঃ করল, তারপর সম্মুখে

নিজেকে ছুড়ে দিল…এবং শেষে মানুষের পদচিহ্নহীন চাঁদের মাটিতে গিয়ে দাঁড়াল।

"যখন সে সম্মুখে পা ফেলতে লাগল তখন সে হাস্যকরভাবে দর্পণের প্রান্তে প্রতিসরিত হতে লাগল। এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে সে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। তারপর সে নিজেকে গুটিয়ে নিল এবং লাফ দিল।

"দর্পণটা সবকিছু বিকৃত করে তুলল, কিন্তু আমার কাছে এটা খুব একটা বড় লাফ বলে মনে হল।…তাকে কুড়ি কি তিরিশ ফুট দূরবর্তী বলে মনে হল। সে একটা উঁচু প্রস্তরখণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে ছিল এবং আমার দিকে নানারকম আকার-ইঙ্গিত করতে লাগল। সম্ভবত সে চীৎকার করছিল—কিন্তু কোনো শব্দই আমার কাছে পৌঁছল না।…কিন্তু কিভাবে সে এই ঝঞ্ঝাট পাকাল?"

"ভ্যাবাচাকা খেয়ে আমিও ম্যানহোল দিয়ে গলে গেলাম। তারপর উঠে দাঁড়ালাম। আমার ঠিক সামনে তুষারের প্রবাহ সরে গেছে এবং এক রকম খাদের সৃষ্টি করেছে। এক পা এগিয়ে আমি লাফালাম।

"নিজেকে আমি ঊর্ধ্বে উড়ে যেতে দেখলাম, দেখলাম যে পাথরের উপর সে দাঁড়িয়ে ছিল সেটা আমার দিকে এগিয়ে আসছে, সেটাকে ধরে ফেললাম এবং অপার বিস্ময়ে আঁকড়ে ধরে রইলাম।…ক্যাভর নত হল এবং মিনমিনে গলায় চীৎকার করে আমায় সাবধান করে দিল। আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে, আমি এখন চাঁদে…আমার ভার পৃথিবীতে যা তার মাত্র একের ছয় ভাগ। কিন্তু এখন এই বিষয়টাই বার বার স্মরণ রাখার চেষ্টা করতে লাগলাম।…

"খুব সাবধানে আমি নিজেকে উপরে নিয়ে গিয়ে তুললাম এবং খুব সাবধানে বাতের রুগীর মত চলতে চলতে প্রখর রৌদ্রে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। গোলকটা তুষার তাড়িত হতে হতে আমাদের তিরিশ ফুট পেছনে পড়ে রইল।…

" 'চেয়ে দেখ!' আমি বললাম এবং ফিরে চেয়ে দেখি, ক্যাভর অদৃশ্য হয়ে গেছে।

"এক মুহূর্তের জন্য আমি যেন এফোঁড়-ওফোঁড় বিঁধে রইলাম। তারপর পাথরের প্রান্তের দিকে ভাল করে দেখার জন্য তাড়াতাড়ি পা ফেললাম। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, তার অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি আবার বিস্মৃত হলাম যে, আমরা চাঁদে ছিলাম। চলার জন্য আমি যে পা ফেললাম তার চাপ বা আঘাত পৃথিবী পৃষ্ঠে আমাকে এক গজ নিয়ে যেত, কিন্তু এখানে চাঁদে নিয়ে গেল ছ' গজ —প্রান্তদেশে পাঁচ গজ বেশি। সেই সময়ে একজন কেবল পড়তেই থাকলে যে দুঃস্বপ্নে ভোগে আমার অবস্থাও অনেকটা সেইরকম দাঁড়াল। কারণ পৃথিবীপৃষ্ঠে একজন যখন পড়ার সময় প্রথম সেকেণ্ডে ষোল ফুট পড়বে, চাঁদে পড়বে মাত্র দু' ফুট এবং নিজের ভারের মাত্র একের-ছয় ভাগ ভারে। আমি পড়ে গেলাম কিংবা

লাফিয়ে পড়লাম, মনে হয় প্রায় দশ গজ। মনে হল এইটুকু পড়তে বেশ খানিকটা সময় লাগল। মনে হল প্রায় পাঁচ-ছয় সেকেণ্ড। আমি বাতাসের মধ্য দিয়ে ভেসে চললাম এবং পালকের মত পড়লাম। পড়লাম গিয়ে ধূসর-নীল সাদা দাগ-কাটা তুষার ধৌত হাঁটু-সমান খাদে।

"আমি আমার চারিদিকে তাকালাম। 'ক্যাভর!'—আমি চীৎকার করে উঠলাম কিন্তু কোনো ক্যাভরকে দেখা গেল না।

" 'ক্যাভর!' আমি আরও জোরে চীৎকার করে উঠলাম।…

"তারপর আমি তাকে দেখলাম। দেখলাম সে হাসছে আর আমার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য নানা আকার-ইঙ্গিত করছে। সে ছিল কুড়ি কি তিরিশ গজ দূরে এক তৃণশূন্য পাথরের উপর দাঁড়িয়ে। আমি তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম না। কিন্তু তার অঙ্গভঙ্গি দেখে বুঝলাম সে বলতে চাইছে, 'লাফাও!' আমি ইতস্ততঃ করলাম, দূরত্বটা অনেকখানি মনে হল। তথাপি আমার মনে হল ক্যাভরের চেয়ে আমি বেশি পথ অতিক্রম করতে পারব।

"আমি এক-পা পিছলাম, নিজেকে গুটিয়ে নিলাম এবং প্রাণপণ শক্তিতে লাফ দিলাম। মনে হল, উপরে বাতাসে আমি উঠে গেলাম আর কখনো নেমে আসব না…

এইভাবে উড়ে-যাওয়া আমার মনে হল বন্য দুঃস্বপ্নের মতই ভয়ংকর অথচ আনন্দদায়ক। আমি বুঝতে পারলাম আমার লাফটা সব মিলিয়ে খুবই প্রচণ্ড হয়েছে। আমি সোজাসুজি ক্যাভরের মাথা ছাড়িয়ে গেলাম।"

চাঁদে গুলি ছোড়া

বিশ্ববিশ্রুত সোভিয়েত আবিষ্কারক কে. ই. জিওলকোভস্কির উপন্যাস 'অন দি মুন'-এর নিম্নলিখিত ঘটনাবলী গতির উপর অভিকর্ষজ বলের প্রভাব সম্বন্ধে আমাদের ধারণা জন্মাতে সাহায্য করবে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল—যা সমস্ত বস্তুপুঞ্জের গতি রোধ করে—তার অস্তিত্বের জন্যই আমরা পতনশীল বস্তুর নিয়মের কার্যকারিতা দেখতে পাই না। এই নিয়ম আরও জটিল হয়ে উঠেছে আরও অনেক অতিরিক্ত আনুষঙ্গিক কারণে। চাঁদে অবশ্য কোনো বাতাস নেই, এবং এর ফলে, আমরা যদি চাঁদে পেঁছিতে পারি এবং সেখানে বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা চালাতে পারি তাহলে চাঁদে পতনশীল বস্তু পর্যবেক্ষণের জন্য এক সুন্দর পরীক্ষাগার তৈরি করা যায়।

এবার দু'জন চাঁদে কথাবার্তা বলছে এবং এই মুহূর্তে বন্দুক থেকে উৎক্ষিপ্ত গুলির গতিবিধি কি রকম হবে তাই দেখতে চাইছে—এই ব্যাখ্যাটুকু দিয়ে মঞ্চ জিওলকোভস্কিকে ছেড়ে দেওয়া যাক।

" 'বারুদ কি এখানে তার কাজ করবে ?'

" 'শূন্যে বিস্ফোরকের প্রভাব বাতাসে যা হত তার চেয়ে আরও বেশি হবে, যেহেতু বাতাস তাদের সম্প্রসারণে বাধা দেয়। আর অক্সিজেন ? তা এই বারুদে প্রয়োজনের চেয়ে বেশিই আছে।'

" 'উল্লম্বভাবে রাইফেলটা তাক করা যাক যাতে আমাদের পক্ষে বন্দুকের গুলিটা পরে ভালোভাবে লক্ষ্য করা আরও সহজ হয়।'

" 'আলোর একটু চমক এবং সামান্য পুট্ ধ্বনি (যা শোনা যায় কেবল মাটি এবং মানব দেহের মধ্য দিয়ে গেলে এই রকম এবং বাতাসের মধ্য দিয়ে নয়, কারণ চাঁদে তো বাতাস নেই) এবং মাটিটা একটু কাঁপল।

" 'ছিপিটা কোথায় গেল ? এটার তো ছিটকে যাওয়া উচিত।'

" 'গুলির সঙ্গে ওটাও উপরে উঠে গেছে এবং খুব সম্ভবত এর সঙ্গে লেগে থাকবে। পৃথিবীতে এলে বায়ুমণ্ডল ছিপিটিকে সীসের গুলির পশ্চাদধাবনে বাধা দেবে। কিন্তু চাঁদে পালকও পাথরের মতই উঠবে, পড়বে। মনে কর, তুমি বালিশ থেকে একটা পালক নিলে আর আমি একটা ছোট লোহার গুলি নিলাম। লোহার গুলিটির সামান্য ভার সত্ত্বেও তুমি আমার মতই বেশ দূরের কোনো বস্তুকে পালকটি ছুড়ে আঘাত করতে পারবে। আমি লোহার গুলিটিকে এর সামান্য ভার ধরলে 400 মিটার মত ছুড়তে পারব। আর তুমিও তোমার পালকটিকে ততদূরেই পাঠাতে পারবে। তবে এটা সত্য যে তুমি ওটা ছুড়ে কাউকে মারতে পারবে না। এমন কি ছোড়ার সময় তুমি কিছু অনুভব করতেও পারবে না। অতএব ঐ একই লক্ষ্যে—দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঐ লাল গ্রানাইট খণ্ডের দিকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রোজেক্টাইল ছোড়া যাক—মনে হয় আমরা এই বিষয়ে উভয়েই সমতুল্য।'

"পালকটি লোহার গুলিটাকে একটু ছাড়িয়ে গিয়েছিল, যেন প্রবল ঘূর্ণিবায়ে তাড়িত হয়ে।

"কি ঘটতে পারে ? তিন মিনিট হয়ে গেল আমরা গুলি ছুড়েছি, কিন্তু গুলি তো এখনো ফিরে এলো না।'

" আর দু' মিনিট একটু ধৈর্য ধরো। সম্ভবত তুমি তাহলে দেখবে ওটা ফিরে আসছে।'

"এবং বস্তুতই, দু' মিনিট পরে আমরা অনুভব করলাম মাটি একটু কাঁপল এবং দেখলাম ছিপিটা আমাদের সামনে লাফাচ্ছে।

" 'গুলিটা বেশ কিছুক্ষণ ছুটে গেছে। ওটা কত উপরে গেছে ?'

"প্রায় 70 কিলোমিটার উপরে—এর কারণ চাঁদের অভিকর্ষজ টান খুব কম এবং বাতাসের টান নেই।"

এই বক্তব্যটা একটু খতিয়ে দেখা যাক। আধুনিক বন্দুকের গুলির নিষ্ক্রমণ-বেগ সাধারণ বেগের চেয়ে দেড়গুণ বেশি হলেও, আমরা পরিমিত হিসেবে এই নিষ্ক্রমণ-বেগ সেকেণ্ডে 500 মিটার যদি ধরি, তাহলে বায়ুমণ্ডল না থাকলে গুলি পৃথিবীর উপরে উঠবে ঃ

$$h=\frac{v^2}{2g}=\frac{500^2}{2\times 10}=12{,}500 \text{ মিটার}$$

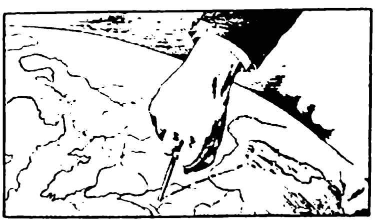
বা 12·5 কিলোমিটার। কিন্তু চাঁদের অভিকর্ষজ টান পৃথিবীর টানের এক ষষ্ঠাংশ হওয়ায়, g-র মান 6 গুণ কম হবে এবং ফলে গুলিটি $12{\cdot}5\times 6=75$ কিলোমিটার পর্যন্ত উঠবে।

অতল কূপ

পৃথিবীর গভীর গহ্বরের অভ্যন্তরে কি ঘটছে সে সম্বন্ধে আমরা এ পর্যন্ত খুব কমই জানি। কেউ কেউ মনে করেন উপরের কঠিন আবরণের বা ভূ-ত্বকের নিচে রয়েছে গলিত বস্তু। উপরের আবরণটি, কল্পনা করা হয়, প্রায় একশত কিলোমিটার পুরু। অন্যদের বিশ্বাস, পৃথিবীর অভ্যন্তরের সমস্ত পথটাই কঠিন। কারা ঠিক, বলা খুব শক্ত। সবচেয়ে গভীরতম যে কূপ খনন করা হয়েছে তা 7·5 কি. মি.-র বেশি নয়, অথচ সবচেয়ে যে গভীর খনি খনন করা হয়েছে এবং যার নিচে মানুষ গেছে তা মাত্র 3·3 কি. মি. গভীর।*

পৃথিবীর ব্যাসার্ধ 6,400 কি. মি.। আমরা যদি একটা গর্ত সরাসরি ওর ব্যাস বরাবর খনন করতে পারি, তাহলে আমরা এটা নিশ্চিত করে বলতে পারি। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের বর্তমান কূপ-খননের যন্ত্রপাতি তা করতে পারে না—

চিত্র 42



পৃথিবীর ব্যাস বরাবর গর্ত খনন।

যদিও এ পর্যন্ত যত কূপ খনন করা হয়েছে তা যোগ করলে দৈর্ঘ্যে তা পৃথিবীর ব্যাসের বেশি হবে।

* দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভালের বক্সবার্গের স্বর্ণখনি। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর মুখগহ্বর 1,600 মিটার উপরে। এর অর্থ হল এই খনি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র 1,700 মিটার গভীর।—সম্পাদক

অষ্টাদশ শতাব্দীতে গণিতবিদ মপারটুইজ এবং দার্শনিক ভল্টেয়ার পৃথিবীর মাঝ-বরাবর সুড়ঙ্গ কাটার স্বপ্ন দেখেছিলেন। পরে ফরাসী জ্যোতির্বিদ ফ্লামারিয়ন আরও পরিমিত আকারে প্রকল্পটি তুলে ধরেন। 42 নং চিত্রে তাঁর এই বিষয়ের প্রবন্ধের মুখবন্ধে দেওয়া চিত্রটি তুলে ধরা যয়েছে।

অবশ্য এই ধরনের কোনো সুড়ঙ্গ এ পর্যন্ত কাটা হয়নি : আমরা কিন্তু কৌতূহল-উদ্দীপক এক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার জন্য, মনে করবো এমনই এক সুড়ঙ্গ কাটা হয়েছে। এমনই এক অতল কূপে পড়ে গেলে কি ঘটবে বলে তোমার মনে হয় (বাতাসের টান সাময়িক-ভাবে অগ্রাহ্য কর)? তুমি তলে গিয়ে আহত হবে না, কারণ কোনো তল নেই। কিন্তু তুমি কোথায় গিয়ে থামবে? এটা নিশ্চয়ই পৃথিবীর কেন্দ্র হবে না, কারণ এখানে পৌঁছানোর সময় তোমার বেগ এত বেশি হবে, সেকেন্ডে প্রায় 8 কিলোমিটার, যে, তুমি কেন্দ্র ছাড়িয়ে যাবে এবং পড়তেই থাকবে। তোমার গতিবেগ অবশ্য ধীরে ধীরে কমে আসবে, যতক্ষণ না তুমি অপর প্রান্তের খোলামুখে এসে পৌঁছাও। তোমার সাধের জীবনের জন্য এখানে এসে তোমাকে প্রান্তটি তাড়াতাড়ি চেপে ধরে ফেলতে হবে, কারণ অন্যথায় তুমি আবার অপরপান্তে উঠে যাবে। তুমি যদি আবারও প্রান্তটি চেপে ধরতে না পার, তুমি নিরবচ্ছিন্নভাবে দুলতেই থাকবে পেণ্ডুলামের মত, অবশ্য বাতাসের টান অগ্রাহ্য করে (তুমি যদি ওটা হিসেবের মধ্যে ধর, দোলন ধীরে ধীরে কমে আসবে এবং সর্বশেষে পৃথিবীর কেন্দ্রে গিয়ে তুমি গুটিয়ে যাবে)।

চিত্র 43



পৃথিবীর কেন্দ্র দিয়ে কাটা সুড়ঙ্গে যদি পড়ে যাওয়ার সুযোগ ঘটতো তবে তুমি পেণ্ডুলামের মত একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে নিরবচ্ছিন্নভাবে দুলতে থাকতে। পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যেতে তোমার 84 মিনিট সময় লাগবে

এখন এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যেতে এবং ফিরে আসতে তোমার কত সময় লাগবে? উত্তর হবে ঃ 84 মিনিট 24 সেকেণ্ড বা মোটামুটি দেড় ঘণ্টা।

"এই রকমই হবে" ফ্লামারিয়ন বলতে লাগলেন, "যদি মেরু থেকে মেরু পর্যন্ত অক্ষ বরাবর আমাদের কূপটা খনন করা হত। ইউরোপ, এশিয়া বা আফ্রিকার অন্য কোনো অক্ষাংশে আমাদের কূপের মুখ স্থানান্তরিত করলে, আমাদের পৃথিবীর ঘূর্ণনকে হিসেবের মধ্যে আনতে হবে। আমরা জানি পৃথিবীর বিষুবরেখার উপর প্রতিটি বিন্দু সেকেন্ডে 465 মিটার এবং প্যারিসের অক্ষাংশের উপর প্রতিটি বিন্দু সেকেন্ডে 300 মিটার ঘোরে। ঘূর্ণনের অক্ষ থেকে আমরা যত দূরে সরে যাই ততই বৃত্তীয়-বেগ বাড়তে থাকায়, যদি কোনো কূপের মধ্যে কোনো ওলনদড়ি নামান হয় তাহলে ঐ ওলন উল্লম্ব থেকে পূর্বদিকে সরে যাবে। আমরা যদি আমাদের অতল কূপটি বিষুবরেখায় খনন করি, হয় আমাদের এটা খুব প্রশস্ত করতে হবে অথবা এটাকে খুব নত করতে হবে, কারণ কোনো বস্তু পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে এর মধ্যে নিক্ষেপ করলে, বস্তুটি পৃথিবীর কেন্দ্রের পূবমুখে ছুটে যাবে।

"আরও পৃথিবীর সমুদ্রপৃষ্ঠের 2 কিলোমিটার উপরে দক্ষিণ আমেরিকার কোনো অধিত্যকায় যদি সুড়ঙ্গের মুখ-গহ্বরটি হয়, তাহলে কেউ সরাসরি এর মধ্যে গেলে সে অপরপ্রান্তে 2 কিলোমিটার উপরে ছুটে যাবে। কিন্তু উভয়প্রান্তের মুখ যদি সমুদ্রপৃষ্ঠের উপর হয়, তুমি লোকটিকে হাত দিয়ে ধরে নিতে পারবে যখন তিনি মুখের কাছে আসবেন, কারণ এখানে তাঁর বেগ কিছুই থাকবে না। আগের ক্ষেত্রে 'পথিক ছুটে যাচ্ছে'—এই বিষয়ে তোমার বরং সাবধান হওয়া উচিত।"

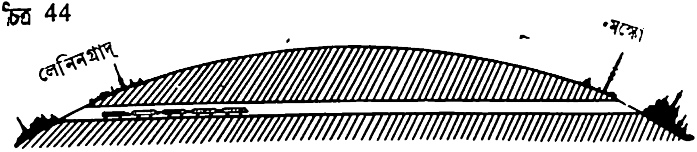
রূপকথার রেলপথ

একটি মটরহীন ভূ-গর্ভস্থ সেন্ট্ পিটারসবার্গ-মস্কো রেলপথ, এই অদ্ভুত শিরোনামের কল্প কাহিনীর এক পুস্তিকা, যার এখনও তিনটি অসমাপ্ত অধ্যায় রয়েছে, একবার সেন্ট্ পিটারসবার্গে (অধুনা লেনিনগ্রাদ) প্রদর্শিত হয়েছিল। পুস্তিকাটির গ্রন্থকার এ. এ. রর্ডনিক একটা অত্যন্ত হাস্যকর প্রকল্প তুলে ধরেন যা, পদার্থবিদ্যার আপাত বিরোধী সত্যের যারা প্রিয় তাঁদের কাছে কম উৎসাহের সৃষ্টি করবে না। তাঁর পরিকল্পনাটি ছিল "600 কিলোমিটার দীর্ঘ এক সুড়ঙ্গের খনন, যা দুটো রাজধানীকে একেবারে সরল ভূ-গর্ভস্থ রেখায় সংযুক্ত করেছে। এটা এখনকার মত বক্ররেখায় না গিয়ে সর্বপ্রথম আমাদের সরলরেখায় ভ্রমণের সুযোগ দেবে।" (তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে, আমাদের সমস্ত পথই বক্র, যেহেতু তারা পৃথিবীপৃষ্ঠের বক্রতল অনুসরণ করে আর তাঁর কল্পিত সুড়ঙ্গ জ্যা-এর পথে সরলরেখা অনুসরণ করবে।)

প্রকল্পটিকে যদি কখনও বাস্তবে পরিণত করা যায়, তাহলে তার একটা অপূর্ব বৈশিষ্ট্য থাকবে। এই সুড়ঙ্গে ট্রেন 'স্বয়ংক্রিয়' হবে। পৃথিবীর মাঝ বরাবর

যে কূপ খননের কথা বলা হয়েছে সেটা আর একবার স্মরণ করা যাক। এই লেনিনগ্রাদ-মস্কো সুড়ঙ্গ অনেকটা সেইরকম হবে। তফাতটা কেবল এই যে, এটা

চিত্র 44



এই লেনিনগ্রাদ-মস্কো সুড়ঙ্গে ট্রেনের কোন ইঞ্জিন লাগবে না। তাদের নিজের ভারই তাদের চলমান রাখবে একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে।

ব্যাস বরাবর না গিয়ে একটা জ্যা-আকৃতির পথ অনুসরণ করবে। এ কথাও সত্য যে, 44 নং চিত্রটির দিকে চাইলে এক নজরে মনে হবে যে, যেহেতু সুড়ঙ্গটা অনুভূমিক, অভিকর্ষ ট্রেনটিকে ঠেলবে—এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। এটা কেবল একটা দৃষ্টির ভ্রম। যেই মাত্র তুমি মনে মনে সুড়ঙ্গের দুই প্রান্তের ব্যাসার্ধ অঙ্কন করবে—ব্যাসার্ধ লম্বটা প্রদর্শন করবে আর তুমি বুঝতে পারবে যে, সুড়ঙ্গটা তাদের সঙ্গে সমকোণে নেই, অথবা অন্যভাবে বলা যায় যে, এটা অনুভূমিক নয়, নত।

এই রকম নততলে অবস্থিত সুড়ঙ্গে প্রতিটি বস্তুই অভিকর্ষের জন্য ইতস্ততঃ পেণ্ডুলামের মত তলদেশ আলিঙ্গন করে দুলতে থাকবে। এর মধ্যে কোনো ট্রেন রেলপথ বরাবর নিজে নিজেই চলবে, এর ভারই তখন ইঞ্জিনের কাজ করবে। প্রথমে ট্রেনটা চলবে খুব আস্তে আস্তে, কিন্তু প্রতি সেকেণ্ড অন্তর অন্তর এর বেগ বাড়তে থাকবে। শীঘ্রই এই বেগ এত বৃদ্ধি পাবে যে, সুড়ঙ্গের গহ্বরের বাতাস বেশ বাধা দেবে। কিন্তু, এতগুলো উৎসাহ-উদ্দীপক প্রকল্প বোঝার পথে বাধা স্বরূপ এই বিরক্তিকর ঘটনা আমরা সাময়িকভাবে ভুলে গিয়ে দেখি, আমাদের ট্রেনের কি ঘটতে পারে। কামানের গোলার বেগের চেয়েও বহু গুণ বেশি এর বেগ হবে এবং সেটা যখন সুড়ঙ্গের মাঝ বরাবর যাবে, এটা তখন একে অতিক্রম করে যাবে, এবং প্রায় অপর প্রান্তে পেঁছে যাবে। ঘর্ষণের জন্যই আমি 'প্রায়' কথাটি প্রয়োগ করলাম। ঘর্ষণ না থাকলে আমাদের ট্রেনটি ইঞ্জিন ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে লেনিনগ্রাদ থেকে মস্কো পর্যন্ত সমস্ত পথ যেত। হিসেব করে দেখা গেছে যে, মেরু থেকে মেরুতে পতনের জন্য কোনো লোকের যে সময় লাগে অর্থাৎ 42 মিনিট 12 সেকেণ্ড, ট্রেনটিরও একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যেতে ঠিক

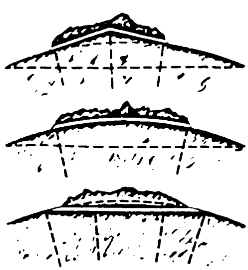
ঐ সময়ই লাগবে। কারণ এই সময়, বিস্ময়ের কথাই, সুড়ঙ্গের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে না। মস্কো থেকে লেনিনগ্রাদ, কি মস্কো থেকে ভ্লাডিভোস্টক, কি মস্কো থেকে মেলবোর্ন পর্যন্ত অনুরূপ সুড়ঙ্গে পাড়ি দিতে আমাদের ঐ 42 মিনিট 12 সেকেণ্ডই লাগবে। অতল কূপের সম্বন্ধে আর একটি মজার ব্যাপার এই যে, দোলনের কাল গ্রহের আকারের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করবে কেবলমাত্র ওর ঘনত্বের উপর।

সুড়ঙ্গের মধ্যে অন্য যে কোনো যানবাহনও—সে মটর হোক, গরুর গাড়ি হোক বা অন্য যে কোনো যানবাহনই হোক—একই রকম ব্যবহার করবে। বস্তুতই যেন রূপকথার কোনো রাস্তা। নিজে স্থির হয়েও, এই পথ চাকার উপর যে কোন যানবাহনকেই এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছুটিয়ে নেবে এবং অধিকন্তু, ঐ দৌড় করিয়ে নেবে কল্পনাতীত বেগে!

সুড়ঙ্গ কিভাবে খনন করতে হবে

45 নং চিত্র সুড়ঙ্গ খননের তিনটি উপায় দেখাচ্ছে। এখন বলো তো এই তিনটি মধ্যে কোনটি অনুভূমিক? এটা উপরেরটাও না, নিচেরটাও না। এটা মধ্যেরটা, যা বৃত্তাংশ রচনা করেছে। যে কোনো বিন্দুতে এর মধ্যের সুড়ঙ্গটি উল্লম্বের সঙ্গে সমকোণে থাকবে বা, পৃথিবীর ব্যাসার্ধের সঙ্গে সমকোণে থাকবে। এটা অনুভূমিক, তার কারণ এর বক্ররেখা পৃথিবীপৃষ্ঠের বক্ররেখার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যায়।

চিত্র 45



পর্বতের মধ্য দিয়ে সুড়ঙ্গ খননের তিন রকম পদ্ধতি

45 নং চিত্রে সবচেয়ে উপরে যেমন দেখান হয়েছে—দীর্ঘ সুড়ঙ্গ সাধারণত সরলরেখা বরাবর কাটা হয় যা দুই প্রান্ত থেকে পৃথিবীপৃষ্ঠে স্পর্শক হয়ে ঝুলে থাকে। এই রকম সুড়ঙ্গ প্রথমে উপরে ওঠে এবং তারপর নিচে নত হয়ে যায়। এটা খুব সুবিধাজনক কারণ, এই রকম সুড়ঙ্গে জল না জমে প্রান্তের দিকে

অভিকর্ষের জন্য গড়িয়ে যায়। নিয়মমাফিক অনুভূমিকভাবে খোঁড়া সুড়ঙ্গের বৃত্তচাপের মত আকার হবে। জল এর থেকে বেরিয়ে আসবে না, যেহেতু প্রতি বিন্দুতে এটা সাম্যাবস্থায় থাকবে। যখন এই রকম সুড়ঙ্গ 15 কিলোমিটারের বেশি দীর্ঘ হয়—যেমন 20 কিলোমিটারের দীর্ঘ সিমপ্লন সুড়ঙ্গ—তা হলে এর একপ্রান্তে দণ্ডায়মান কোনো ব্যক্তি অপর প্রান্তে দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে দেখতে পাবেন না। এর মধ্যবিন্দু এর প্রান্তদুটির চেয়ে 4 মিটার উচ্চতর হওয়ায়, তিনি সুড়ঙ্গের ছাদ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবেন না।

পরিশেষে, যদি আমরা দুই প্রান্তের মধ্যে সরলরেখার মত সুড়ঙ্গ কাটি, এটা ধীরে ধীরে মধ্যের দিকে নেমে যাবে। এই রকম সুড়ঙ্গে জল বেরিয়ে না গিয়ে বরং সবচেয়ে নিম্নতম ভাগে অর্থাৎ মধ্যে জমা হবে। অপর পক্ষে, কোনো ব্যক্তি একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকলে তার অপর প্রান্তের বন্ধুকে দেখতে পাবেন। এটা চিত্র থেকেই বার করে নেওয়া যায়। (ঘটনাক্রমে, অনুভূমিক সব রেখাই যখন বেঁকে যাবে এবং কোনো ক্রমেই সরল হবে না, তখন বিপরীত পক্ষে উল্লম্ব রেখাগুলিই কেবলমাত্র সরলরেখা হবে।

পরিচ্ছেদ ৫

প্রজেক্টাইল-এ ভ্রমণ

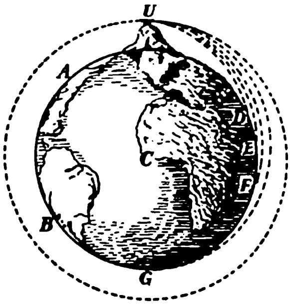
গতির নিয়মাবলী ও মাধ্যাকর্ষণের আকর্ষণ সম্বন্ধীয় আলোচনা শেষ করার আগে জ্বল ভার্নের মনমুগ্ধকর চাঁদে ভ্রমণের কাল্পনিক কাহিনী 'ফ্রম আর্থ দি মুন' এবং 'অ্যারাউন্ড দি মুন' নিয়ে আলোচনা করা যাক। গ্রন্থ দুটি যদি তোমরা পড়ে থাক তবে তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে, গৃহযুদ্ধের অবসানের পর বাল্টিমোর ক্যানোন ক্লাবের সদস্যারা স্থির করল, জোর করে অলস হয়ে যাওয়ার দরুন, মস্ত এক কামান নির্মাণ করবে এবং চাঁদে কামান দেগে মস্ত ফাঁপা গোলায় যাত্রী নিয়ে পাড়ি জমাবে। এটা কি কখনো করা সম্ভব? প্রথমত, আমরা বস্তুপুঞ্জের উপর কি কখনো এমন বেগ সঞ্চার করতে পারি যা এত বড় যে, তাদের পৃথিবী ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে, এবং আর কখনো পৃথিবী পৃষ্ঠে ফিরিয়ে আনবে না?

নিউটনের পাহাড়

প্রতিভাবান নিউটন যিনি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির চিরন্তন নিয়মের আবিষ্কারক, তিনি তাঁর 'প্রিন্সিপিয়া' (Principia)-য় লিখলেন অভিকর্ষের জন্য বাতাসে কোনো পাথর নিক্ষেপ করলে তা সরল পথ থেকে সরে যায় এবং বক্ররৈখিক পথে পৃথিবীপৃষ্ঠে ফিরে আসে। কিন্তু আমরা যদি পাথরটিতে বৃহত্তর বেগ সঞ্চার করি, এটা আরও দূরে ছিটকে যায় এবং এমনও ঘটতে পারে যে, এটা দশ, একশ', এমন কি এক হাজার মাইল বৃত্তচাপ (arc)-এর পথে গমন করবে বা চাপ রচনা করবে এবং সব শেষে পৃথিবীর শৃঙ্খল চূর্ণ করে বেরিয়ে যাবে, আর কখনো ফিরে আসবে না। ধরা যাক, 46 নং চিত্রে *AFB* পৃথিবীপৃষ্ঠ, *C* পৃথিবীর কেন্দ্র, আর *UD*, *UE*, *UF* এবং *UG* বক্ররৈখিক পথ, যা কোনো বস্তু, ক্রমবর্ধমান বেগে কোনো সু-উন্নত পর্বত থেকে আনুভূমিকভাবে নিক্ষেপ করলে রচনা করবে। (আমরা এ ক্ষেত্রে বাতাসের রোধ অগ্রাহ্য করব।) অপেক্ষাকৃত কম প্রাথমিক বেগ যখন তখন বস্তুটি বক্রপথ *UD*, অপেক্ষাকৃত বেশি বেগ যখন বস্তুটি বক্রপথ *UE*, আরও অপেক্ষাকৃত বেশি বেগ যখন তখন বস্তুটি *UF* ও *UG* বক্রপথ সমূহ রচনা করবে। প্রাথমিক বেগ যদি যথেষ্ট হয়, আমাদের বস্তুটি তখন

পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবে এবং পর্বত শীর্ষে ওর যাত্রার পূর্বস্থানে পুনরায় যি
আসবে এবং যেহেতু এর বেগ প্রাথমিক বেগের সমান হবে, এটা ঐ কক্ষপথে
আবর্তন করে চলবে।

চিত্র 46



আমাদের এই পাহাড়ের উপর স্থাপিত যদি একটা বন্দুক থাকত, তাহ
এ যে গুলি ছুঁড়ত—তার প্রাথমিক বেগ খুব বেশি হলে—সেই গুলি অ
পৃথিবীপৃষ্ঠে ফিরে আসত না—ক্রমাগত পৃথিবীর চারিদিকে প্রদক্ষিণ করত
গণনা করে সহজেই বার করা যায় যে, ("পদার্থবিদ্যার মজার কথা"—১ম খ
২য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য) এইরকম ঘটবে যখন গুলির প্রাথমিক বেগ হবে সেকেণ্ডে প্র
8 কি.মি.। কোনো প্রাস (Projectile) এই বেগে উৎক্ষিপ্ত করলে ে
কৃত্রিম উপগ্রহটি বিষুবরেখার উপরিস্থিত কোনো বিন্দুর চেয়ে 17 গুণ দ্রুতবে
ঘুরবে এবং ওর আবর্তন কাল হবে 1 ঘণ্টা 24 মিনিট। যখন এই উৎক্ষে
বেগ আরও বেশি হবে, তখন ঐ ক্ষেপণ অস্ত্র আর বৃত্তাকার পথে পৃথি
প্রদক্ষিণ করবে না ; ওটা পৃথিবী থেকে অনেক দূরে ছিটকে গিয়ে মোটাম
একটা দীর্ঘায়ত উপবৃত্তাকার পথ (Elliptical orbit) অনুসরণ করবে
প্রাথমিক বেগ আরও বেশি হলে, সেকেণ্ডে প্রায় 11 কি.মি. যদি হয়, তাহ
ক্ষেপণাস্ত্রটি চিরকালের জন্য শূন্যে পালিয়ে যাবে।• (স্মরণ রাখা দরক
যে, আমরা শূন্যে প্রাসের (Projectile) গতি আলোচনা করছি, বাতাসে নয়

এখন দেখা যাক জুল ভার্নের কল্পনানুসারে আমরা চাঁদে পাড়ি দিতে পা
কি না। আধুনিক বন্দুক প্রাথমিক উৎক্ষেপণ বেগ দিতে পারে সেকেণ্ডে 2 কি.
এর বেশি নয়। এই বেগ চাঁদে উড়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক বেগে
এক-পঞ্চমাংশ মাত্র। বাল্টিমোরের গোলন্দাজরা অবশ্য চিন্তা করেছিলেন ে
যদি তারা একটা দৈত্যাকার কামান ঢালাই করে নিতে পারেন এবং খুব প্রচণ্ডভা

ওটা থেকে গোলা ছুঁড়তে পারেন তাহলে তাঁদের কল্পিত প্রোজেক্টাইলটিতে চাঁদে পাঠানোর উপযোগী প্রয়োজনীয় উচ্চবেগ সঞ্চার করতে পারবেন।

অদ্ভুত বন্দুক

সুতরাং বাল্টিমোর ক্যানন ক্লাবের সদস্যরা এক কিলোমিটারের চারভাগের এক ভাগের মত লম্বা মস্ত এক কামান তৈরি করে ফেললেন। কামানটিকে তাঁরা শায়িত করলেন মাটিতে উপরের দিকে মুখ করে। তারপর যাত্রীবাহী এক কেবিন সমেত বিরাট 8 টনের এক প্রোজেক্টাইল তৈরি করে ফেললেন। কামানটাকে দাগার জন্য ব্যবহৃত হল 160 টন নাইট্রো-কটন (Nitro-cotton)। বন্দুকটা যখন ছোঁড়া হল, জুল ভার্নের কল্পনানুসারে, তখন প্রোজেক্টাইলটি সেকেণ্ডে 16 কি.মি. সমান প্রাথমিক বেগ লাভ করল—যা পরে বাতাসের ধাক্কায় হ্রাস পেয়ে সেকেণ্ডে 11 কি.মি. দাঁড়াল। কিন্তু এই বেগও পৃথিবীর বাতাসের প্রতিরোধ ভেঙে চাঁদে পাড়ি দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। জুল ভার্নে এইরকমই চিন্তা করেছিলেন।

এখন দেখা যাক পদার্থবিদ্যানুসারে তিনি গ্রহণযোগ্য কি না।

জুল ভার্নের প্রকল্পটি ভেদ্য কিন্তু পাঠকবর্গ সাধারণত যে কারণে ভাবেন, সেই কারণে নয়। প্রথমত, আমরা প্রমাণ করে দেখাতে পারি যে, কামানের বারুদ কখনই পদাতিক প্রোজেক্টাইলে সেকেণ্ডে 3 কি.মি.-এর বেশি বেগ সঞ্চার করতে পারবে না।

আরও বলা যায়, জুল ভার্নে বাতাসের ধাক্কা অগ্রাহ্য করেছেন। প্রচণ্ড বেগের কথা চিন্তা করলে এই টানও হবে প্রচণ্ড। সে যাই হোক, এটা গমন পথকে সম্পূর্ণ বদলে দেবে। এই সমস্ত ছাড়াও অবশ্য কামানের গোলায় চাঁদে পাড়ি দেবার বিষয়ে অন্যান্য বিরুদ্ধ যুক্তি তোলা যায়। এইগুলো হল যা যাত্রীদের জন্য সঞ্চিত থাকবে এবং সব চেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

প্রকৃত যাত্রাটা যে বিপজ্জনক—এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। কামান-দাগার সময় পর্যন্ত যদি তারা টিকে থাকে, তা হলে তাদের আর দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। প্রোজেক্টাইলে চেপে তারা যে প্রচণ্ড বেগে শূন্যে ঘুরবে তা মর্ত-বাসী আমাদের কাছে যেমন, তেমনই কোনো ক্ষতিকর হবে না, কারণ আমাদের গ্রহ এই পৃথিবী তার চেয়ে অনেক বেশি বেগে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে।

ভারী টুপি

সবচেয়ে বড় বিপদের মুহূর্তটি হল এক সেকেণ্ডের একশ ভাগের কয়েক ভাগ মাত্র যখন প্রোজেক্টাইলটি কামানের গর্তে ত্বরণে অগ্রসর হচ্ছে, কারণ এই নগণ্য কালক্ষেপে গতিবেগ 0 থেকে সেকেণ্ডে 16 কি.মি. বৃদ্ধি পাবে বলে মনে হয়।

জ্যুল ভার্নের কামানদাগীরা যে এই মুহূর্তে ভীষণ সন্ত্রাসের বলি হবে, এতে বিস্ময়ের কি আছে ! বারবিকেন যথার্থই বলেছেন যে, উপগ্রহের একেবারে মুখে থাকলে যেমন হত, উপগ্রহের মধ্যে থাকলেও উৎক্ষেপণের একেবারে প্রথম মুহূর্তটি ঠিক তেমনই যাত্রীদের পক্ষে সমান বিপজ্জনক। বস্তুতই, কামান যখন দাগা হবে, প্রোজেক্টাইলটি তার যাত্রাপথের কোনো বস্তুকে যে বলে আঘাত করবে, কেবিনের ভূমিও যাত্রীদের ঠিক সেই বেগে নিচে থেকে আঘাত করবে। জ্যুল ভার্নের কামানদাগীরা এই বিপদকে অনেক হালকা করে দেখেছেন এই ভেবে যে, সবচেয়ে খারাপ যা ঘটবে তা হল মাথায় প্রবল রক্তপ্রবাহ নিয়ে যাত্রীরা হয়ত বেরিয়ে আসবে।······

প্রকৃতপক্ষে এর চেয়েও সাংঘাতিক কিছু ঘটবে। বারুদ দগ্ধ হবার ফলে যে গ্যাস উত্থিত হবে তার ক্রমাগত চাপে কামানের খোলে প্রোজেক্টাইলের বেগ ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাবে। সেকেন্ডের এক ন্যূনতম ভগ্নাংশে এই বেগ খুব বেড়ে যাবে, গিয়ে দাঁড়াবে, আগেই যা বলেছি, 0 থেকে সেকেন্ডে 16 কি.মি.। সহজ করে বলার খাতিরে, মনে করা যাক, ত্বরণ একই থাকবে। সেই ক্ষেত্রে প্রোজেক্টাইলের বেগ অত অল্প সময়ে সেকেন্ডে ১৬ কি.মি. বৃদ্ধি করার জন্য যে ত্বরণের প্রয়োজন হবে তা হবে প্রায় সেকেন্ডে ৬০০ কি.মি. / প্রতি সেকেন্ড (পরে এটা গণনা করে দেখা যাবে।)।

অঙ্কটা মারাত্মক, কারণ পৃথিবী পৃষ্ঠের অভিকর্ষের সাধারণ ত্বরণ মাত্র 10মি. সেকেন্ড^2। (আরও জানাই, ছুটন্ত গাড়ির ত্বরণ 2-3 মি. সেকেন্ড^2-এর বেশি নয়, আর নির্বিঘ্নে ধাবমান ট্রেনের ত্বরণ মাত্র 1 মি. সেকেন্ড^2) অতএব দেখা যাচ্ছে যে, কামান দাগার সময় কেবিনের ভিতরের প্রতিটি বস্তু এর প্রকৃত ভারের 60,000 গুণ চাপ দেবে। এর অর্থ হল যাত্রীরা কয়েক ডজন হাজার গুণ ভারী হয়ে উঠবে, যা তাদের তৎক্ষণাৎ কাগজের মন্ডে পরিণত করে দেবে। মিঃ বারবিকেনের মাথার টুপিটির ওজনই হবে কম পক্ষে 15 টন যখন কামান দাগা হবে—অর্থাৎ এর ধারককে পিষে ফেলার পক্ষে প্রয়োজনের চেয়েও বেশি।

সত্য কথা, জ্যুল ভার্নে এই প্রচন্ড চাপ কমানোর জন্য কয়েকটি ব্যবস্থার কথা বলেছেন। প্রোজেক্টাইলটির সঙ্গে সংলগ্ন ছিল স্প্রীং এবং দুটি জলপূর্ণ ভূমি। এটা চাপের সময় বাড়িয়ে দেবে এবং ফলে যে দ্রুততার সঙ্গে বেগ বাড়বে তা কমে যাবে। কিন্তু আমরা যে প্রচন্ড বলের সম্মুখীন হব এ ক্ষেত্রে তার তুলনায় এই ব্যবস্থা থেকে যে সুবিধা পাওয়া যাবে তা হবে অকিঞ্চিৎকর। যে বল যাত্রীদের ভূমিতে চেপে ধরবে তার এক ভগ্নাংশ মাত্র কমবে। আমার মনে হয় না টুপির ভার 14 টন না 15 টন হল তাতে কিছু যাবে আসবে। যাই হোক না কেন, এই প্রচন্ড বল তোমাকে একেবারে পিষে ফেলবে।

বলের প্রচণ্ড চাপ কিভাবে কমানো যাবে

বলবিদ্যা আমাদের শেখায় কিভাবে বেগের বৃদ্ধি কমানো যায়। কামানটিকে বহু গুণ দীর্ঘ করে আমরা কামান দাগার সময় প্রোজেক্টাইলের অভ্যন্তরের 'কৃত্রিম অভিকর্ষ'-কে পৃথিবীর অভিকর্ষের সমান করে তুলতে পারি। মোটামুটিভাবে সরাসরি হিসাবে আমাদের কামানটিকে অন্তত 6,000 কি.মি লম্বা করতে হবে। এর অর্থ দাঁড়ায়, জুল ভার্নের 'কলাম্বিয়াড' পৃথিবীর কেন্দ্রে পৌঁছাবে। কেবল মাত্র তা হলেই যাত্রীরা কোনো রকম অস্বস্তিকর অনুভূতির মধ্যে পড়বে না। কেবলমাত্র বেগের সামান্য বৃদ্ধি তাদের স্ব স্ব ভারের সমান আপাত ভার বৃদ্ধি করায়, তারা নিজেদের দ্বি-গুণ ভারী মনে করবে।

প্রসঙ্গক্রমে খুব কম সময়ের ব্যবধানে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোনো রকম ক্ষতি বহন না করেই কয়েক গুণ বেশি ভার সহ্য করতে পারে। আমরা যখন আচমকা আমাদের যাত্রাপথ পরিবর্তন করি, বাইরে বেরিয়ে যাই, আমাদের ভার এই স্বল্প সময়ে বেশ বেড়ে যায়; আমাদের দেহ খুব জোরে পৃষ্ট-ভূমির উপর চাপ দেয়। আমরা নিরাপদে তিন গুণ ভার সহ্য করতে পারি। ধরে নেওয়া যাক যে, আমরা অতি অল্প সময়ের জন্য দশ গুণ ভারই সহ্য করতে পারব, তাহলে 'কেবলমাত্র' 600 কি.মি. দীর্ঘ কামান প্রস্তুত করলেই হবে,—কিন্তু তাতেও লাভ হবে না, কারণ কলাকৌশলের দিক থেকে এমন কামান নির্মাণও অসম্ভব।

এই সব শর্ত মেনে নিতে পারলেই তবে আমরা জুল ভার্নের প্রকল্পটি বোঝার চিন্তা করতে পারব। (ফরাসী কল্প-বিজ্ঞানের ঔপন্যাসিক প্রোজেক্টাইলটি ছুঁড়ে দেবার পর এবং যখন ওটা চাঁদের দিকে ছুটছে তখন, এর অভ্যন্তরে জীবনের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে একটা মারাত্মক বিষয় বাদ দিয়ে গেছেন। আমরা সেটা নিয়ে 'পদার্থবিদ্যার মজার কথা' গ্রন্থের ১ম খণ্ডে আলোচনা করেছি। অভিকর্ষজ বল প্রোজেক্টাইল ও তার ভেতরের সমস্ত বস্তুকে একই ত্বরণ জোগাবে বলে প্রোজেক্টাইল ও তার ভেতরের বস্তুসমূহের কোনো ভারই থাকবে না। এই ভার হীন অবস্থার কথা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। "জুল ভার্নে যে অধ্যায়টি লেখেন নি"—এই প্রসঙ্গে সেটাও দেখতে পার।)

গণিত-প্রিয়দের জন্য

তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ খুব সম্ভবত উল্লিখিত অংকগুলো মিলিয়ে দেখতে চাইবে। এখানে হিসেবগুলো তুলে ধরা হল কিন্তু এগুলো কেবল আসন্ন মান, যা এই অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত যে, কামানের গহ্বরে প্রোজেক্টাইলটি সমত্বরণে গমন করেছিল (প্রকৃত পক্ষে ত্বরণ সবসময় এক নয়)।

সমত্বরণে গতির জন্য আমাদের নিম্নলিখিত দুটি সমীকরণের প্রয়োজন হবে ঃ

t-তম সেকেণ্ডে বেগ v হল at-র সমান, যেখানে a হল ত্বরণ।

অন্য কথায় $v = at$;

t সেকেণ্ডে যাওয়া পথের দূরত্ব S নিম্নলিখিত সমীকরণ দ্বারা সিদ্ধ হয় ঃ

$$S = \frac{at^2}{2}$$

এখন আমরা 'কলাম্বিয়াড' গহ্বরে প্রোজেক্টাইলের ত্বরণ নির্ণয় করব। উপন্যাসটি থেকে আমরা জানি এর দৈর্ঘ্য—210 মিটার। এটাই হল S বা প্রোজেক্টাইল যে পথ যায়। আমরা এও জানি যে, চরম বেগ ঃ $v = 16{,}000$ মিটার/সেকেণ্ড। এবার আমরা t, অর্থাৎ সমত্বরণে গতি ধরে নিয়ে, যে সময়ে প্রোজেক্টাইলটি কামানের গহ্বরে গিয়েছিল, নির্ণয় করতে পারি। সুতরাং, $v = at = 16{,}000$,

$$210 = S = \frac{at.t}{2} = \frac{16{,}000t}{2} = 8{,}000t,$$

যেখান থেকে পাই, $t = \dfrac{210}{8{,}000} \approx \dfrac{1}{40}$ সেকেণ্ড।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে এক সেকেণ্ডের $\frac{1}{40}$ ভাগ মাত্র সময় লেগেছিল প্রোজেক্টাইলটির কামানের সুড়ঙ্গ পথ অতিক্রম করতে।

$v = at$ সমীকরণে $t = \dfrac{1}{40}$ বসিয়ে পাই ঃ

$16{,}000 = \dfrac{1}{40}a$, যা থেকে পাই $a = 640{,}000$ মি./সেকেণ্ড^2।

অথবা, অভিকর্ষজ ত্বরণের 64,000 গুণ। প্রোজেক্টাইলের ত্বরণ অভিকর্ষজ ত্বরণের 10 গুণ বেশি হতে হলে, অর্থাৎ 100 মি./সেকেণ্ড^2 হতে হলে কামানটি কত দীর্ঘ হওয়া দরকার ?

এই অঙ্কটা এবার উল্টোভাবে সমাধান করতে হবে। আমরা জানি $a = 100$ মি./সেকেণ্ড^2 এবং $v = 11{,}000$ মি./সেকেণ্ড (বাতাসের টান ছাড়া এই বেগ যথেষ্ট)।

$v = at$ সমীকরণ থেকে পাই $11{,}000 = 100t$, এবং যেখান থেকে সমাধান করলে $t = 110$ সেকেণ্ড।

$S = \dfrac{at^2}{2} = \dfrac{at.t}{2}$ সমীকরণ থেকে পাওয়া যাবে কামানটি $\dfrac{11{,}000 \times 110}{2}$ $= 605{,}000$ মি. বা 605 কি.মি. দীর্ঘ হবে।

এইভাবে আমরা এমন সব অঙ্কের হিসাবে এসে পেঁছাব যা জুল ভার্নের কামানদাগীদের উদ্ভট প্রকল্পটিকে ধূলিসাৎ করে দেবে। *

এই অধ্যায়ের সবকিছুই প্রশ্নাতীতভাবে সত্য। মহাশূন্যে অভিযানের বাস্তব দিক সম্বন্ধে তোমরা সম্ভবত অন্যত্র পড়ে থাকবে।—সম্পাদক

পরিচ্ছেদ ৬

তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের ধর্ম

যে সাগরে কেউ কখনো ডোবে না

সুপ্রাচীন ইতিহাসবাহী এক দেশে এমনই এক সাগর আছে। সাগরটি হল বিখ্যাত 'ডেড সী' বা মৃত সাগর আর দেশটি হল প্যালেস্টাইন। এর জল এতই লবণাক্ত যে, কোনো কিছুই এর জলে বাস করতে পারে না। স্থানীয় প্রখর বৃষ্টিহীন জলবায়ুর জন্য এর উপরিভাগের জল বাষ্পীভূত হয়ে যায়। লক্ষ্য করার বিষয়, একমাত্র জলই বাষ্পীভূত হয় কিন্তু এই জলে দ্রবীভূত লবণ থেকে যায় যা জলকে আরও লবণাক্ত করে তোলে। এই কারণেই অধিকাংশ সাগর-মহাসাগরের জলের মত ওজন হিসেবে এর জলে লবণের পরিমাণ শতকরা দু' ভাগ বা তিন ভাগ না হয়ে, লবণের পরিমাণ শতকরা সাতাশ ভাগের মত। অধিকন্তু, গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে এই লবণের পরিমাণ আরও বেড়ে যায়।

এইভাবে 'ডেড সী' বা মৃত সাগরের প্রায় চার ভাগের একভাগ জল দ্রবীভূত লবণ দিয়ে তৈরী। এই সাগরের লবণের পরিমাণ হিসেব করে দেখা গেছে প্রায় চার কোটি টন।

বিশেষ করে লবণাক্ত হওয়ার জন্য মৃত সাগরের জলের এক অদ্ভুত ধর্ম আছে। সাধারণ সাগরের জলের তুলনায় এই লবণাক্ত জল অধিকতর ভারী হওয়ায় এতে তোমার শরীর ডুববে না, কারণ তোমার শরীর এর তুলনায় অনেক হাল্কা।

সমপরিমাণ অত্যন্ত লবণাক্ত জলের ওজনের তুলনায় আমাদের দেহের ওজন বেশ কম। অতএব জলের প্লবতার (buoyancy) সূত্রানুসারে আমরা কখনই মৃত সাগরে ডুববো না। লবণ জলে ডিম যেমন ভাসে আমরাও তেমনি এর উপরি-ভাগে ভাসবো। বিশুদ্ধ সাধারণ জলে ডিম কিন্তু ডুবে যায়।

বিখ্যাত আমেরিকার কৌতুকপ্রিয় লেখক মার্ক টোয়েন এই মৃত সাগর সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং তাঁর এক গ্রন্থে খুব হাস্যরসাত্মকছলে তিনি ও তাঁর সাথীদের এই সাগরে স্নানের অদ্ভুত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন।

"এ এক অদ্ভুত স্নান। আমরা ডুবতে পারলাম না। পিঠ পেতে কেউ এখানে সরাসরি চিৎ হয়ে বুকের উপর হাত রেখে শুয়ে থাকতে পারে। চোয়ালের প্রান্ত

থেকে দেহের মাঝ-বরাবর পায়ের মধ্যপর্যন্ত এবং গোড়ালির হাড় পর্যন্ত এক রেখার উপর তার দেহের সমস্তটাই জলের উপরে থাকবে। ইচ্ছে করলে ঐ অবস্থায় মাথাও পুরোপুরি উপরে তোলা যায়…মাথা তুলে, হাঁটু মুড়ে আরাম করে শোয়া যায়, হাঁটু চিবুকে ঠেকিয়ে হাত দুটো দিয়ে ধরে বসাও যায়, কিন্তু এই অবস্থায় উপর-অংশ বেশি ভারি হয়ে যাওয়ায় তুমি নিশ্চিতই উল্টে যাবে। জলের উপর তুমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে অবশ্য মাথার উপর ভর করে এবং তোমার বুকের মাঝ বরাবর উপরের অংশ ভিজবে না। কিন্তু তুমি ওভাবে থাকতে পারবে না। জল শীঘ্রই তোমার পায়ের পাতা উপরে ভাসিয়ে দেবে। তুমি পিঠের উপর সাঁতার কাটতে পারবে না, কারণ জলের উপরেই তোমার পায়ের পাতা থাকবে এবং গোড়ালি ছাড়া কোনোক্রমে তোমাকে এগিয়ে দেওয়ার কিছুই থাকবে না। যদি মুখ নিচে রেখে সাঁতার কাটো, তাহলে চাকা সম্বলিত নৌকার মত তোমাকে জলে পা ছুড়তে হবে। তোমার কোনো অগ্রসরই হবে না। ঘোড়া আবার অত্যন্ত মাথা ভারি হওয়ায় মৃত সাগরে সাঁতার কাটতেও পারবে না, উঠে দাঁড়াতেও পারবে না। ও তৎক্ষণাৎ পার্শ্বে উল্টে যাবে।

47 নং চিত্র আরামে মৃত সাগরে সময় কাটানোর এক সুন্দর চিত্র উপস্থিত করেছে। এর জলের আপেক্ষিক গুরুত্বের জন্য চিত্রে প্রদর্শিত মানুষটি সূর্য-

চিত্র 47



মৃত সাগরে সাঁতার (ফটোগ্রাফ থেকে)

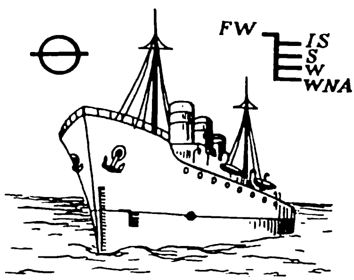
কিরণের প্রাখর্য অগ্রাহ্য করে ছাতার ছায়ায় বই পড়তে পারে। ক্যাসপিয়ান সাগরের কারা বোগাজ গল খাঁড়ির ও এলটন হ্রদের জলের লবণের পরিমাণ

শতকরা 27 ভাগ হওয়ায়—এরাও একই ধরনের অস্বাভাবিক ধর্ম প্রদর্শন করে। (ঘটনাক্রমে, কারা বোগাজ গলের জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব 1·18। "এই রকম ঘন জলে বিনা পরিশ্রমে কেউ সাঁতার কাটতে পারে এবং কখনো সে ডুববে না, আর্কিমিডিসের সূত্র ভাঙার জন্য যতই কঠোর চেষ্টা করুক না কেন,"—এ প্রসঙ্গে আবিষ্কারক পেলস্ লক্ষ্য করেন।)

রোগী যাঁরা লবণাক্ত জলে স্নান করেন তাঁদের সদ্যবর্ণিত অনুরূপ অভিজ্ঞতা হয়। জল যখন খুবই লবণাক্ত—দৃষ্টান্তস্বরূপ স্টারায়া রুশা স্পা-র (Staraya Russa spa) জল—তখন এ রকম রোগীকে খুব কষ্ট করে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে হয়। শুনেছি এক মহিলা রোগী বিরক্তির সঙ্গে অনুযোগ করেন যে, স্টারায়া রুশার জল তাকে উপরে ঠেলে দিচ্ছে এবং বোধ হয় মনে করলেন কর্তৃপক্ষই এর জন্য দায়ী।

বিভিন্ন সাগরের জলের লবণের পরিমাপ বিভিন্ন হওয়ায় জাহাজ এক ভাবে সব সাগরে চলতে পারে না। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ জাহাজের নিম্নাংশে জল-রেখার কাছে তথাকথিত 'লয়েড মার্ক' (Lloyd mark) লক্ষ্য করে থাকবে, যা ঐ জাহাজের বিভিন্ন আপেক্ষিক গুরুত্বের জলে নিমগ্ন হওয়ার সীমা নির্দেশ করে। উদাহরণ স্বরূপ, 48 নং চিত্রে এই জলে নিমগ্নের সীমা দেখান হয়েছে, যা জল রেখার উপর ঃ

চিত্র 48



জাহাজের জলরেখার উপর জাহাজ বোঝাই মালের দাগ। ডান দিকের উপরে ঃ সেই দাগগুলো বড় ক'রে দেখানো হয়েছে। অক্ষরগুলো পুস্তকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

বিশুদ্ধ জলে FW, IS গ্রীষ্মে ভারত মহাসাগরে, S গ্রীষ্মে লবণাক্ত জলে, W শীতে লবণাক্ত জলে, WNA শীতে উত্তর অতলান্তিক সাগরে। রাশিয়া 1909 খ্রীষ্টাব্দে এই চিহ্নগুলি বাধ্যতামূলকভাবে চালু করে।

উপসংহারে বলে রাখা ভালো, এক ধরনের জল আছে যা অন্য কোনো প্রকার মিশ্রণ ছাড়াই সাধারণ জল অপেক্ষা ভারী। এর আপেক্ষিক ঘনত্ব 1·1 বা সাধারণ জলের তুলনায় 10% বেশি। এই জলে পূর্ণ কোনো স্নানের পুষ্করিণীতে

অনভিজ্ঞ স্নানার্থীও ডুববে না। 'ভারী জল' বলে কথিত এর রাসায়নিক সংকেত D_2O (এর হাইড্রোজেনের উপাদান সাধারণ হাইড্রোজেনের চেয়ে দ্বিগুণ ভারী হাইড্রোজেন পরমাণু দিয়ে গঠিত এবং তা D অক্ষর দিয়ে সূচিত করা হয়।) অবশ্য সাধারণ জলে এই ভারী জলের পরিমাণ অত্যন্ত কম—প্রতি এক বালতি জলে 4 গ্রামের মত।

প্রায় সতের রকমের D_2O ভারী জল এখন মাত্র 0·05% সাধারণ জলের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে প্রায় বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে। এই 'ভারী' জল নিউক্লিয়ার প্রযুক্তিবিদ্যায় এবং বিশেষ করে, আণবিক রিঅ্যাক্টারে (Reactor) প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাণিজ্যিকভাবে এবং সাধারণ জল থেকে প্রভূত পরিমাণে এটা পাওয়া যায়।

বরফ-ছেদক (Icebreaker) কিভাবে কাজ করে

বাথটাবে স্নান করার সময় পরীক্ষাটা নিজেই করে দেখতে পার। বেরিয়ে আসার আগে প্লাগটা টেনে রেখে কিছুক্ষণ আসক্ত থাক। তোমার দেহ যতই জল থেকে আস্তে আস্তে বাইরে বেরিয়ে আসবে তোমার মনে হবে দেহটা বেশ ভারী ভারী ঠেকছে। এই পরীক্ষাটাই স্পষ্টভাবে তুলে ধরবে তুমি তোমার জলে হারানো ওজন জলের উপরে কিভাবে ফিরে পাও—মনে রাখবে জলপূর্ণ বাথটাবে তুমি কত হালকা বোধ করছিলে। তিমি অনিচ্ছাকৃতভাবে অনুরূপ পরীক্ষায়—চলে-যাওয়া জোয়ারে নেমে গেলে বদ্ধ জলে আটকে গিয়ে মারাত্মক সর্বনাশ ডেকে আনে। নিজের ভারের চাপেই নিজে মারা পড়ে। জল ছাড়া তিমি বাঁচে না—এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। জলের প্লবতাই অভিকর্ষের মারাত্মক ফল থেকে রক্ষা করে।

বরফ-ছেদকের সঙ্গে এ সবের সম্পর্ক কি তোমরা হয়ত ভাবতে পার। বরফের ছেদক পদার্থবিদ্যার এই নিয়মানুসারেই কাজ করে। জলের উপরের জাহাজের অংশ যেহেতু জলের প্লবতা বলে কখনো নিষ্ক্রিয় হয় না, জাহাজ এর 'শুষ্ক' ভার পায়। বরফ-ছেদক এর ধনুকে অত্যন্ত চাপ দিয়ে বরফ-ছেদন করে এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। সাধারণ বরফ-ছেদক নৌকা (Ice boat) তাই করে—কিন্তু তাও যখন বরফ খুব বেশি পুরু নয়।

'ক্রাসিন' (Krasin), 'ইয়েরমাক' (Yermak) এবং পারমাণবিক শক্তি চালিত 'লেনিন' (Lenin) সম্পূর্ণ অন্যভাবে কাজ করে। বরফের ছেদক বরফের ধনুকটিকে বরফের উপরের তলে এনে ধরে। এর জন্য জলের নিচের ধনুকের অংশ অনেকখানি হেলিয়ে রাখা হয়। যখন এটা জলের উপরে ওঠে—ধনুকটি তার সম্পূর্ণ ভার পায়—যেমন ইয়েরমাকের বেলায় প্রায় 800 টন—এবং এই ভাবে বরফ ভেঙে দেয়। চাপ আরও বাড়ানোর জন্য বরফ-ছেদকের ধনুকের জলাশয়ে জল প্রায়ই পাম্প করে পাঠানো হয়।

বরফ খুব পুরু না হলে এই ব্যবস্থাই নেওয়া হয়। অধিকতর পুরু বরফকে থুড়ে থুড়ে (ramming) পথ করে দিতে বাধ্য করা হয়। বরফ-ছেদক প্রথমে একটু পিছিয়ে আসে এবং তারপর পুরো দমে এগিয়ে যায়। বরফের প্রাচীরে গিয়ে ধাক্কা মারে। জাহাজের ভার নয়, এর গতীয় শক্তিকেই (Kinetic energy) এক্ষেত্রে কাজ করানো হয়। জাহাজটি প্রকৃতপক্ষে এখানে ক্রমাগত সজোরে আঘাতকারী অস্ত্র (Battering ram) হিসেবে কাজ করে। আঘাত এত শক্তিশালী হয় যে, কয়েক মিটার উচ্চ বরফের কঠিন দেওয়াল ভেঙ্গে পড়ে। বিখ্যাত 1932 খ্রীষ্টাব্দের শিবিরিয়াকভের অভিযানে অংশগ্রহণকারী মরু অভিযাত্রী এন. মারকভ কিভাবে তাঁর জাহাজ বরফ কেটে অগ্রসর হয় তার নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

"বৃহৎ বরফ ক্ষেত্রের শত শত জমাট বরফের মধ্য দিয়ে শিবিরিয়াকভ তার দীর্ঘ 52 ঘণ্টার লড়াই শুরু করল। দীর্ঘ তের দিন ইঞ্জিন টেলিগ্রাফ পুরোদমে সামনে পেছনে যাত্রার সংকেত জানাল, জাহাজ তখন বরফ থুড়ে থুড়ে চলল, ধনুক দিয়ে ভেঙে ফেলতে লাগল, উপরে উঠে বরফ ভেঙে দিল এবং তারপর পশ্চাদবর্তী হল আবার আঘাত হানার জন্য। $\frac{3}{4}$ মিটার পুরু বরফ অনেক কষ্টে পথ দিল। প্রত্যেকটি নতুন আঘাত জাহাজের দৈর্ঘ্যের মাত্র $\frac{1}{3}$ অংশ আমাদের নিয়ে গেল।"

ডোবা জাহাজদের কোথায় খোঁজ করতে হবে

অনেক নাবিকদেরও ধারণা সমুদ্রে নিমজ্জিত জাহাজ সমুদ্রের একবারে তলদেশে ডোবে না, কিছুটা গভীরতায় পৌঁছে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে ; জল যেখানে "জলের উপরিভাগের চাপে যথোচিত ঘনত্বে পৌঁছায়।"

'টোয়েন্টি থাউজেণ্ড লীগস্ আণ্ডার দি সী'-র লেখক জুল ভার্নেও এই মত পোষণ করতেন। এক জায়গায় জুল ভার্নে বর্ণনা করেছেন একটা ডোবা জাহাজ সমুদ্রের গভীরে নিশ্চল অবস্থায় ঝুলে আছে। আর এক অধ্যায়ে তিনি আমাদের সেই সমস্ত জাহাজের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যারা "মুক্তভাবে জলে ঝুলে থাকতে থাকতে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।"

বর্ণনাটি কি যুক্তিযুক্ত ? কেউ হয়ত ভাবতে পারে কথাটার মধ্যে যুক্তি আছে, কারণ সমুদ্রের খুব নিচে জল যে চাপ দেয় তা প্রকৃতই প্রচণ্ড। 10 মিটার নিচে জল ডুবন্ত বস্তুর প্রতি বর্গ সেণ্টিমিটারে প্রায় 1 কে.জি. পরিমিত চাপ দেয়। 20 মিটার নিচে এই চাপ 2 কে.জি., 100 মিটার নিচে 10 কে.জি. এবং 1,000 মিটার তলদেশে 100 কে.জি.।

আমরা জানি স্থানে স্থানে সমুদ্রের তলদেশ কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত গেছে, সবচেয়ে গভীরতম স্থানে 11 কিলোমিটারের বেশি—যেমন প্রশান্ত মহাসাগরের

মেরিয়ানির তলদেশ। সহজেই অনুমেয় এখানে জলের এবং এর মধ্যের সকল জিনিসের চাপ কি প্রচণ্ড।

আমরা যদি জলের অনেক নিচে একটা ছিপি-আঁটা খালি বোতল ডোবাই এবং পরে টেনে তুলি, দেখব ছিপিটা বোতলের ভেতরে ঢুকে গেছে এবং বোতলটা জলে পূর্ণ হয়েছে—সবই অনেক নিচে জল যে চাপ দেয় তারই জন্য। 'দি ওসান' শীর্ষক গ্রন্থে বিখ্যাত সমুদ্র-বিশেষজ্ঞ জন মুরে নিম্নলিখিত পরীক্ষাটা বর্ণনা করেছেন ঃ তিনটি বিভিন্ন আকারের কাচের দু-মুখ বন্ধ নল কাপড়ে জড়িয়ে জল প্রবেশ করতে পারে এমন ছিদ্রযুক্ত তামার চোঙে রাখা হল। চোঙটিকে 5 কি.মি. নিচে জলে নামানো হল এবং তারপর তুলে নেওয়া হল। যখন কাপড়টা খোলা হল, বরফের মত ভঙ্গুর কাচের বস্তু পাওয়া গেল। কাঠের টুকরো অনুরূপ গভীরতায় প্রেরণ করে দেখা গেল তারা পরে ইঁটের মত ডুবে যাচ্ছে, চাপে এতদূর পিষ্ট হয়েছে তারা।

অতএব স্বভাবতই এটা আশা করা যায় যে, এই প্রচণ্ড চাপ অনেক নিচে জলকে এত ঘন করে তুলবে যে ভারী ভারী বস্তুও আর ডুববে না—যেমন লোহার জিনিস পারদে ডোবে না। কিন্তু এটা সম্পূর্ণই ভুল ধারণা। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে জল, সাধারণভাবে অন্যান্য সকল তরল পদার্থের মত চাপে খুব কাজ করে না। প্রতি বর্গ সেণ্টিমিটার এক কিলোগ্রাম চাপে জল এর আকারের 22 হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র পিষ্ট হয়। এমন কি প্রতি অতিরিক্ত কিলোগ্রাম চাপে এর পিষ্ট হওয়ার হার একই ভাবে বাড়ে। লোহাকে জলে ভাসিয়ে রাখতে হলে আমাদের জলের ঘনত্ব আরও আট গুণ বাড়াতে হবে। কিন্তু জলকে এর দ্বিগুণ ঘন করতে হলে, বা, অন্য কথায়, জলকে চাপ দিয়ে এর আকারের অর্ধেক করতে হলে, জলকে প্রতি বর্গ সে.মি.-এ 11,000 কিলোগ্রাম চাপ দিতে হবে। ধরে নেওয়া যাক সেটা সম্ভব, তবুও এই চাপ সম্ভব হতে পারে 110 কিলোমিটার গভীরতায়।

অতএব এটা স্পষ্ট যে, সমুদ্রের গভীর তলদেশে উল্লেখযোগ্য পিষ্ট-চাপের প্রশ্নই ওঠে না, কারণ গভীরতম স্থানেও পিষ্ট-চাপের ফলে জল মাত্র শতকরা 5 ভাগ আকার হারায়। [ব্রিটিশ পদার্থবিদ টাটে (Tate) পরিমাপ করে দেখেছেন যে, অভিকর্ষ যদি হঠাৎ থেমে যায় এবং জল যদি ভারহীন হয়ে পড়ে, সমুদ্রের জলের তল গড়ে 35 মিটার ঊর্ধ্বে উঠবে যেহেতু অভিকর্ষ-পিষ্ট জল এর সাধারণ আকার ফিরে পাবে। বার্জার (Berger) লক্ষ্য করেন এ ক্ষেত্রে "সমুদ্র 50 লক্ষ বর্গ কিলোমিটার পরিমিত শুষ্ক ভূমি প্লাবিত করবে যা শুষ্ক ছিল এই কারণেই যে, সমুদ্রের জল পিষ্ট ছিল।"] এটা প্লবতার উপর তেমন কোনো প্রভাবই বিস্তার করবে না—আরও বেশি করে এই কারণে যে, এইসব

গভীরতায় সমস্ত কঠিন বস্তু একই চাপে থাকে এবং ফলে একইভাবেই পিষ্ট হয়।

অতএব জলে-ডোবা জাহাজ যে সমুদ্রগর্ভের তলদেশে একেবারে নিমজ্জিত হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। "এক বালতি জলে যা একেবারে ডুববে," মুরে বলেন, "তা কার্যত গভীরতম সমুদ্রেও ডুববে।"

এর বিরুদ্ধেও নিম্নরূপ যুক্তি শোনা গেছে। যদি সাবধানে একটা গ্লাসকে উল্টোভাবে ডোবানো হয়, এটা এইভাবেই জলে থেকে যাবে, যেহেতু গ্লাসের ভারের সমান ভারের জল সে অপসারিত করবে। অপেক্ষাকৃত ভারী কোনো ধাতব বালতিও এই অবস্থায় রাখলে, জলের কিছু নিচে এই অবস্থাতেই থাকবে একেবারে নিচে না ডুবে। সুতরাং দাবি করা হয় উল্টে যাওয়া জলযান বা জলে-ডোবা অন্য কোনো জাহাজ কিছু দূর ডুবে অর্ধপথে গিয়ে থেমে থাকবে। জাহাজের কক্ষগুলোর বাতাস যদি না বেরুতে পারে, জাহাজ কিছু গভীরতায় ডুবে সেখানেই থাকবে। প্রকৃতপক্ষে অতি অল্প সংখ্যক জাহাজই তলা উপর দিকে করে ডোবে। তাহলে এও কি সম্ভব যে, তাদের কোনো কোনোটা তলে প্রবেশ না করে সমুদ্রের গভীরে নির্দিষ্ট গভীরতায় ঝুলে আছে? এবং যদিও সামান্য একটু ধাক্কা তাদের সাম্যাবস্থা নষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট, ঠিক অবস্থায় এনে তাদের জলে পূর্ণ করে তলদেশে পাঠিয়ে দিতে পারে, তবুও সমুদ্রে যেখানে ধীর স্থির চির শান্তি বিরাজ করছে এবং যেখানে সবচেয়ে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাও কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, সেখানে এটা কি আশা করা যায়?

এই সব যুক্তি-তর্ক পদার্থবিদ্যা বিষয়ক ভুল ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। উল্টানো গ্লাস নিজে অর্ধ নিমগ্ন অবস্থায় থাকে না। বাইরের কোনো বলের প্রভাবেই এমনটি ঘটে—ঠিক যেমনভাবে খণ্ড কাঠ বা ছিপি-আঁটা খালি বোতল থাকে। অনুরূপভাবে একটা উল্টানো জাহাজও ভাসতে থাকবে—উপর-নিচের মাঝ পথে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে না।

জুল ভার্ন এবং এইচ. জি. ওয়েলস্-এর স্বপ্ন কিভাবে সত্যে পরিণত হল

আজকের ডুবোজাহাজ জুল ভার্নের উদ্ভট 'নটিলাস'কেও কয়েকটি বিষয়ে টেক্কা মেরেছে। তবে একথা ঠিক যে, তাদের গতি ওর অর্ধেক, জুল ভার্নের 50-এর পরিবর্তে মাত্র 24 নট (Knot)। উপরন্তু এই সব আধুনিক ডুবো-জাহাজ যে দীর্ঘতম পথ পাড়ি দিতে পারে তা হল সারা পৃথিবী ঘুরে একবার, আর জুল ভার্নের ক্যাপ্টেন নেমো প্রদক্ষিণ করতে পারত এর দ্বিগুণ পথ। অপর পক্ষে, নটিলাস মাত্র 1,500 টন জল সরাতে পারত, এর যাত্রী ছিল 30 জনের মত এবং এ ডুবে থাকতে পারত 48 ঘণ্টার বেশি নয়। আর 1929 খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী নৌবাহিনী 3,200 টনের যে ডুবোজাহাজ তৈরি করেন

তার যাত্রী সংখ্যা ছিল 150 জন এবং জলের উপরে না ভেসে দীর্ঘ 120 ঘণ্ট অনায়াসে জলে ডুবে থাকতে পারত।*

সারকউফ্ (Surcouff) ডুবোজাহাজ ফ্রান্স থেকে মাডাগাসকার যেতে সমথ হয়েছিল পথে কোনো বন্দরে না থেমে। এ ছাড়া আরাম ও যাত্রীদের সুযোগ সুবিধা দানের বিষয়ে এই ডুবোজাহাজ ছিল ক্যাপ্টেন নেমোর জাহাজের প্রায় সমকক্ষ। আরও, যা ছিল এর প্রশ্নাতীত গর্বের বস্তু, তা হল, এর সামুদ্রিক জাহাজ কর্তৃক পূর্বে থেকেই পরিদর্শন করার জন্য জল-নিরোধক (Water-proof) আপার-ডেক হ্যাংগার। আরও উল্লেখযোগ্য যে, জুল ভার্নের নটিলাস-এ 'পেরিস্কোপ' (Periscope) ছিল না, যার সাহায্যে ডুবোজাহাজের যাত্রী জলের নিচে থেকে উপরের জল-তল লক্ষ্য করতে পারে।

কেবলমাত্র একটি বিষয়ে আমরা এখনও পর্যন্ত যে ডুবোজাহাজ তৈরি করেছি তা জুল ভার্নে উদ্ভাবিত ডুবোজাহাজের তুলনায় অনেকটা নিকৃষ্টঃ তা হল ডোবার গভীরতা কতখানি। কিন্তু এ বিষয়ে জুল ভার্নের কল্পনা সত্যের সীমানা পেরিয়ে গেছে। এক জায়গায় আমরা দেখতে পাই, "ক্যাপ্টেন নেমো 3, 4, 5, 6, 7, 9 এবং 10 হাজার মিটার সাগরের জলের তলে নেমে গেলেন।" একবার নটিলাস অভূতপূর্ব 16,000 মিটার পর্যন্ত নেমে গিয়েছিল। "আমি অনুভব করলাম", অধিনায়ক বলছেন, "ডুবোজাহাজের লৌহ-পাতের রিবেটগুলো খুলে যাচ্ছে এবং এর পোর্টহোলগুলো ভেতরের দিকে ফেঁপে উঠছে জলের প্রচণ্ড চাপে। আমাদের জাহাজ যদি কঠিন ঢালাই বস্তুর মত শক্ত পোক্ত না হত, এটা বোধ হয় তৎক্ষণাৎ কাগজের মণ্ডের মত দলা পাকিয়ে যেত।" অধিনায়কের এই রকম আশঙ্কার কারণ ছিল বৈকি, কারণ 16 কিলোমিটার নিচে—যদি এমন গভীরতা থেকেও থাকে—জলের চাপ দাঁড়াবে 16,000 ঃ 10 = 1,600 কে.জি./সে.মি.^{2} বা 1,600 টেকনিক্যাল অ্যাটমস্ফীয়ার (Technical atmosphere)। এই প্রচণ্ড চাপে লোহা না ভাঙলেও, লোহায় নিঃসন্দেহে খাঁজ পড়ে যাবে।

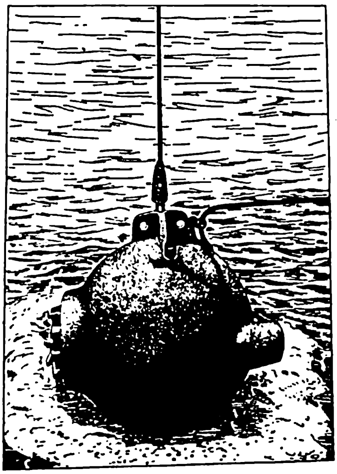
অবশ্য সাগর চিত্রগ্রাহক (Oceanographer)-দের এমন গভীরতার কথা জানা নেই। সাগরের গভীরতা সম্বন্ধে জুল ভার্নের সময়কার অতিশয়োক্তি (উপন্যাসটা লেখা হয় 1869 খ্রীষ্টাব্দে)—কারণ অনেকটা তৎকালীন শব্দ

---

* আধুনিক নিউক্লিয়ার শক্তিচালিত ডুবোজাহাজ আমাদের স্বল্প আবিষ্কৃত সাগরে এবং ক: গভীরতা বিশিষ্ট মহাসাগরে স্বাধীনভাবে পথ নিরূপণে সহায়তা করে। শক্তির যে অপর্যাপ্ত সঞ্চ তারা বহন করে তা তাদেরকে বহুদূর পথ না ভেসে ঘুরতে সাহায্য করে। এইরূপে আমেরিকা নিউক্লিয়ার শক্তিচালিত ডুবোজাহাজ 'নটিলাস' সুমেরু দেশে উত্তর মেরু হয়ে বেরিং সাগর থেকে গ্রীনল্যাণ্ড সাগরে না ভেসে পরিক্রমা করে। একই শ্রেণীর আর একটি একবারও জলে না ভেসে পৃথিবী পরিক্রমা করে ফেরে।

সংগ্রহণ ব্যবস্থার ত্রুটি। তখনকার দিনে শব্দ সংবাহক হিসেবে তারের বদলে নারিকেলের দড়ি ব্যবহার করা হত। ফলে দড়িটা যত নিচে যেত ততই এর উপর জলের ঘর্ষণ বাড়ত এবং তারপর যতই ছাড়া হোক না কেন, কিছু দূর যাবার পর এই ঘর্ষণ, কতটা গেছে সেটা কোনো বিষয় নয়, দড়িটির আরও ডোবার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াত। দড়িটা কেবল নিজেকে জড়িয়ে ফেলত এবং এইভাবে বিশাল গভীরতার ভুল ধারণা জন্মাত।

চিত্র 49



ইস্পাতের চাদর দিয়ে ঢাকা বেথিস্ফিয়ার যাতে করে উইলিয়াম বিবি 1934 সালে সাগরের 923 মিটার গভীরে পৌঁছান।

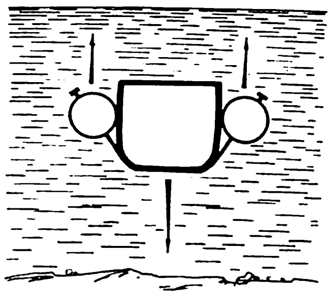
আধুনিক ডুবোজাহাজ 25 অ্যাটমস্ফিয়ার (Atmospheres)-এর বেশি চাপ সহ্য করতে পারে না। এর অর্থ হল—এই সব ডুবোজাহাজ 250 মিটারের বেশি গভীরতায় নিমগ্ন হতে পারে না। অবশ্য আরও অনেক গভীরে যাওয়ার জন্য বিশেষ ধরনের বাথিস্ফিয়ার (Bathysphere) নামে যন্ত্রও উদ্ভাবিত হয়েছে। সাগরের তলদেশে জীবনের অস্তিত্বের সন্ধানের জন্যই এই যন্ত্র বিশেষভাবে তৈরী। জুল ভার্নের 'নটিলাস'-এর সঙ্গে এর সাদৃশ্য নেই বরং এইচ্. জি. ওয়েলস্-এর 'দি সী রেডারস্'-এর (The Sea Raiders) আবিষ্কারের সঙ্গে মিল আছে। দি সী রেডারস্ উপন্যাসে পুরু ইস্পাতের দেওয়াল নির্মিত গোলকে চড়ে 9 কিলোমিটার সাগর গর্ভে এক মানুষের অভিযানের বর্ণনা করা হয়েছে। তার ছাড়া জাহাজের স্থিতিদানকারী ভার (Ballast) নিয়ে যন্ত্রটা নিমজ্জিত হয়েছিল। সাগরের তলদেশে পেঁৗছে ঐ ভারটি খুলে দেওয়া হয়

এবং গোলকটি দ্রুত উপরে উঠে আসে। বাথিস্ফিয়ারে চেপে বিজ্ঞানীরা 900 মিটারেরও বেশি নিচে পেঁছেছেন। জাহাজের তার বেয়ে বাথিস্ফিয়ারকে নিচে নামানো হয় যার সঙ্গে জল-তলের যাত্রী টেলিফোনে যোগাযোগ রক্ষা করে*।

সাড্কো-কে আবার ভাসান হল কিভাবে

প্রতি বছর, বিশেষ করে যুদ্ধের সময়, হাজার হাজার ছোট-বড় জাহাজ জলে ডুবে যায়। গত বিশ ত্রিশ বছরে অধিকতর মূল্যবান সামগ্রীগুলো আবার ভাসিয়ে তোলা হয়েছে। স্পেশাল পারপাস আণ্ডার ওয়াটার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এর সোভিয়েত কারিগরেরা ও ডুবুরীরা 150-এর বেশি বড় জাহাজ সাফল্যের সঙ্গে উদ্ধার করে পৃথিবীর খ্যাতি অর্জন করেছে। এর মধ্যে বৃহত্তমটি হল 1916 খ্রীষ্টাব্দের আইসব্রেকার (Icebreaker) সাড্কো যেটা স্কীপারের অবহেলার জন্য শ্বেত সাগরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সাগরের নিচে 17 বছর থাকার পর এই সুন্দর জাহাজটি তোলা হয় ও পুনরায় ভাসমান অবস্থায় আনা হয়।

চিত্র 50



সাড্কোকে কিভাবে তোলা হয়। বরফচ্ছেদক, পোনটুন এবং উত্তোলক শৃঙ্খলগুলো প্রস্থচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে।

সমস্ত কলা-কৌশলটা আর্কিমিডিসের নিয়মের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। 25 মিটার গভীরে ডুবুরীরা সাগরের তলদেশে 12টা টানেল খনন করেন ডুবো আইসব্রেকারের নিচে এবং প্রত্যেকটির মধ্য দিয়ে শক্ত ইস্পাতের তার প্রেরণ করে

---

* আরও পরবর্তীকালে গভীর জলে নিমগ্ন হবার আর এক যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে যার নাম বাথিস্কেফি (Bathyscaphe)। যন্ত্রটি কারিগর উইলমের পরিচালনায় ফ্রান্সে এবং বেলজিয়ান অধ্যাপক পিকার্ডের পরিচালনায় ইতালীতে উদ্ভাবিত হয়। বাথিস্ফীয়ারের সঙ্গে এর পার্থক্য এই যে, এটা অনেক গভীরে যেতে পারে কিন্তু বাথিস্ফীয়ার যোগাযোগ রক্ষাকারী তাদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। প্রথমে তিন কিলোমিটারের বেশি নেমে যান। তারপর ফরাসী গুইলাউম এবং উইলম 4,050 মিটার গভীরতায় পৌছান। 1959 সালে নভেম্বর মাসে একটা বাথিস্কেফি 5,670 মিটার অবতরণ করে কিন্তু এটাও শেষ সীমা নয়। 1960 সালের 9ই জানুয়ারী পিকার্ড 7,300 মিটার নামেন এবং 23শে জানুয়ারী তিনি 11·5 কিলোমিটার গভীর মেরিয়ানির তলদেশে পৌছান এবং ধারণা করেন যে, এটাই পৃথিবীর গভীরতম তলদেশ।

দেন। তারের প্রান্তভাগ ইচ্ছাকৃতভাবে জলে নিমজ্জিত পোনটুন (Pontoon)-এর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। 50 নং চিত্রে প্রদর্শিত হয়েছে এই পোনটুন যেগুলো 11 মিটার দীর্ঘ, 5·5 মিটার ব্যাসযুক্ত ফাঁপা জল নিরোধক লোহার চোঙ। শূন্য অবস্থায় এদের ওজন 50 টন এবং আয়তন প্রায় 250 ঘন মিটার। খুব সহজেই বোঝা যায় যে, শূন্য অবস্থায় পোনটুনটি ডুবতে পারে না, যার ওজন মাত্র 50 টন এবং যার জল অপসারণ ক্ষমতা 250 টন, এর উত্তোলন ক্ষমতা তাহলে অবশ্যই $250-50=200$ টন। অতএব জলে নিমজ্জিত করার জন্য একে জলে পূর্ণ করতে হয়েছিল।

জলে নিমজ্জিত ইস্পাতের তারগুলো জলে-ডোবা পোনটুনগুলোর সঙ্গে দৃঢ় সন্নিবদ্ধ হবার পর, চাপে সংকুচিত বাতাস প্রত্যেকটির মধ্যে পাম্প করে ঢোকানো হয় (চিত্র 50)। 25 মিটার নিচে জল $\frac{25}{10}+1$ অর্থাৎ 3·5 অ্যাট্মস্ফিয়ার (Atmosphere) চাপ দেয়। বাতাস পাম্প করে ঢোকানো হয়েছিল প্রায় 4 এটিএম. চাপে এবং ফলে, পোনটুনগুলো খালি করেছিল। জল তাদেরকে প্রচণ্ড বলে উপরিভাগে ঠেলে তুলে দেয়। যে 12টি পোনটুন ব্যবহার করা হয়েছিল তাদের মোট উত্তোলন ক্ষমতা ছিল $200\times12=$ 2,400 টন। কিন্তু যেহেতু এটা সাড্‌কোর নিজের ওজনের চেয়ে বেশি, সমস্ত জল পাম্প করে বার করা হয় নি—যাতে কাজটা আরও সহজে করা যায়। কিন্তু জাহাজ উপরে ওঠানো সম্ভব হয়েছে বেশ কয়েকবারের ব্যর্থ চেষ্টার পরে। "আমরা চারবার অকৃতকার্য হই, সাফল্যমণ্ডিত হবার আগে, ভারপ্রাপ্ত কারিগর টি. আই. ববরিট্‌স্কি লিখলেন। "তিন বার রুদ্ধশ্বাসে আমরা যখন জাহাজটার আগমনের প্রতীক্ষা করছি, আমরা দেখলাম আইসবেক্রারের পরিবর্তে পোনটুন, ছেঁড়া তার এবং হোসগুলো বিশালতরঙ্গ ও ফেনার বিশৃঙ্খলার মধ্যে পাক খাচ্ছে। একেবারে ভেসে ওঠার আগে আইসবেক্রার নিজে উঠে আসে এবং ডুবে যায় দু'দুবার।"

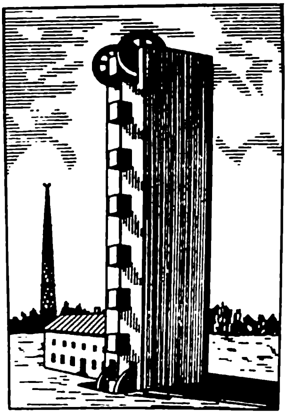
'নিরবচ্ছিন্ন গতির' জল-যন্ত্র

গণনাতীত 'নিরবচ্ছিন্ন গতি' সম্পন্ন প্রকল্পগুলির মধ্যে অনেকগুলোই জলের প্লবতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। একটা হল জলে পূর্ণ 20 মিটার লম্বা গম্বুজ। এর উপরে-নিচে অসীম বেল্টের মত মজবুত তার রয়েছে পুলির মধ্য দিয়ে দিয়ে। তারের সঙ্গে আটকানো রয়েছে 14টি খালি ঘনকাকার বাক্স। বাক্সের প্রতিটি 1 মিটার উচ্চ, লোহার পাত দিয়ে রিবেট (Rivet) করা যাতে জল না ঢোকে 51 ও 52 নং চিত্র দুটি এই গম্বুজের ও এর প্রস্থচ্ছেদের (Cross-section)।

এখন কিভাবে এটা কাজ করে বলে মনে হয়? আর্কিমিডিসের নীতির সঙ্গে পরিচিত প্রত্যেকেই জানে, জলে ডোবা বাক্সগুলো উপরে উঠে আসার চেষ্টা

করবে, কারণ তারা যে জল অপসারিত করবে তার সমপরিমাণ ওজনের বল দ্বারা উত্থিত হবে অথবা অন্যভাবে বলা যায় নিমজ্জিত বাক্সের সংখ্যা যত 1 ঘন মিটার আয়তনের জলের ওজনের তত গুণ বল দ্বারা উত্থিত হবে। তাহলে জলের

চিত্র 51



কাল্পনিক জল চালিত "নিরবচ্ছিন্ন গতি" সম্পন্ন যন্ত্রের পরিকল্পনা।

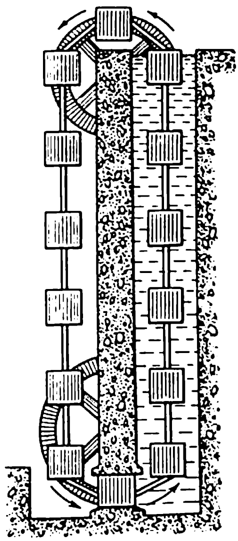
প্লবতার চাপ 6 ঘন মিটার জলের ওজনের সমান বা 6 টন। ইত্যবসরে বাক্সগুলোও তাদের নিজেদের ভারে নিচে নামবে যা অবশ্য, তারের বাইরের পার্শ্বের ঝোলান অপর 6টি ঘনকের দ্বারা ভারসাম্যাবস্থায় আসবে।

সুতরাং তারটিকে 6 টন বল দ্বারা উপরে টানতে হবে। এই বল আপাত দৃষ্টিতে তারটিকে অসংখ্যবার ঘুরতে বাধ্য করবে এবং প্রতিবারের আবর্তে $6{,}000 \times 20 = 1{,}20{,}000$ কে.জি.এস. কাজ করবে। 'অতএব' আমরা যদি এই সব গম্বুজ দিয়ে দেশকে পরিবৃত করতে পারি, আমরা তাদের দিয়ে অসীম কাজ করাতে পারব, অন্তত এত কাজ যা দিয়ে সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটানো যায়, যেহেতু তারা ডায়নামোর রোটারগুলো ঘুরিয়ে যে কোনো পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবে।

যা হোক, প্রকল্পটা বিশ্লেষণ করা যাক। আমরা দেখব তারটি একেবারেই নড়বে না। বস্তুত, তারটিকে চলনশীল রাখতে হলে বাক্সগুলোকে গম্বুজের জলের মধ্যে নিচে থেকে ডুবতে হবে এবং উপরে পুনঃ প্রবেশ করতে হবে। কিন্তু জলে ডুবতে হলে প্রত্যেক বাক্সকে 20 মিটার জলস্তম্ভের চাপ অতিক্রম করতে হবে। এক বর্গ মিটার বাক্সের ক্ষেত্রফলে এই গম্বুজ যে চাপ দেয় তা হল 20 টন—অর্থাৎ 20 ঘন মিটার জলের ওজন। এ দিকে আমাদের ঊর্ধ্বচাপ আছে মাত্র 6 টন যা বাক্সকে জলে টেনে আনার পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়।

বিকৃত মস্তিষ্ক উদ্ভাসিত অনেকগুলো জল-চালিত 'নিরবচ্ছিন্ন গতি সম্পন্ন' যন্ত্রের মধ্যে অত্যন্ত সরল অথচ হাস্যোদ্দীপক কিছু কলাকৌশলও দেখা যায়। 53 নং চিত্রে এরই একটি দেখানো হয়েছে। চাকার অক্ষদণ্ডের উপর স্থাপিত প্রদর্শিত

চিত্র 52

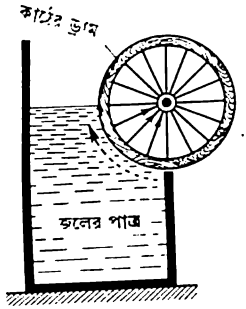


পূর্বের চিত্রে প্রদর্শিত গম্বুজের প্রস্থচ্ছেদ।

কাঠের ড্রামের অংশ বিশেষ সব সময় জলে ডোবানো থাকে। আর্কিমিডিসের নিয়ম যদি প্রযোজ্য হয়, তাহলে নিমজ্জিত বৃত্তাংশ (Segment) সব সময় উপরে উঠতে চাইবে ; এবং যেহেতু প্লবতার চাপ অক্ষদণ্ডের ঘর্ষণবলের চেয়ে বড়, ড্রামটি অসংখ্যবার ঘুরবে। কিন্তু ঘোড়াগুলোকে সামলাও ! এই প্রকল্প নকল করার চেষ্টা করলে দেখবে ব্যর্থতা অনিবার্য। ড্রাম ঘুরবে না। এর কারণ কি ? কারণ বল যে দিকে ক্রিয়া করে তা আমাদের চোখ এড়িয়ে গেছে। এই বলগুলো ড্রামের তলের বা পৃষ্ঠের সঙ্গে সব সময় লম্বভাবে থাকবে অর্থাৎ অক্ষদণ্ডের সঙ্গে ব্যাসার্ধ বরবার। কিন্তু তোমরা অবশ্যই বার বার দেখেছ যে, ব্যাসার্ধ বরাবর বলপ্রয়োগ করে চাকাকে ঘোরানো যায় না। এর পরিবর্তে, ব্যাসার্ধের সঙ্গে লম্বাভিমুখে বলপ্রয়োগ করতে হবে অর্থাৎ চাকার পরিধির সঙ্গে স্পর্শক করে বলপ্রয়োগ করতে হবে। তাহলেই বুঝতে পারছ, 'নিরবচ্ছিন্ন গতি' উৎপাদন কেন আবার ব্যর্থ হল।

আর্কিমিডিসের নিয়ম অসংখ্য 'নিরবচ্ছিন্ন গতি' সম্বন্ধে উৎসাহী ছিট্‌গ্রস্ত মানুষকে লোভনীয় চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে। আপাত ওজনের হ্রাসকে কাজে

চিত্র 53



জল-চালিত "নিরবচ্ছিন্ন গতি" সম্পন্ন যন্ত্রের আর একটি প্রকল্প।

লাগিয়ে নিরবচ্ছিন্ন যান্ত্রিক শক্তির উৎস সন্ধানে আর্কিমিডিসের প্লবতার সূত্র তাদের শিল্প সম্মত কৌশল উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত করেছে। কিন্তু এর কোনো প্রচেষ্টাই অতীতে কার্যকর হয় নি, ভবিষ্যতেও জয়যুক্ত হবে না।

'গ্যাস' (Gas) কথাটি কার আবিষ্কার ?

'তাপমান যন্ত্র' (Thermometar), 'বিদ্যুৎ', 'গ্যালভ্যানোমিটার' (Galvanometer), 'টেলিফোন' এবং প্রথমত, 'অ্যাটমস্ফিয়ার' প্রভৃতি আরও অনেক শব্দের সঙ্গে 'গ্যাস' শব্দটিও বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার। তবে সকল আবিষ্কৃত শব্দগুলির মধ্যে ইংরাজীতে গ্যাস শব্দটি প্রশ্নাতীতভাবে সবচেয়ে ছোট। গ্যালিলিও-র সমসাময়িক 'ডাচ্‌' রসায়নবিদ ও চিকিৎসক হেলমণ্ট (1577—1644) গ্রীক শব্দ 'কেয়স' (Chaos) থেকে 'গ্যাস' শব্দটির প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ধারণ করেন। তিনি দেখলেন, বাতাস দুটি অংশ নিয়ে গঠিত, যার এক অংশ দহন ক্রিয়ায় সহায়তা করে এবং নিঃশোষিত হয়ে যায় আর অপর অংশ হয় না। তাই হেল্‌মণ্ট লিখলেন, "এই বাষ্পকে 'গ্যাস' বলেছি তার কারণ প্রাচীনদের 'ক্যায়স' শব্দটির সঙ্গে এর বিশেষ পার্থক্য নেই।" ['ক্যায়স' ('বিশৃঙ্খলা') কথাটির মূল অর্থ কোনো 'ক্যাসম' (ফাটল)।] কিন্তু বহুদিন এই নতুন শব্দটি মানুষকে বিশেষ আকৃষ্ট করে নি। মণ্টগলফিয়ার ভ্রাতৃবৃন্দ যখন তাঁদের যুগান্তকারী বেলুন অভিযান করেন তখনই 1789 খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত ল্যাভয়সিঁয় (Lavoisier) এই শব্দটি পুনরুজ্জীবিত করেন।

বিখ্যাত অষ্টাদশ শতাব্দীর রুশ বিজ্ঞানী লোমোনোসভ (Lomonosov) গ্যাসীয় পদার্থের অপর এক নামকরণ করেন। তিনি তাদের 'স্থিতিস্থাপক তরল' ('Resilient liquids') আখ্যা দেন। ঘটনাক্রমে আমার স্কুল জীবনেও শব্দটির প্রচলন ছিল। স্মরণ করা যেতে পারে যে, লোমোনোসভ রুশ ভাষায় 'অ্যাটমস্ফিয়ার', 'ব্যারোমিটার', 'এয়ার পাম্প', 'ক্রিস্টালাইজেশান', 'ম্যাটার', 'ইথার' প্রভৃতি আরও অনেকগুলি ব্যবহারোপযোগী বৈজ্ঞানিক শব্দের সংযোজন করেন। এই বিরাট প্রতিভা ও রাশিয়ার প্রকৃতি-বিজ্ঞানের জনক এই প্রসঙ্গে লেখেন ঃ "কিছু কিছু যন্ত্রপাতি, ক্রিয়া ও প্রাকৃতিক বস্তুসমূহের নামকরণের জন্য আমি নতুন নতুন শব্দের সন্ধান করতে বাধ্য হয়েছি। এই শব্দসমূহ প্রথম প্রথম উদ্ভট লাগতে পারে কিন্তু আমার ধারণা ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে তারা আরও পরিচিত হয়ে উঠবে।"

বলা যায়, লোমোনোসভের ভবিষ্যৎ বাণী সত্যে পরিণত হয়েছিল।

আপাতদৃষ্টিতে সহজ কাজ

চায়ের গ্লাসের তিরিশ গ্লাস জল ধরে এমন একটি পাত্র জলে কানায় কানায় পূর্ণ কর। এর কলে একটা গ্লাস রাখ এবং ঘড়ি ধরে দেখ গ্লাসটি পূর্ণ হতে ক' সেকেন্ড সময় লাগে। মনে কর, আধ মিনিট সময় লাগল। এখন আমার প্রশ্ন হল ঃ কল খুলে রাখলে পাত্রটি জলশূন্য হতে কত সময় লাগবে ?

কাজটা কি খুব সহজ নয় ? একটা গ্লাস পূর্ণ হতে যদি আধ মিনিট সময় লাগে, তোমার মনে হবে, সমস্ত পাত্রটি খালি হতে নিশ্চয়ই 15 মিনিট সময় লাগবে।

নিজেই চেষ্টা করে পরখ করে দেখ না। তুমি দেখতে পাবে পাত্রটি আধ ঘণ্টায় সম্পূর্ণ খালি হবে। কেন এমন ঘটল ? প্রকৃত পক্ষে, ব্যাপারটা তো খুবই সহজ মনে হয়েছিল। ঠিকই, কিন্তু ভুল।

দেখ, যে হারে জল পড়ছে তা সব সময় এক থাকছে না। প্রথম গ্লাসটি পূর্ণ হবার পর দ্বিতীয় গ্লাসটি পূর্ণ হতে আরও বেশি সময় লাগবে, কারণ পাত্রে জল কমে আসবে, এবং এর তল নিচে নেমে আসায়, জল অপেক্ষাকৃত কম চাপ দেবে। এই একই কারণে তৃতীয় গ্লাসটি কলের জলে পূর্ণ হতে আরও বেশি সময় নেবে এবং এই দীর্ঘতর থেকে দীর্ঘতর সময় লাগবে পরের গ্লাসগুলি পূর্ণ হতে।

যে বেগে কোনো তরল পদার্থ উন্মুক্ত শীর্ষ বিশিষ্ট কোনো খোলা মুখ পাত্রের গায়ের কোনো ছিদ্রপথে বাইরে পতিত হয় তা ঐ ছিদ্রের উপরের তরল স্তম্ভের উচ্চতার সঙ্গে সমানুপাতিক। গ্যালিলিও-র কৃতী-ছাত্র টোরিসেলি

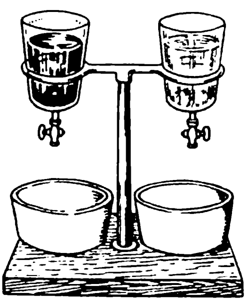
(Torricelli) প্রথমে এই পারস্পরিক নির্ভরতার সম্পর্কটি লক্ষ্য করেন এবং সম্পর্কটিকে সহজ একটি সূত্র প্রকাশ করেন। সূত্রটি হল : $v = \sqrt{2gh}$, যেখানে v হল পতনশীল তরলের বেগ, g হল অভিকর্ষজ ত্বরণ, এবং h হল ছিদ্রের উপর অংশের তরল স্তম্ভের উচ্চতা। এই সূত্র থেকেই বোঝা যায় যে, তরলের ছিদ্রপথে নির্গমন তরলের ঘনত্বের উপর মোটেই নির্ভর করে না। তরলের স্তম্ভের উচ্চতা যদি সমান হয়, হালকা অ্যালকোহল এবং ভারী পারদ একই বেগে পড়বে (চিত্র 54)। আরও বলা যায়, চাঁদে, যার অভিকর্ষ পৃথিবীর অভিকর্ষের একের ছয় ভাগ মাত্র, সেখানে পৃথিবীর তুলনায় একটা গ্লাস পূর্ণ করতে প্রায় আড়াই গুণ বেশি সময় লাগবে।

যাক, এবার আবার আমাদের প্রশ্নে ফিরে আসা যাক। যদি কুড়িটা গ্লাস জলে পূর্ণ হবার পর নলের উপরের জল-তল পূর্ণ পাত্রের এক-চতুর্থাংশ নেমে আসে, তা হলে একুশতম গ্লাসটির প্রথম গ্লাসটির তুলনায় দ্বিগুণ সময় লাগবে পূর্ণ হতে। আরও পরে জল-তল যদি একের-নয় ভাগ নেমে আসে তাহলে বাকী ক'টি গ্লাস পূর্ণ হতে প্রায় তিন গুণ সময় নেবে। কলন গণিত (Calculus)-এর সাহায্যে প্রশ্নটির সমাধান করলে আমরা দেখতে পাব, পাত্রটিকে সম্পূর্ণ খালি করতে যে সময় লাগে তা, নলের উপরে জলের তল সব সময় সমান থাকলে, খালি করতে যে সময় লাগত তার দ্বিগুণ।

চৌবাচ্চার প্রশ্ন

এখান থেকে আর এক ধাপ অগ্রসর হলেই আমরা সেই গোলমেলে চৌবাচ্চার প্রশ্নে এসে পড়ব যা প্রত্যেক পাটীগণিত ও বীজগণিতের পুস্তকে মেলে। তোমাদের

চিত্র 54



পারদ না অ্যালকোহল—কোন তরলটি আগে পড়বে? তরল তল দুটি পাত্রেই সমান।

সকলেরই যে বিদ্যালয়ে করা এই ধরনের প্রাচীন শুষ্ক অংকের কথা স্মরণ আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই :

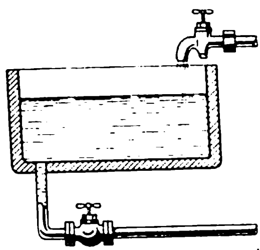
"চৌবাচ্চার দুটি নল আছে—একটা দিয়ে জল ঢোকার ও অপরটি দিয়ে জল বেরুবার। প্রথম নলটি পাঁচ ঘণ্টায় চৌবাচ্চাটি কানায় কানায় পূর্ণ করে এবং দ্বিতীয়টি দিয়ে চৌবাচ্চাটি দশ ঘণ্টায় একেবারে খালি হয়। দুটি নলই খোলা রাখলে চৌবাচ্চাটি কতক্ষণে পূর্ণ হবে ?

সমস্যাটি প্রায় কুড়িটি শতাব্দীর আলেকজান্দ্রিয়ার হেরনের সময়কার প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। তাঁর একটা প্রশ্ন এখানে উদ্ধৃত করি ঃ

"চারটি ঝরণা আর একটা প্রকাণ্ড জলাধার আছে। প্রথম ঝরণাটা দিয়ে মাত্র এক দিনে জলাধারটি পূর্ণ হয়, দ্বিতীয়টি দিয়ে দুই দিন রাত্রে একই কাজ হবে। তৃতীয়টি দিয়ে প্রথম ঝরণাটির তিন গুণ সময়ে এবং চতুর্থটি দিয়ে চার দিন এবং রাত্রে জলাধারটি পূর্ণ হয়। এখন বল, চারটি ঝরণাই এক সঙ্গে কাজ করলে জলাধারটি কতক্ষণে পূর্ণ হবে ?"

এখন থেকে প্রায় দু হাজার বছর আগে এই চৌবাচ্চার প্রশ্নটা উপস্থাপিত হয়েছিল এবং স্বভাবের দোষে সব সময়ই ভুল সমাধান করা হয়েছে। আমাদের

চিত্র 55



চৌবাচ্চার প্রশ্ন।

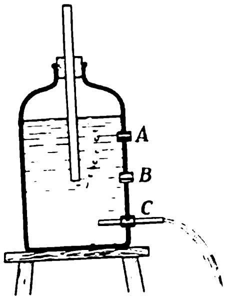
চৌবাচ্চার সমস্যাটা নিয়ে সমাধান করলেই বুঝতে পারবে কেন এ যাবৎ ভুল সমাধান করা হয়েছে। বস্তুত সমাধানটা কি দেওয়া হয়েছে ? উপরের চৌবাচ্চার সমস্যার সমাধানটা নিম্নরূপ ঃ বলা হয়েছে, এক ঘণ্টায় প্রথম নলটি চৌবাচ্চার এক-পঞ্চমাংশ পূর্ণ করে, আর দ্বিতীয়টি এক ঘণ্টায় এক-দশমাংশ খালি করে। সুতরাং যখন দুটো নলই কাজ করছে তখন প্রতি ঘণ্টায় $\frac{1}{5}-\frac{1}{10}=\frac{1}{10}$ অংশ পূর্ণ হবে। এর অর্থ হল চৌবাচ্চাটি কানায় কানায় পূর্ণ হতে সময় লাগবে দশ ঘণ্টা। এটা অবশ্য প্রশ্নটা সমাধান করতে ভুল পথে যাওয়া। যদিও জল এক এবং সমান চাপে ভেতরে ঢুকছে বলে ধরা যায়, জল বেরিয়ে আসছে পরিবর্তনশীল জল-তলের চাপে ; সুতরাং জলের নির্গমনের বেগের হার সব সময় সমান নয়। দ্বিতীয় নলটি দশ ঘণ্টায় চৌবাচ্চাটি খালি করে অর্থ এই নয় যে, প্রতি ঘণ্টায় চৌবাচ্চার এক-দশমাংশ জল বেরিয়ে যায়। প্রাথমিক গণিতের জ্ঞান নিয়ে

আমরা কখনই নির্ভুলভাবে এ অংকের সমাধান করতে পারব না। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে পাটীগণিতের প্রশ্নমালায় চৌবাচ্চার ও জল নির্গমনের সঙ্গে জড়িত প্রশ্নাবলীর কোনো স্থান নেই।

বিস্ময়কর পাত্র

এমন কোনো পাত্র কি পাওয়া যাবে যার ভেতরের জল-তল নেমে এলেও সব সময় জল সমভাবেই পড়তে থাকবে? মনে হয়, তোমরা এখন মনে করবে যে, এমন

চিত্র 56



মেরিওট ("Mariotte") বোতলের প্রস্থচ্ছেদ। জল সমানভাবে ধারায় পড়ছে।

হওয়া অসম্ভব। কিন্তু এটা করা যায়। 56 নং চিত্রে এই ধরনের একটি বিস্ময়কর পাত্র দেখানো হয়েছে। সরু মুখ বিশিষ্ট এটা একটা সাধারণ বোতল। মুখের কর্কের মধ্য দিয়ে একটা কাচের নল ঢোকানো আছে। তুমি যখন নলের নিচের প্রান্তের ছিদ্রটা খুলে দেবে, পাত্রের ভেতরের জল-তল যতক্ষণ না ভেতরের কাচের নলের নিচে আসছে, ততক্ষণ জল সমভাবে পড়তে থাকবে। নলটিকে প্রায় ছিদ্রের তল পর্যন্ত নামিয়ে এনে তুমি পাত্রের সমস্ত জলই খুব সরু আকারে হলেও, সমভাবে বার করে দিতে পার।

এটা কেমন ভাবে ঘটে? ছিদ্রটা জল বেরুনোর জন্য খুলে দিলে যা ঘটবে তা মনের চোখে একবার এঁকে দেখার চেষ্টা কর। প্রথমত, উপরের নলের জল-তল যা এর নিচে পড়বে, পাত্রের জল-তল কেবলমাত্র পরে নিচে নামবে এবং এখন খালি-হওয়া নলে বাইরের বাতাস ঢুকবে। জল বেরুতে থাকলে, এর তল পাত্রে নেমে আসবে। ইত্যবসরে জলের নিচে বায়ুশূন্য স্থান ভরাট করার জন্য বাইরের থেকে বাতাস এসে কাচের নলের মধ্য দিয়ে ঢুকবে। এই বাতাস বুদবুদের আকারে উপরে উঠবে এবং বোতলের উপরের অংশে জমা হবে। এখন *B* ছিদ্রের সমগ্র তলে, চাপ বাতাসের চাপের সমান হবে। ফলে বোতলের ভেতরে ও বাইরে বাতাসের চাপ সমান হওয়ায়, *BC* জল-তলের চাপেই *C* ছিদ্র দিয়ে জল বেরিয়ে

আসবে। যেহেতু BC তলের উচ্চতা এক রকম থাকে, জল যে সব সময় একই ভাবে পড়বে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

এবার এই প্রশ্নটার উত্তর করার চেষ্টা কর। এখন প্লাগ্ B—যা নলের প্রান্তের সঙ্গে সমতলে আছে—যদি টেনে দেওয়া হয়, তাহলে জল কত তাড়াতাড়ি বেরুবে? খুবই বিস্ময়ের কথা, জল একেবারেই পড়বে না। অবশ্য নলটা যদি এত ছোট হয় যে, একে উপেক্ষা করা যায়। অন্যথায় ছিদ্রের প্রসরতার সঙ্গে সূক্ষ্ম উপরের তলটির উচ্চতা সমান হওয়ায় জল এই উপরের সূক্ষ্মতলের চাপে বেরিয়ে আসবে। বস্তুত ভেতরের ও বাইরের চাপ বায়ুমণ্ডলের চাপের সমান এবং সেই জন্যই জল বেরিয়ে আসার কোনো কারণ নেই। কিন্তু প্লাগ A-কে টানলে, যা নলের প্রান্তের উপরে আছে, আমরা দেখব জল পড়ার পরিবর্তে বাইরের বাতাস জলের বোতলের ভেতরে ঢুকছে। কেন? কারণটা অতি সহজ। পাত্রের এই অংশের বায়ু-মণ্ডলের চাপ বাইরের বায়ুমণ্ডলের চাপের চেয়ে কম।

এই অস্বাভাবিক গুণ-সম্পন্ন পাত্রটির আবিষ্কারক বিখ্যাত পদার্থবিদ মেরিয়েটি এবং সেই কারণেই পাত্রটি 'মেরিয়েটির পাত্র' (Meriotte's bottle) নামে খ্যাত।

বাতাসের ভার

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রোজেনস্বার্গের নাগরিকবৃন্দ, জার্মানীর রাজ-পুত্রেরা এবং সর্বোপরি সম্রাট স্বয়ং নিম্নলিখিত বিস্ময়কর খেলাটি দেখলেন। দুটো তামার নির্মিত অর্ধগোলক একেবারে শূন্য করে—এমন কি বায়ুশূন্য করে সংযুক্ত করা হল। এবং তারপর 16টি ঘোড়া—দু'ধারে আটটি আটটি করে, প্রাণপণে টেনে ওটা খুলতে চেষ্টা করল। কিন্তু দেখা গেল ওরা অর্ধগোলক দুটিকে কিছুতেই পৃথক করতে পারছে না। বার্গোমাস্টার অটো ভন গেরিক, যাঁকে 'জার্মান গ্যালিলিও'-ও বলা হয়, সকলের জন্য প্রমাণ করে দেখালেন যে, 'বায়ু একেবারে কিছু নয়' নয়, এরও ভার আছে এবং পৃথিবী পৃষ্ঠে বাতাস যথেষ্ট চাপ দেয়।

1654 খ্রীষ্টাব্দের 8ই মে এই পরীক্ষাটি জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। রাজনৈতিক ভুল বোঝাবুঝি ও সমকালীন ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ সত্ত্বেও বিদ্বান বার্গো-মাস্টার তাঁর এই পর্যবেক্ষণ দ্বারা সকলকেই মুগ্ধ করেন।

পদার্থবিদ্যার সকল পাঠ্যপুস্তকে এর বর্ণনা থাকলেও, আমি নিশ্চিত যে, স্বয়ং গেরিকের কাছ থেকেই গল্পটা শুনতে তোমাদের আপত্তি হবে না। 1672 খ্রীষ্টাব্দে আমস্টারডামে লাতিন ভাষায় রচিত তাঁর সমস্ত পরীক্ষাগুলির বিবরণের এক স্ফীতকায় গ্রন্থ রক্ষিত হয়। সমসাময়িক সমস্ত গ্রন্থাবলীর মত এই গ্রন্থের শিরোনাম খুব গুরুগম্ভীর। তা হল:

অটো ভন গেরিক

বায়ু শূন্য স্থানে
তথাকথিত নতুন ম্যাগডিবার্গ পরীক্ষাবলী
মূল বর্ণনা ঃ কাসপার শোট,
উর্জবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক।
আরও বৃহদাকারে এবং অনেক নতুন পরীক্ষা সম্বলিত হয়ে
স্বয়ং গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত।

23 অধ্যায়ে উল্লিখিত পরীক্ষাটির কথা বলা হয়েছে। এখানে সেটা উদ্ধৃত হল ঃ

"একটি পরীক্ষা যাতে দেখানো হচ্ছে যে, বাতাসের চাপ দুটি অর্ধগোলককে এত শক্তভাবে সংযুক্ত করে রাখে যে, 16টি ঘোড়াও ও দুটোকে টেনে খুলতে পারে না।

"আমি দুটো 550 মি.মি. ব্যাসবিশিষ্ট তিন-চতুর্থাংশ ম্যাগডিবার্গ এল-এর তামার অর্ধগোলক তৈরি করার নির্দেশ দিলাম। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু অর্ধগোলক দুটি ছিল 67'100-এল ব্যাসবিশিষ্ট, কারণ কারিগররা, তাদের স্বভাববশতই, প্রকৃতপক্ষে যেমনটি প্রয়োজন তেমনটি করতে পারল না। দুটো অর্ধগোলকই ছিল সর্বদিক থেকে একই রকম। একটার গায়ে ছিল একটা বাতাস নিষ্কাশন করার জন্য স্টপ্‌কক্‌। ওটা বাইরের বাতাস প্রবেশেও বাধা দিত। ঘোড়ার গলার বেল্টের সঙ্গে বাধার জন্য দুটো অর্ধগোলকেরই চারটি আংটা ছিল। আমি একটা চামড়ার আংটা তৈরিরও নির্দেশ দিয়েছিলাম যেটা আমি প্যারাফিন ও টারপেনটাইন তেলে শোষণ করে নিয়েছিলাম। আমি এই আংটাটা দুটো অর্ধগোলকের মধ্যে আটকানোর জন্য ব্যবহার করলাম যাতে বাতাস না ঢোকে। তারপর একটা বায়ু-নিষ্কাশন পাম্পের মুখ স্টপককের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হল, এবং অর্ধগোলকের ভেতরের বাতাস বার করে দেওয়া হল। চামড়ার আংটার সাহায্যে যে বলে অর্ধগোলক পরস্পর সংযুক্ত হয়ে রইল, তা এবার স্পষ্ট হল। বাইরের বাতাসের চাপ তাদের এমন প্রচণ্ডভাবে চেপে আটকে রাখল যে, ষোলটি ঘোড়া তাদের দু'পাশ থেকে টেনে খুলতে পারল না বা খুবই কষ্টে খুলল। যখন অর্ধগোলক দুটো ঘোড়াদের টানে খুলে গেল এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হল, তখন এমন প্রচণ্ড শব্দ হল যে, মনে হল, যেন গুলি ছোঁড়া হয়েছে। অথচ স্টপ্‌কক্‌টিকে একবার মাত্র ঘুরিয়ে যেই গোলকের মধ্যে বাইরের বাতাস মুক্তভাবে প্রবেশের সুযোগ করে দেওয়া হল অমনি কেবলমাত্র হাতের সাহায্যেই অর্ধগোলক দুটি সহজেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।"

একটু স্মরণ করলেই দেখা যাবে এত প্রচণ্ড বলের (এক একদিকে আটটি ঘোড়া) কেন প্রয়োজন হল শূন্য গোলকটির দুটি অর্ধ পৃথক করার জন্য। বাতাস প্রতি বর্গ সেণ্টিমিটারে প্রায় এক কিলোগ্রাম চাপ দেয়। 0·67 এল (37 সে.মি.) ব্যাসের বৃত্তের ক্ষেত্রফল হল 1,060 বর্গ সে.মি.। (আমরা অর্ধ-গোলকের পৃষ্ঠতলের পরিবর্তে বৃত্তের ক্ষেত্রফল নিচ্ছি, তার কারণ, বাতাসের চাপ উল্লিখিত মানের সমান হয় যখন তা কোনো তলের উপর লম্বভাবে ক্রিয়া করে, নততলে এই চাপ কম। আমাদের প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আমরা গোলকের পৃষ্ঠতলের লম্বাভিমুখী প্রক্ষেপ (Projection) নিই, বা, অন্য কথায়, বড় বৃত্তটার ক্ষেত্র-ফল গ্রহণ করি।) ফলে প্রতিটি অর্ধগোলকের উপর বাতাসের চাপ 1,000 কে.জি. বা 1 টনের বেশি হবে। এর অর্থ বাইরের বাতাসের চাপের সঙ্গে পাল্লা দিতে হলে আট-ঘোড়ার দুটো দলকে 1 টন বলে টানতে হবে।

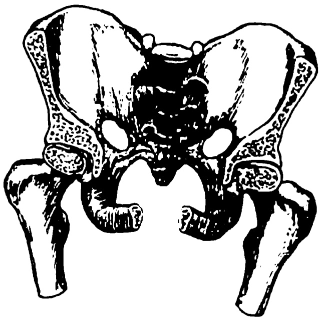
এখন 1 টন এতগুলো ঘোড়ার পক্ষে খুব একটা ভারী ওজন বলে মনে হয় না। অবশ্য ভুলে যেও না যে, যখন ঘোড়াগুলো এক টন বোঝা টানে, তাদের এক টন নয়, অনেক কম বল অতিক্রম করতে হবে। চাকাগুলোর ও অক্ষ-দণ্ডের মধ্যেকার, এবং তাদের ও রাস্তার মধ্যেকার ঘর্ষণজনিত এই বল, উদাহরণ স্বরূপ, বড় রাস্তায়, সমস্ত টানা বোঝার মাত্র 5 শতাংশ—অর্থাৎ এক টন ওজনের ক্ষেত্রে মাত্র 50 কে.জি. (বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেছে যখন আটটি ঘোড়া একত্রে টানে তখন টানের বল অর্ধপরিমাণ কমে যায়)। ফলে আট ঘোড়ার পক্ষে এক টন টানের বল 20 টন গাড়ির ভারের সদৃশ। বাতাসের এই ভারই ম্যাগডিবার্গ বার্গোমাস্টারের ঘোড়াদের টানতে হয়েছিল। রেলের উপর নয় রাস্তার উপরের ছোট একটা ইঞ্জিন যে ভার টানে এই ঘোড়াদের সেই ভার নাড়াতে হয়েছিল।

একটা স্বাস্থ্যবান ঘোড়া (ঘণ্টায় 4 কি.মি. বেগে চললে) 80 কে.জি. টানের বল প্রয়োগ করতে পারে। একটা ঘোড়া গড়ে নিজের ভারের 15 শতাংশ টানের বল প্রয়োগ করতে পারে। রেসের ঘোড়ার ভার প্রায় 400 কে.জি. এবং হৃষ্টপুষ্ট ঘোড়ার ওজন প্রায় 750 কে.জি.। প্রাথমিক বল, খুবই অল্প সময়ের জন্য, এই টানের বল কয়েকগুণ বেশি হতে পারে। সুতরাং ম্যাগডিবার্গ অর্ধগোলক দুটিকে পৃথক করতে হলে আমাদের প্রয়োজন প্রত্যেকদিকে 1,000 ঃ 80 = 13টি ঘোড়া।

তোমরা জেনে বিস্মিত হবে যে, আমাদের কঙ্কালের কোনো কোনো যুক্ত অংশ জোড়া লেগে আছে এই একই কারণে। আমাদের শ্রোণীচক্র (Pelvis) এই ম্যাগডিবার্গ অর্ধগোলকের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। এর পেশী ও গ্রিস্টল, (Gristle) যা একে সংযুক্ত করে রেখেছে তা সরিয়ে নিলেও এটা তখনও স্বস্থানে

থেকে যাবে। এর যন্ত্র অংশগুলোর মধ্যে কোনো বাতাস নেই—বাতাসের চাপই এই দুঃসাধ্য সাধন করে।

চিত্র 57

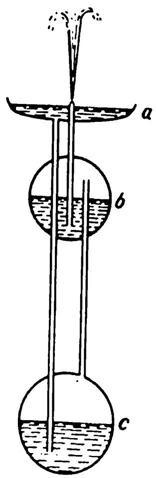


ম্যাগডিবার্গ অর্ধগোলক দুটির মতই বাতাসের চাপ শ্রোণীচক্রের (Pelvis) সংযুক্তি সাধন করে।

হেরনের ঝরনার পুনর্বিন্যাস

তোমরা খুব সম্ভবত জানো, আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাচীন গণিতবিদ হেরনের উদ্ভাবিত ঝরণাটা দেখতে কেমন ছিল। যাই হোক, এই বিস্ময়কর কৌশলটির সর্ব-

চিত্র 58

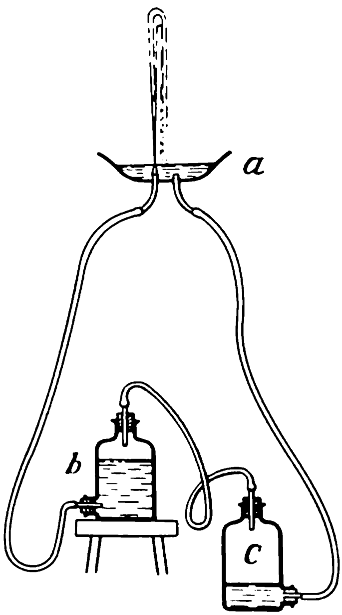


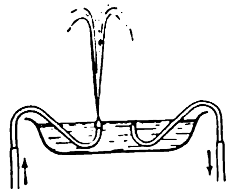
হেরনের ঝরনার প্রস্থচ্ছেদ।

শেষ সংস্কারটি বর্ণনা করার আগে আমি এর প্রধান প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয়গুলোর সম্বন্ধে তোমাদের একবার স্মরণ করিয়ে দেব। হেরনের ঝরণাটি ছিল তিনটি

পাত্রবিশিষ্ট। উপরের পাত্র *a* হল একটা থালার মত পাত্র আর *b* ও *c* পাত্র দুটি বায়ুনিরুদ্ধ গোলকাকারের (চিত্র 58)। তিনটি পাত্রই, চিত্রে যেমন দেখানো হয়েছে, তিনটি নল দ্বারা যুক্ত। ঝরণাটা কাজ করতে শুরু করে যখন *a* পাত্রে সামান্য জল থাকে, পাত্র *b* থাকে জলে পূর্ণ, এবং পাত্র *c* থাকে বাতাসে ভরা। নলের পথ দিয়ে জল *a* পাত্র থেকে *c* পাত্রে যায় এবং বাতাসকে ঠেলে *b* পাত্রে প্রবেশ করায়। অনুপ্রবেশকারী বাতাসের চাপ জলকে *b* পাত্র থেকে দ্রুত নলের পথে ঠেলে ওঠাবে এবং *a* পাত্রের উপর খেলাবে। ঝরণাটার খেলা শেষ হয়ে যাবে যখনই *b* পাত্রের সমস্ত জল বেরিয়ে যাবে। এইভাবে হেরনের সময় ঝরণাটা কাজ করত।

চিত্র 59



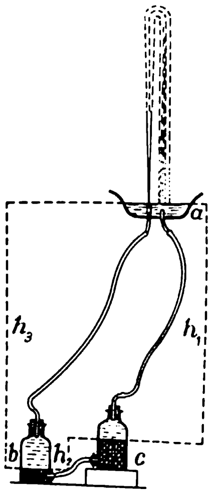


বর্তমানে সংশোধিত হেরনের ঝরনার প্রস্থচ্ছেদ। উপরে: পাত্রটির উপরের অংশ।

আরও আধুনিক কালে, জনৈক ইতালীয় পদার্থবিদ্যার শিক্ষক, স্কুলের পরীক্ষাগার সজ্জিত করার সময় কিছু কলাকৌশল প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হয়ে, এই ঝরণাটার সরল রূপ দেন এবং এর সংস্কার সাধন করেন। খুব সহজেই

অনায়াসে তোমরাও এটা তৈরি করে নিতে পার (চিত্র 59)। গোলকাকৃতির পাত্র এবং কাচ বা ধাতব নলের পরিবর্তে তিনি ফ্লাস্ক এবং রবারের নল ব্যবহার করেন। উপরের পাত্রটির নিচে ছিদ্র থাকার প্রয়োজন নেই। 59 নং চিত্রের উপরের অংশে যেমন দেখানো হয়েছে, নলগুলো পাত্রের গায়ে দোলায়মান অবস্থায় থাকতে পারে।

চিত্র 60



পারদ চাপ বিশিষ্ট ঝরনার প্রস্থচ্ছেদ। পারদতলের প্রভেদের দশগুণ উচ্চে ঝরনার জল উঠছে।

সমস্ত জল *b* ফ্লাস্ক থেকে *a* পাত্র হয়ে *c* ফ্লাস্কে যাওয়ায় এটা ব্যবহার করার অনেক সুবিধে। *b* এবং *c*-এর পরিবর্তন সাধন করেও ঝরণাটিকে পুনরায় চালু করা যায়। অবশ্য, তুমি যখন এটা করবে, নলের মুখটার পুনর্বিন্যাস করতে ভুলো না। আরও একটা সুবিধা হল, ঝরণার উচ্চতার কি পরিবর্তন হয় বিভিন্ন জল-তল অনুযায়ী তাও পাত্র দুটির ইচ্ছামত পরিবর্তন সাধন করে আমরা দেখতে পারি।

ঝরণার উচ্চতা আরও কয়েক গুণ বাড়াতে চাইলে, তোমাকে ফ্লাস্ক দুটি জল ও বাতাসের পরিবর্তে পারদ ও জল দিয়ে পূর্ণ করতে হবে (চিত্র 60)। তুমি স্পষ্টই দেখতে পাবে *c* থেকে *b*-তে যাবার সময় পারদ ঝরণার জলকে সরিয়ে দেবে। পারদ জলের চেয়ে 13·5 গুণ ভারী জেনে, তুমি ঝরণার উচ্চতা নির্ণয় করতে পারবে। বিভিন্ন তলগুলিকে h_1, h_2 এবং h_3 দ্বারা সূচিত কর। এখন দেখা যাক কোন বল পারদকে *c* থেকে *b*-তে যেতে বাধ্য করছে

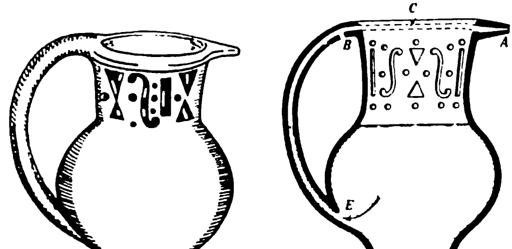
(চিত্র 60)। সংযোগকারী নলে পারদ দুই পার্শ্ব থেকে চাপের সম্মুখীন হবে। একটা h_2-র চাপ—পারদ স্তম্ভের তলের প্রভেদ (যা 13·5 গুণ উচ্চ জলস্তম্ভের চাপের সমান, অর্থাৎ 13·5 h_2) এবং h_1 জলস্তম্ভ দ্বারা প্রদত্ত চাপের সমষ্টি। ডানদিক থেকে এই হল প্রদত্ত চাপ। বামদিকে h_3 জলস্তম্ভ দ্বারা চাপ প্রযুক্ত হচ্ছে। ফলে পারদের উপর প্রযুক্ত বল হল ঃ 13·5 $h_2 + h_1 - h_3$। কিন্তু যেহেতু $h_3 - h_1 = h_2$, $h_1 - h_3$ পরিবর্তে $-h_2$ বসিয়ে আমার পাই 13·5 $h_2 - h_2$, অর্থাৎ 12·5 h_2। অতএব পারদ 12·5 h_2 উচ্চতা বিশিষ্ট জলস্তম্ভের চাপে b ফ্লাস্কে প্রবেশ করবে। অংকের দিক থেকে তাহলে, ঝরণা দুই ফ্লাস্কের পারদ-তলের প্রভেদের 12·5 গুণ সমান উচ্চতায় উঠবে। কিন্তু ঘর্ষণের ফলে প্রকৃত উচ্চতা এর থেকে কিছু কম হবে।

এই কৌশল, অবশ্য উচ্চ ঝরণা লাভের এক সুবিধাজনক উপায়। 10 মিটার উচ্চ ঝরণা সৃষ্টির জন্য একটা ফ্লাস্ককে মোটামুটিভাবে অপর ফ্লাস্কের চেয়ে 1 মিটার উচ্চে রাখলেই হবে। অবশ্য খুবই অদ্ভুত ব্যাপার যে, অন্য পারদ-পূর্ণ ফ্লাস্কগুলোর চেয়ে a পাত্রটিকে আরও উচ্চে তুললে, আমাদের গণনা থেকেই বোঝা যাচ্ছে, ঝরণার উচ্চতার বিন্দুমাত্র হের-ফের হবে না।

'ভিজে যেও না'

পূর্বে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে সম্ভ্রান্ত বংশীয় মানুষেরা নিম্নলিখিত শিক্ষাপ্রদ খেলনাটি নিয়ে মজা করতেন। খেলনাটি ছিল একটা মগ বা একটা

চিত্র 61



'ভিজে যেও না''—অষ্টাদশ শতাব্দীর পানপাত্র এবং এর রহস্য

ছোট কলসী যার উপরে কারুকার্য-করা বড় বড় গর্ত। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা নিম্নশ্রেণীর অতিথিকে মদে পূর্ণ এই রকম পাত্র দিতেন, যার মধ্য দিয়ে শাস্তি থেকে অব্যাহতির মাসুল জোগাত তারাই। বস্তুত, এর থেকে লোকে পান করবে

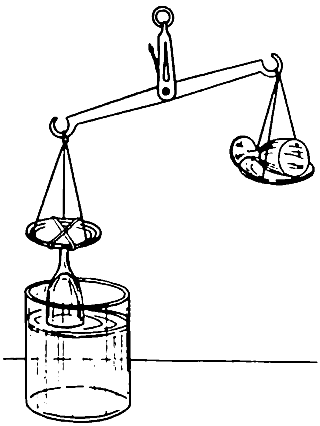
কেমন করে? এটাকে কাত করা যাবে না, কারণ তা হলে উপরের বড় বড় গর্ত দিয়ে সব মদ পড়ে যাবে এবং এক বিন্দুও ঠোঁটে পৌঁছবে না।

অবশ্য রহস্যটা যারা জানে—ডান দিকের 61 নং চিত্রে যেমন দেখানো হয়েছে—তারা আঙুল দিয়ে উপরের *B* গর্তটা বন্ধ করে নেবে এবং পাত্রটিকে না হেলিয়ে নল দিয়ে শুষে মদ পান করে যাবে। এইভাবে মদ *E* গর্ত দিয়ে উপরে উঠবে, হাতলের নল বেয়ে যাবে এবং সেখান থেকে, যতক্ষণ না মুখের নলে আসছে, মগের উপরের বেড় বেয়ে *c* বরাবর আসবে। আজও সোভিয়েত দেশে কুমোরদের এই কৌতুক প্রচলিত আছে। গায়ে "পান কর কিন্তু ভিজে যেও না" কথাগুলো খোদাই করা এমন কিছু পাত্র আমি নিজেই দেখেছি।

উল্টানো গ্লাসের জলের ওজন কত?

তোমরা বলবে, কিছুই না, যেহেতু জল নিশ্চয়ই সব পড়ে যাবে। কিন্তু মনে কর জল পড়ে গেল না? জল না ফেলে উপুড় করা গ্লাসে ধরে রাখতে পার।

চিত্র 62



কোন পাত্রটি অধিকতর ভারী?

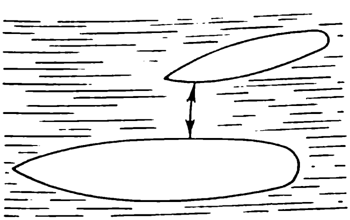
62 নং চিত্রে দেখানো হয়েছে কি ভাবে এটা করা যায়। পাল্লার একটা পাত্রের নিচে উপুড় করা মদের গ্লাসটা জলে ভর্তি, অথচ জলের জারে ওর পাড়টা ডোবান আছে বলে জল পড়ে যাচ্ছে না। পাল্লার অপর পাত্রটিতে অনুরূপ আকারের একটা খালি মদের গ্লাস রয়েছে। এখন দুটো গ্লাসের মধ্যে কোনটা বেশি ভারী? পাল্লার সেই পাত্রটি ওজনে বেশি ভারী হবে যার সঙ্গে জলপূর্ণ উপুড় করা মদের গ্লাসটি রয়েছে, কারণ উপর থেকে উভয় গ্লাসই একই

বাতাসের চাপের সম্মুখীন হলেও, নিচ থেকে মদের গ্লাসের জলের ওজনের সমান বাতাসের চাপ হ্রাস পাবে। পাল্লার ভারসাম্য বজায় রাখতে হলে পাল্লার অপর পাত্রের গ্লাসটিকে জলপূর্ণ করতে হবে। ফলে উপুড় করা গ্লাসের জলের ওজন সোজাভাবে খাড়া করে রাখা গ্লাসের জলের ওজনের সমান হবে।

জাহাজ একে অন্যকে আকর্ষণ করে কেন ?

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে তৎকালীন পৃথিবীর বড় বড় জাহাজগুলির মধ্যে অন্যতম ওশান লাইনার (Ocean liner) 'অলিম্পিক' মাঝ সাগরে যখন অগ্রসর হচ্ছিল, তখন অপেক্ষাকৃত অনেক ছোট একটি জাহাজ, ক্রুজার 'হক' (Hawk) একশ' মিটার দূরের সমান্তরাল পথে তার দিকে দ্রুত ছুটে আসতে লাগল। দুটো জাহাজ যেই মাত্র তাদের অবস্থান বেছে নিল, 63 নং চিত্রে যেমন দেখানো হয়েছে, অমনি ঘটল এক বিস্ময়কর ঘটনা। জাহাজ 'হক' খুব তীব্রভাবে তা গতিপথ পাল্টে ফেলল, যেন সে কোনো অদৃশ্য বলের অনুসরণ করছে এবং মস্ত লাইনারটার দিকে ফিরে গেল ও তার হালের দিকে দৃক্‌পাত না করেই ধাক্কা খেল। আঘাতটা এত প্রচণ্ড হয়েছিল যে, ঐ ধাক্কায় অলিম্পিকের কাঠামোয় গভীর ক্ষত সৃষ্টি হল। এই অদ্ভুত বিষয়টা নিয়ে বিচারক মণ্ডলী বসল এবং অলিম্পিকের স্কীপারকে দোষী সাব্যস্ত করল, কারণ তাদের বিচারে সে 'হক'-কে পথের অধিকার সংক্রান্ত নির্দেশ দিতে ভুল করেছে। সুতরাং তোমরা যে তথ্য সংগ্রহ করতে পারছ, বিচারকমণ্ডলী এই ঘটনার মধ্যে অসাধারণ কিছুই লক্ষ্য করেন নি। সেই কারণেই তাঁরা স্কীপারের অবহেলার উপরই দুর্ঘটনাটা চাপিয়ে দিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা একটা সম্পূর্ণ অদৃষ্টপূর্ব ঘটনার ফল, সাগরে জাহাজের পরস্পরের আকর্ষণের বিষয়।

চিত্র 63



'অলিম্পিক' 'হক'-এর মধ্যে ধাক্কা লাগার পূর্বের অবস্থা।

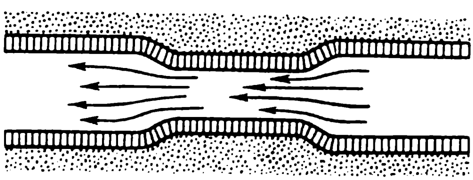
দুটি জাহাজ পরস্পর সমান্তরাল পথে থাকলে, এ ঘটনা আগেও ঘটতে পারত। জাহাজ দুটো ছোট হলে, তাদের পারস্পরিক আকর্ষণ ততটা ধরা পড়ে না। কিন্তু ইদানীংকালে, যখন ভাসমান নগরী সাগরে চলেছে, এটা

অনেক বেশি স্পষ্ট এবং যুদ্ধ জাহাজের অধিনায়কেরা জাহাজ চালনা করার সময় এর প্রতি যথাযথ দৃষ্টি রাখেন। খুব সম্ভবত সন্নিকটে চলার সময় অনেক ছোট ছোট নৌকার বড় বড় জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা লাগার কারণ হিসেবে একেই দোষী করা যায়।

কি কারণে এই আকর্ষণ ঘটে? নিউটনের চিরন্তন মাধ্যাকর্ষণ সূত্রের সঙ্গে অবশ্য, এর কোনো সম্পর্ক নেই। 4র্থ অধ্যায় থেকে আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি যে, এই আকর্ষণ নগণ্য। সম্পূর্ণ অন্য কারণে এমনটি ঘটে: নলের এবং খালের মধ্যে তরল পদার্থের প্রবাহ যে সূত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাই এই আকর্ষণ ঘটায়। প্রমাণ করা যায় যে, তরল পদার্থ কোনো খালের সরু ও মোটা অংশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হবার সময়, তরল পদার্থ সরু অংশের মধ্য দিয়ে অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতিতে প্রবাহিত হবে এবং খালের গাত্রে অপেক্ষাকৃত কম চাপ দেবে, খালের মোটা অংশের চেয়ে যেখানে প্রবাহ অনেক শান্ত এবং খালের গাত্রের চাপ অপেক্ষাকৃত কম। এই নিয়ম 'বারনৌলির নীতি' (Bernoulli Principle) নামে খ্যাত।

গ্যাসের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। অবশ্য এক্ষেত্রে পদার্থবিদ, যিনি এটা আবিষ্কার করেন তাঁর নামানুসারে একে বলা হয় ক্লিমেন্ট-ডিসোরমেস (Clement-Desormes)-এর প্রভাব। অনেক সময় গ্যাসের এই নীতি বায়বীয় পদার্থের স্থিতি সম্বন্ধীয় আপাত বিরোধী সত্য (Aerostatical Paradox) রূপে পরিচিত। কথিত আছে এই ঘটনা নিম্নলিখিত বিষয়ে হঠাৎ আবিষ্কৃত হয়। ফ্রান্সের একটা খনিতে জনৈক মজুরকে অধিক চাপ যুক্ত বাতাস স্যাফটের যে ছিদ্র দিয়ে খনিতে

চিত্র 64



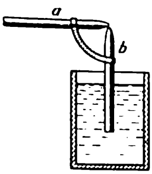
অপেক্ষাকৃত সরু প্রস্থচ্ছেদ বিশিষ্ট সুড়ঙ্গে জল দ্রুততর যায় এবং সুড়ঙ্গপাটে অপেক্ষাকৃত কম চাপ দেয়।

ঢোকে তা বোর্ড দিয়ে বন্ধ করতে বলা হয়। মজুরের পক্ষে কাজ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। স্যাফটের ভিতর দিয়ে সংকীর্ণমুখে বাতাস যে তীব্রবেগে প্রবাহিত হচ্ছিল তার সঙ্গে তাকে সংগ্রাম করতে হয়। হঠাৎ বোর্ডটা এমন প্রচণ্ড শব্দ করে স্যাফটটা চেপে ধরল যে, ওটা যদি অত বড় না হত তাহলে কর্তব্যপরায়ণ শ্রমিকটি সমেত ওটা বায়ুনিষ্কাশনের ভেন্টিলেসান স্যাফটকেও টেনে নিত।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, গ্যাসীয় পদার্থের প্রবাহের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য অ্যাটো-মাইসার (Atomiser) কিভাবে কাজ করে তা উদ্ঘাটিত করে।

আমরা যখন সরু মুখে গিয়ে যা শেষ হয়েছে এমন *a* নলে ফুঁ দিই (চিত্র 65), এর অভ্যন্তরের বাতাসের চাপ কমে যায়। ফলে *b* নলের সরু মুখের উপরে বাতাসের চাপ কম হয়ঃ সেই কারণেই বাতাসের চাপ গ্লাসের তরলকে নলের মধ্য দিয়ে ঠেলে উপরে তোলে। যখন সরু মুখের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে তখন তরল পদার্থটি বাতাসের সূক্ষ্ম আকারে পারমাণবিক আকার নেয়।

এখন আমরা বুঝতে পারব জাহাজ কেন পরস্পরকে আকর্ষণ করে। সমান্তরাল পথের দুটো জাহাজের ক্ষেত্রে, আমরা তাদের মধ্যবর্তী এক জলযোজক পাই ; তফাতটা কেবল এই যে, সাধারণ জলযোজকের ক্ষেত্রে যেখানে যোজকের দেওয়াল থাকে স্থির এবং জল প্রবাহিত হয়, এখানে জল থাকে স্থির এবং দেওয়ালই চলে। এই প্রভেদ, অবশ্য, বলসমূহের ক্রিয়ার আদৌ কোনো পরিবর্তন

চিত্র 65 

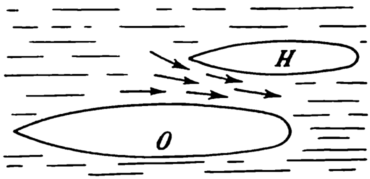
অ্যাটোমাইসার (Atomiser)-এর বিধি।

ঘটায় না। চলমান জলযোজকের সংকীর্ণ অংশে জল অন্যান্য অংশগুলোর চেয়ে কম বল প্রয়োগ করে। অন্যভাবে বলা যায়, জাহাজের সম্মুখবর্তী দিক-গুলো অপর অপর বাইরের দিকগুলোর তুলনায় কম চাপের সম্মুখীন হয়। তখন কি ঘটে? বাইরের দিকের জলের চাপ জাহাজগুলিকে পরস্পরের কাছে আসতে বাধ্য করে। স্বভাবতই এর ফলে, অপেক্ষাকৃত ছোট জাহাজই বেশি দ্রুত বড় জাহাজের সম্মুখীন হয়। বড় জাহাজটি চলছে বলে মনেই হয় না। এই কারণেই আকর্ষণ এত প্রবল হয় যখন বড় জাহাজ দ্রুত ছোট জাহাজকে অতিক্রম করে যায়।

সুতরাং মোট কথা, জাহাজের পারস্পরিক আকর্ষণ জলপ্রবাহের শোষণের ফলে ঘটে। এটা স্নানার্থীদের ঘূর্ণিজলে দ্রুত বিপদের ও শোষণের সম্মুখীন করে তোলে। হিসেব করে দেখা গেছে, সেকেণ্ডে কমবেশি এক মিটার বেগে ধাবমান জলপ্রবাহ মানুষকে 30 কে.জি. বলে টানে। তোমার নিজের ভার যখন তোমার ভারসাম্য রক্ষা করতে বাধা দেয়, তখন বিশেষ করে জলের মধ্যে

এত শক্তিশালী বলকে বাধা দেওয়া সহজ নয়। পরিশেষে, দ্রুতগামী ট্রেনের শোষণও ঐ একই বারনৌলির নীতিতে ঘটে। ঘণ্টায় 50 কি.মি. বেগে ধাবমান ট্রেন প্রায় 8 কে.জি. বলে পার্শ্বে দণ্ডায়মান কোনো ব্যক্তিকে আকর্ষণ করবে।

চিত্র 66



চলমান দুটি জাহাজের মধ্যে প্রবাহ।

যদিও ব্যাপারটা সচরাচর ঘটে না এমন নয়, তবুও সাধারণ লোক বারনৌলির নীতির সঙ্গে যুক্ত এই ঘটনা সম্বন্ধে খুব অল্পই জানে। সুতরাং আমি মনে করি এ বিষয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করলে উপকার হবে। জনপ্রিয় বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকার জন্য এই বিষয়ের উপর লেখা একটি প্রবন্ধের মূল অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হল।

বারনৌলির নিয়ম এবং তার ফলাফল

1726 খ্রীষ্টাব্দে বারনৌলি সর্বপ্রথম এই নিয়মের ব্যাখ্যা দেন। নীতিটি হল এই ঃ বাতাসে বা জলে চাপ বাড়ে প্রবাহের বেগ কমলে এবং চাপ কমে বেগ বাড়লে। এই নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও আমরা সেটা এখানে আলোচনা করবো না।

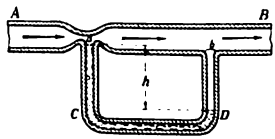
67 নং চিত্রে এই নীতি দেখানো হয়েছে।

AB নলের মধ্য দিয়ে বাতাস বেগে ঢোকানো হল। ***a*** খাঁজের কাছে বাতাসের বেগ বেশি এবং স্ফীতকায় অংশ ***b***-তে বেগ কম। যেখানে বেগ বেশি, চাপ সেখানে কম এবং বিপরীত ক্রমে বেগ যেখানে কম সেখানে চাপ বেশি। ***a***-র কাছে চাপ কম হওয়ায়, ***c*** নলের তরল উপরে ওঠে এবং ইতিমধ্যে ***b***-র কাছে অতিরিক্ত চাপ ***D*** নলের তরলকে নিচে নামিয়ে দেয়।

68 নং চিত্রে ***T*** নলটিকে ***DD*** থালার উপর রাখা হয়েছে ; ***T*** নলের মধ্য দিয়ে বাতাস বেগে ঢোকানো হল এবং অসংলগ্ন থালা ***dd*** পর্যন্ত পাঠানো হল। (পরীক্ষাটা সহজ করার জন্য একটা ব্যবহৃত স্পুল এবং একটি কাগজের থালা নিয়ে স্পুলের (Spool) গর্তের মধ্য দিয়ে পিনের সাহায্যে যথাস্থানে রাখা হল)। এই দুই থালার মধ্যের বাতাসের বেগ অত্যন্ত বেশি। কিন্তু বায়ু প্রবাহের

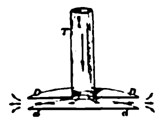
প্রস্থচ্ছেদ খুব শীঘ্র গড়ে ওঠায় এবং থালা দুটির মধ্যবর্তী স্থান থেকে বহিরাগত বাতাসে গতি-জাড্য (Inertia) অতিক্রম করতে হওয়ায়, বাতাসের এই বেগ, যতই

চিত্র 67



বারনৌলির নিয়মের দৃষ্টান্ত। A B নলের A-প্রান্তে অপেক্ষাকৃত স্ফীতকায় অংশ (b) -এর চেয়ে চাপ কম।

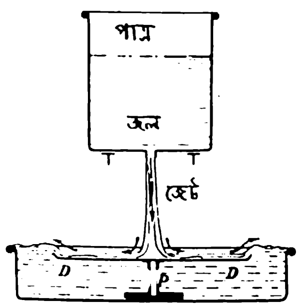
চিত্র 68



থালার পরীক্ষা।

থালার প্রান্তদেশে আসবে ততই দ্রুত কমে আসবে। অবশ্য, থালার চারি-পাশের বাতাসের বেগ কম হওয়ায় এর চাপ বেশি হবে এবং বাতাসের বেগ, বিপরীতক্রমে থালা দুটির মধ্যে বেশি হওয়ায় এর চাপ কম হবে। এইভাবে বাইরের বাতাসের চাপ অপেক্ষাকৃত বড় বলে, যত দ্রুত বাতাস *T* দিয়ে ঢোকানো হবে ততই বাইরের বাতাসের চাপ জোরে থালা দুটিকে চেপে ধরবে।

চিত্র 69



তীব্রবেগে জলধারা নেমে এলে DD থালা P দণ্ড বেয়ে উপরে উঠবে।

69 নং চিত্র 68 নং চিত্রেরই অনুরূপ, প্রভেদ শুধু এই যে, এটা জল নিয়ে দেখানো হয়েছে। ***DD*** থালার উপরের অংশে দ্রুতগামী জল অপেক্ষাকৃত নিচু তলায় থাকে। কেবলমাত্র থালা ছাপিয়ে উঠলে ট্যাঙ্কের উচ্চতর স্থির জলের

তলে ওঠে। সুতরাং থালার উপরের অংশের দ্রুতগামী জলের চেয়ে স্থির জল অপেক্ষাকৃত বেশি চাপ দেয় এবং ফলে থালাটি উপরে ওঠে। (*P* দণ্ড থালাটিকে তার অবস্থানে রাখবে।)

70 নং চিত্রে বাতাসের জেট (Jet)-এ ছোট একটা পীচবল ভাসছে দেখানো হয়েছে। বাতাস বলটার গায়ে গিয়ে আঘাত করছে এবং একে পতন থেকে

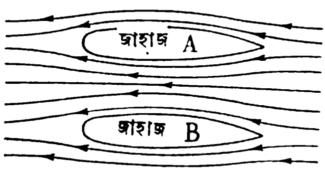
চিত্র 70



বাতাসের জেট (Jet) বায়ুমণ্ডলের মধ্যে ছোট বলটাকে ধরে আছে।

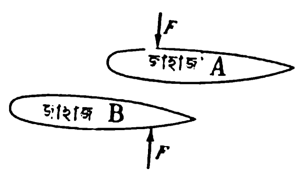
রক্ষা করছে। ইতিমধ্যে বলটা যদি পাশে বেরিয়ে যায়ও, বাইরের বাতাসের চাপ, এর গতিবেগ কম বলে, অপেক্ষাকৃত বেশি হওয়ায় ঐ অতিরিক্ত চাপের বাতাস বলটাকে আবার ঠেলে বাতাসের জেট (Jet)-এর কাছে পাঠাবে।

চিত্র 71



সমান্তরাল পথে চলমান দুটি জাহাজ পরস্পরকে টানে।

চিত্র 72



A জাহাজটি যখন অগ্রবর্তী হয় B জাহাজটির সরুদিক তখন A জাহাজের দিকে যায়।

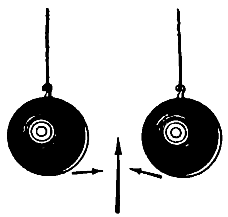
71 নং চিত্র সমান্তরাল পথে দুটি জাহাজের চিত্র প্রদর্শন করছে। জাহাজ দুটি স্থির জলে চলেছে অথবা গতিশীল জলে স্থির দাঁড়িয়ে আছে। উভয়

ক্ষেত্রেই ফল একই দাঁড়াবে। জাহাজ দুটির মধ্যে অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ অংশের গতির বেগ বাইরের জলের গতিবেগের চেয়ে বেশি এবং ফলে এই অঞ্চলের জলের চাপ কম। সুতরাং বাইরের জলের অধিকতর চাপ জাহাজ দুটিকে পরস্পরের নিকটবর্তী হতে বাধ্য করবে। এ বিষয়টা সাগর-নাবিকদের কাছে সুপরিচিত।

72 নং চিত্রে আরও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় দেখানো হয়েছে। এখানে একটি জাহাজ অপরটির চেয়ে সামান্য এগিয়ে আছে। দুটি বল, ***F*** ও ***F***, জাহাজ দুটিকে যা একসঙ্গে চালিত করছে, তাদের ঘোরাতে চেষ্টা করে। ফলে ***B***-জাহাজ ***A***-জাহাজের চারিপাশে উল্লেখযোগ্য বল সমেত ঘুরতে থাকে। এক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে ধাক্কা লাগা অনিবার্য হয়ে ওঠে, যেহেতু এই চলন এত দ্রুত ঘটতে থাকে যে, নাবিকদের পক্ষে পথ পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না।

73 নং চিত্রে যেমন দেখানো হয়েছে, 71 নং চিত্রের বিষয়টি দুটো হালকা ঝুলন্ত রবারের বলের মধ্যের ফাঁকে বাতাস প্রবেশ করিয়ে দেখানো যায়। এ রকম করলে, তারা সংস্পর্শে এসে দুলতে থাকবে।

চিত্র 73



দুটি হাল্কা বলের মধ্যে বাতাসের স্রোত প্রেরণ করলে তারা পরস্পরের সংস্পর্শে এসে দুলতে থাকে।

মাছের পটকা থাকে কেন ?

পটকা মাছের কি কাজে লাগে? সাধারণভাবে বলা হয়, এবং যা যথাযথ কারণেই চিন্তা করা যায়, মাছ জলের উপরে ওঠার জন্য পট্‌কাটা ফোলায়। এই প্রক্রিয়া দেহের আয়তন বাড়ায় এবং এইভাবে মাছের ওজন অপসারিত জলের ওজনের তুলনায় হ্রাস পায়। জলের প্লবতা মাছকে উপরে ওঠায়। মাছ যখন আর উঠতে চায় না বা নামতে চায়, অনুমান করা হয়, এ পট্‌কাটা সঙ্কুচিত করে। এইভাবে আবার সে দেহের আয়তন কমায়, এবং ফলে অপসারিত জলের আয়তনও কমে এবং আর্কিমিডিসের নীতির সঙ্গে সমতা রেখে মাছ আবার জলে ডোবে।

মাছের পট্‌কার এই কাজ—এমন ধারণা সপ্তদশ শতাব্দীর এবং 1675 খ্রীষ্টাব্দে ফ্লোরেনটাইন অ্যাকাডেমির অধ্যাপক বোরেলি (Borelli) সর্বপ্রথম

এটা স্বতঃসিদ্ধ বলে উল্লেখ করেন। দু'শ বছর ধরে নির্দ্বিধায় এটা গ্রহণ করা হয় এবং স্কুলের সকল পাঠ্যপুস্তকে স্থান লাভ করে। বর্তমানকালের পর্যবেক্ষণকে ধন্যবাদ—আজকে তা সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

পট্‌কা নিঃসন্দেহে মাছকে সাঁতার কাটতে সাহায্য করে। কারণ পট্‌কা-বিহীন (পট্‌কা বাদ দিয়ে দিলে) মাছ পাখনার সাহায্যে অনেক কষ্টে নিজেকে ভাসিয়ে রাখতে সমর্থ হয়। যেই মাত্র পাখনা বন্ধ হয়ে যায় অমনি তারা পাথরের মত জলের তলদেশে তলিয়ে যায়।

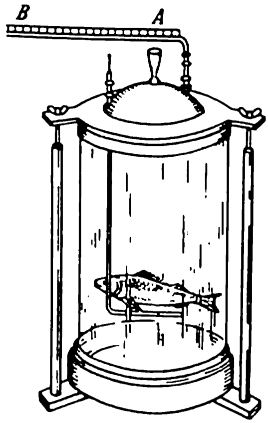
তাহলে পট্‌কার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? পটকা খুবই সীমিত ভূমিকা গ্রহণ করে। পট্‌কা যেখানে মাছের দ্বারা অপসারিত জলের ওজন মাছের নিজের ওজনের সমান সেই গভীরতায় থাকতে সাহায্য করে—পট্‌কা এইটুকুই করে। মাছ যখন পাখনা নেড়ে জলের নিচে নামে তখন চারপাশের জলের প্রচণ্ড চাপেই ওর দেহ এবং পট্‌কা সংকুচিত হয়। এই ঘটনায় মাছের নিজের ওজনের তুলনায় অপসারিত জলের ওজন কম হয় এবং এইজন্য মাছ ডুবে যায়। মাছ যত নিচে যায় চাপ ততই বাড়তে থাকে। প্রতি দশ মিটারে চাপের এই বৃদ্ধি প্রায় এক অ্যাটমস্‌ফিয়ার (Atmosphere)। এর ফলে মাছের দেহ আরও সংকুচিত হতে থাকে, ফলে মাছ আরও দ্রুত ডুবতে থাকে।

উল্টোভাবে, ঠিক একই প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় মাছ যখন ভারসাম্য অবস্থানের জল-তল থেকে পাখনার সাহায্যে নিজেকে উপরে ওঠাতে থাকে। এখন চারি-পার্শ্বস্থ জলের চাপ কমে কিন্তু মাছের পট্‌কা, যেখানে চাপ চারিপার্শ্বস্থ জলের চাপকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়, এর দেহের আয়তন বাড়ায় এবং এর ফলে সে উপরে উঠে আসে। মাছ যত উপরে উঠতে থাকে ততই এর দেহের আয়তনও বাড়ে এবং আরও দ্রুত মাছ উপরে উঠতে থাকে। 'পট্‌কাকে সংকুচিত করে' মাছ এর উত্থান থামাতে পারে না, যেহেতু পট্‌কার দেওয়ালগুলোতে বা গায়ে কোনো পেশী নেই।

নিম্নলিখিত পরীক্ষাটি মাছের দেহের আয়তনের গৌণ সম্প্রসারণের প্রমাণ করেছে (চিত্র 74)। সীল করা জলে পূর্ণ একটা কাচের পাত্রে ক্লোরোফর্মের একটা আস্তরণ রাখা হল। জলে, বিশেষ গভীরতার স্বাভাবিক জলে যেমন ঘনীভূত চাপ থাকে, সেই রকম চাপ সৃষ্টি করা হল। উপরের তলে মাছটা ওর পেট্‌টা উপরের দিকে করে নিষ্ক্রিয়ভাবে পড়ে রইল। যখন চাপ দিয়ে মাছটাকে একটু নিচে নামানো হল, তখন ছেড়ে দিয়ে দেখা গেল ওটা উপরে পুনরায় ভেসে উঠেছে। আবার ঠেলে মাছটাকে একেবারে তলার কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া হল, মাছ একেবারে তলায় ডুবে গেল। এই দুটি তলের মধ্যে, মাছটা আর না ডুবে আর না ভেসে, সাম্যাবস্থায় থাকল। এখন আমার সবেমাত্র বলা মাছের পট্‌কার

গোণ সম্প্রসারণ ও গোণ সঙ্কোচনের বিষয়টা স্মরণ করলেই কারণটা বুঝতে পারবে।

চিত্র 74



ব্লিক (Bleak)-এর পরীক্ষা।

সুতরাং সাধারণ ধারণার বিপক্ষে বলা যায় যে, মাছ ইচ্ছেমত ওর পট্‌কাকে সংকুচিত বা প্রসারিত করতে পারে না। বয়লি মারিওটির নিয়ম (Boyle Mariotte law)-এর সঙ্গে খাপ খাইয়েই, বাইরের জলের লঘু-গুরু চাপের জন্যই মাছের আয়তন গোণভাবে পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তনশীল আকার মাছের দ্রুত গমনের বা দ্রুত উপরে ওঠা বা নিচে নামার ক্ষেত্রে কেবল বিঘ্ন সৃষ্টি করে। মোট কথা, মাছের পট্‌কা, নিশ্চল অবস্থায়, মাছের ভারসাম্য রক্ষায় সাহায্য করে কিন্তু এই ভারসাম্যও স্থায়ী নয়। মাছের সাঁতার কাটার পক্ষে মাছের পট্‌কার এটাই প্রকৃত ভূমিকা। পট্‌কা এখন পর্যন্ত রহস্যই থেকে যাওয়ায়, এর আর অন্য কোনো কার্য আছে বলে আমাদের জানা নেই। মাছের পট্‌কার একমাত্র ঔদস্থিতি (Hydrostatic) ভূমিকাই এ পর্যন্ত সন্তোষজনকভাবে বোঝানো হয়েছে।

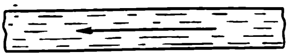
জেলেদের পর্যবেক্ষণও আমার বক্তব্যের স্বপক্ষে রায় দেবে। গভীর জলে মৎস্য শিকারে দেখা যায় যে, মাছ অনেক বড়শী ছিঁড়ে বা জাল ছিঁড়ে পালায়। কিন্তু, আমরা যা আশা করি না, যেখানে ওকে ধরা হয়েছিল সেখানে ও ডোবে না বরং দৌড়ায়, আর তখন পট্‌কাটা প্রায়ই ওর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে।

তরঙ্গ ও ঘূর্ণি

জড়বিজ্ঞানের প্রাথমিক সূত্রাবলী অনেক সাধারণ জড়বিজ্ঞানের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারে না। স্কুলের জড়বিজ্ঞানের পাঠ্যাংশে ঝড়ের সময়ের সাগর-

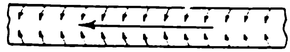
তরঙ্গের মত প্রায়ই দেখা প্রক্রিয়ার পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা মেলে না। নৌকা যখন শান্ত জল কেটে যায়, তখন কি কারণে তরঙ্গ ওঠে? পতাকা কেন বাতাসের দিনে পত্‌পত্‌ করে ওড়ে? সাগরের ধারের বালুরাশি তরঙ্গাকার কেন? চিমনীর থেকে উত্থিত ধোঁয়া পাক খায় বা কুন্ডলী পাকায় কেন?

চিত্র 75



নলের মধ্যে তরলের শান্ত সরলগতি।

চিত্র 76



নলের মধ্যে তরলের অশান্ত দুর্দান্ত গতি।

এই সব ব্যাখ্যা করার জন্য এবং অনুরূপ অন্যান্য প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করার জন্য আমাদের তরলের ও গ্যাসের ঘূর্ণায়মান গতির অদ্ভুত প্রক্রিয়া জানা দরকার। স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে এ সম্বন্ধে প্রায় কোনো উল্লেখই না থাকায় এখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা হল।

মনে কর, নলের মধ্য দিয়ে কোনো তরল পদার্থ প্রবাহিত হচ্ছে। যখন তরলের সমস্ত কণাগুলো নলের মধ্য দিয়ে সমান্তরাল পথে প্রবাহিত হবে তখন আমরা পাই তরলের প্রবাহের সবচেয়ে সরল রূপ—যাকে পদার্থবিদেরা শান্ত বা নিরুপদ্রব প্রবাহ বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু, এমন প্রবাহ সচরাচর ঘটে না। বরং প্রায়ই নলের মধ্য দিয়ে তরলের গতি হয় অশান্ত, নলের গা দিয়ে অক্ষরেখা বরাবর জলকণা ছড়িয়ে পড়ে। ওয়াটার-মেন (Water-mein)-এ আমরা এই ধরনের আবর্ত বা দুর্দান্তগতি লক্ষ্য করি, অবশ্য সরু নলের ক্ষেত্র বাদ দিয়ে, যেখানে আমরা সরল গতিই পাব। নির্দিষ্ট ব্যাসের নলে যখনই তরল পদার্থটির বেগ কোনো এক নির্দিষ্ট মানে পৌঁছায় তখনই আমরা পদার্থটির এই দুর্দান্ত গতি লক্ষ্য করি। বেগের এই নির্দিষ্ট মানকে 'সংকট বেগ' (Critical velocity) বলে। (তরলের এই সংকট বেগ তরলের আঠাল ভাবের সান্দ্রতা (Viscosity)-র সঙ্গে সমানুপাতিকভাবে এবং তরলের ঘনত্ব ও নলের ব্যাসের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতিকভাবে হয়)।

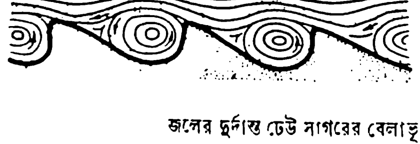
নলের মধ্য দিয়ে যাবার সময় তরল যে আবর্ত সৃষ্টি করে তা একটা সহজ পরীক্ষার সাহায্যে দেখানো যায়। কাচের নলের মধ্যে স্বচ্ছ তরল পদার্থ প্রবাহের সময় কিছু পরিমাণ হালকা কোনো চূর্ণ, উদাহরণ স্বরূপ, লাইকোপোডিয়াম-এর চূর্ণ মিশিয়ে দিলে স্পষ্টই দেখা যাবে তরলের আবর্ত নলের দেওয়াল থেকে অক্ষদণ্ডের উপর বিস্তৃত হচ্ছে।

দুর্দান্ত প্রবাহের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য রেফ্রিজারেটর ও ফ্রিজারে বিশেষ সুবিধার্থে ব্যবহৃত হয়। যখন কোনো তরল পদার্থ দুর্দান্ত বেগে কোনো শীতল দেওয়াল বিশিষ্ট নলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন ঐ প্রবাহ তার সমস্ত কণাগুলি, অন্যভাবে প্রবাহিত হওয়ার চেয়ে, অনেক শীঘ্র শীতল দেওয়ালের সংস্পর্শে আনে। জানা প্রয়োজন যে, তরল পদার্থ, তরল পদার্থ হিসেবে, তাপের নিকৃষ্ট পরিবাহী এবং পরস্পর মিশতে না পারলে খুব ধীরে ধীরেই উত্তপ্ত বা শীতল হয়। রক্তের প্রবাহ রক্তজালকের মধ্য দিয়ে যখন প্রবাহিত হয় তখন ওর গতি হয় দুর্দান্ত এবং এই জন্যই রক্ত এবং এর চারপাশের পেশীকলা খুব শীঘ্র তাপের ও অন্যান্য পদার্থের বিনিময় ঘটায়।

তরল পদার্থের নলের মধ্য দিয়ে প্রবাহের বেলা যা সত্য তা উন্মুক্ত খাল এবং নদীর বেলায়ও সত্য, কারণ এখানেও জল দুর্দান্ত বেগে প্রবাহিত হয়। আমরা যখন নদীর গতিবেগের যথাযথ পরিমাপ করি, তখন আমাদের যন্ত্রপাতি, বিশেষ করে নিচের অংশে—হ্রাস-বৃদ্ধি প্রদর্শন করে, যা ক্রমাগত গতির দিক পরিবর্তন বা অন্য কথায়, দুর্দান্তগতি নির্দেশক। নদীর জলকণাগুলি আমাদের ধারণা মত, শুধু যে তার পতিপথে চলে তাই নয়, নদীর তীরভূমি থেকে মাঝবরাবরও যায়। সুতরাং নদীর গভীরে জল সারা বছর ধরে 0°C-র উপরে 4°C উষ্ণতা রক্ষা করে চলে বলে যে দাবি করা হয়, তা ভুল। পরস্পর মিশ্রণের ফলে, হ্রদের নয়, নদীর তলদেশের কাছে প্রবহমান জলের উষ্ণতা নদীর উপরিভাগের জলের উষ্ণতার সমান হয়।

নদীর তলদেশের জলের আবর্ত হালকা বালি বহন করে নিয়ে যায় এবং বালিতে তরঙ্গের সৃষ্টি করে। জোয়ারের জল প্লাবিত তীরভূমিতে তোমরা একই জিনিস লক্ষ্য করবে।

চিত্র 77



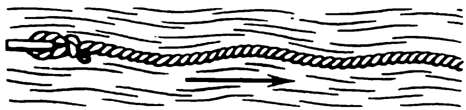
জলের দুর্দান্ত ঢেউ সাগরের বেলাভূমিতে বালুতরঙ্গের সৃষ্টি করে।

সুতরাং মোট কথায় বলা যায়ঃ জলপ্লাবিত সকল বস্তুর উপর আমরা দুর্দান্ত গতি দেখতে পাব। উদাহরণ স্বরূপ এর অস্তিত্ব, একপ্রান্ত জোর করে বাঁধা এবং অপর প্রান্ত গতিপ্রবাহের সঙ্গে মুক্তভাবে দোলায়মান, সর্পিলগতি সম্পন্ন দড়ির সঙ্গে তুলনীয়। এই গতি কিভাবে সৃষ্ট হয়? দড়ির এক অংশের নিকটে একটা আবর্তের সৃষ্টি হয় এবং একে টানে। পরবর্তী মুহূর্তে আর

একটা আবর্ত একে টানে অপর দিকে এবং এইভাবে প্রথমটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে সর্পিলগতির সৃষ্টি করে (78 চিত্র)।

তরল পদার্থ থেকে এবার আমাদের গ্যাসীয় পদার্থের দিকে, জল থেকে বাতাসে ফেরা যাক। তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো ঘূর্ণিঝড় ধুলো ওড়ায়, মাটি থেকে

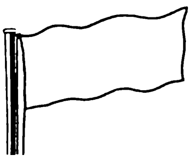
চিত্র 78



গতিশীল জলের দুর্দান্ত গতি দড়ির সর্পিল আকার সৃষ্টি করে।

খড়কুটো উপড়ে আনে। এটা মাটির কাছাকাছি বাতাসের দুর্দান্ত গতিরই বহিঃপ্রকাশ। জলের উপর দিয়ে বাতাস বয়ে যাবার সময় 'কুঁজ'-এর মত সৃষ্টি

চিত্র 79



বাতাসে পতাকা উড়ছে।

হয় যা বায়ুমণ্ডলীয় চাপের হ্রাসের ফলে সৃষ্ট কুণ্ডলীর জন্য আবর্ত বা ঢেউ-এর সৃষ্টি করে। মরুঅঞ্চলের বা দূন (Dune) ঢালের উপর যে বালু-তরঙ্গ দেখা যায় তাও এই কারণেই উৎপন্ন হয় (চিত্র 80)।

বাতাসে পতাকা কেন পত্ পত্ করে ওড়ে—এবার তাহলে তোমরা ধরতে পারবে। জলে দড়ির ঘটনার সঙ্গে এটা সু-সদৃশ। বাতাসের দিনে আবহাওয়া মোড়গ (Weather cock) কখনই একদিকে ফিরে থাকে না। বাতাসের দুর্দান্ত গতির সঙ্গে পাশ ফেরে। কারখানার চিমনীর থেকে উত্থিত ধোঁয়ার মেঘের এক জায়গায় ঘনীভূত হওয়া অনুরূপ, দুর্দান্ত গতির থেকে ঘটে। এঁকেবেঁকে চুল্লী থেকে উত্থিত গ্যাসীয় পদার্থ চিমনীর উপরে ঘুরে ঘুরে ওঠে এবং গতি-জাড্যের জন্য চিমনীর মুখ থেকে বেরিয়ে কিছু সময়ের জন্য কুণ্ডলী পাকাতে থাকে (চিত্র 81)।

বাতাসের দুর্দান্ত গতির আবর্ত বিমানের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিচের প্রায় বায়ুশূন্য অঞ্চল এবং উপরের ক্রমবর্ধমান বায়ুর আবর্ত পূর্ণ করার জন্য বিমানের পাখা বিশেষভাবে তৈরি করা হয়। এটা বাতাসের প্রবতা (নিচে থেকে)

এবং শোষণের (উপর থেকে) মধ্যে যোগ সাধন করে (চিত্র 82)। পাখা বিস্তার করে পাখী যখন উপরে ওঠে তখনও এইরকম ঘটে।

ছাদের বিপরীত দিক থেকে বাতাস যখন বয় তখন কি ঘটে ? এর আবর্ত গতি ছাদের উপরের বাতাস কমিয়ে দেয় এবং চাপ নিষ্ক্রীয় করার জন্য ছাদের

চিত্র 80



মরুভূমির তরঙ্গ।

চিত্র 81

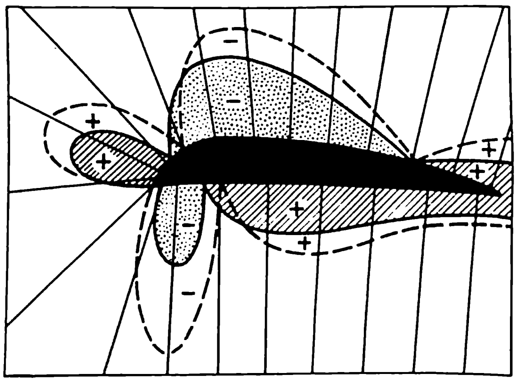


চিমনির উপরে ঘনীভূত ধোঁয়া বেরিয়ে যাচ্ছে।

নিম্নাংশের বাতাস এর উপর চাপ দেয়। এই কারণেই প্রায় আমরা হালকা, আলগাভাবে বাঁধা ছাদ বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, দেখতে পাই। ঐ একই কারণে খুব বাতাসের দিনে ভেতরের চাপে বড় বড় দোকানের জানলা ফুলে ওঠে। (বাইরের চাপে তারা ভেঙ্গে পড়ে না।)

এই ঘটনার অবশ্য একটা সহজ কারণও আছে। বাতাসের গতির চাপের হ্রাসের ফলে এইরকম হয়। ('উপরের বারনৌলির নীতি' দেখ) যখন দু' রকম উষ্ণতার ও আর্দ্রতার বাতাস সমান্তরাল পথে প্রবাহিত হতে থাকে, তখন প্রত্যেকটির মধ্যেই আবর্তের সৃষ্টি হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, এই কারণেই মেঘ বিভিন্ন রকম আকার নেয়। এই সমস্তই, বাতাসের আবর্তের সঙ্গে যে কত রকম ঘটনা জড়িত তা প্রমাণ করে।

চিত্র 82



বিমানের পাখার উপর যে বল ক্রিয়া করে তার চিত্র বাতাসের চাপের বণ্টনের পরীক্ষালব্ধ নমুনা (+) এবং পাখার উপর বাতাসের হাল্কা চাপের পরীক্ষালব্ধ নমুনা (—)। প্লবতা ও শোষণ বলের যুগপৎ প্রয়োগের ফলে বিমানের পাখা উপরে ওঠে। মোটা রেখা চাপের বণ্টনের নির্দেশক: ভাঙা রেখাগুলো উড্ডয়ন গতি যখন খুব বেড়ে যায় তখন চাপের বণ্টনের নির্দেশক।

পৃথিবীর কেন্দ্রে ভ্রমণ

পৃথিবীর ব্যাসার্ধ যদিও 6,400 কি.মি. এবং পৃথিবীর কেন্দ্র আরও অনেক দীর্ঘ পথ, কেউই এখন পর্যন্ত 3·3 কি.মি.-এর বেশি পৃথিবীর অভ্যন্তরে নামে নি। কেবলমাত্র উদ্ভাবনী শক্তি-সম্পন্ন কল্প বিজ্ঞানের ঔপন্যাসিক জুল ভার্নে তাঁর ছিটগ্রস্ত অধ্যাপককে তাঁর ভাইপোর সঙ্গে পৃথিবীর কেন্দ্রের অভিমুখে পাঠিয়েছিলেন। ভূ-গর্ভস্থ যাত্রীদের বিস্ময়কর অভিযানের বিবরণ আমরা পাই জুল ভার্নের 'জার্নি টু দি সেণ্টার অফ আর্থ" গ্রন্থে। আশাতীত যে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে অধ্যাপক ও তাঁর ভাইপো পড়েছিলেন তার মধ্যে অন্যতম হল ক্রমবর্ধমান বাতাসের ঘনত্ব। তোমরা জানো, যতই উপরে ওঠা যায়, বাতাস ততই কমে আসে। বাতাসের ঘনত্ব কমে গুণোত্তর শ্রেণীতে (Geometric Progression) আর বাতাসের উচ্চতা বাড়ে সমান্তর শ্রেণীতে (Arithmetic Progression)।

বিপরীতক্রমে, সাগরের তল থেকে যতই নিচে নামা যায়, উপরের শায়িত তলের চাপে, বাতাস আরও ঘন হয়। অধ্যাপক ও তাঁর ভাইপো, স্বভাবতই, এটা লক্ষ্য না করে পারলেন না এবং 12 লীগ বা 48 কি.মি.-এর মত নিচে নেমে তাঁরা নিম্নরূপ বলাবলি করলেন :

" 'এবার,' তিনি বললেন, 'ম্যানোমিটারটা (Manometer) লক্ষ্য কর। ওটা কি নির্দেশ করছে ?'

" 'প্রচণ্ড চাপ।'

" 'তাহলে দেখতেই পাচ্ছ ধীরে ধীরে অবতরণ করলে আমরা বাতাসের ঘনত্বের সঙ্গে খাপ খাইয়ে উঠি এবং তার দ্বারা মোটেই প্রভাবিত হই না।'

" 'মোটেই না ; কেবল কানের কাছে সামান্য ব্যথা ছাড়া।'

" 'ওটা কিছুই না। তুমি সহজেই, খুব তাড়াতাড়ি এক মিনিট শ্বাস নিয়ে, ওটা থেকে নিস্তার পেতে পার।'

" 'ঠিক তাই,' তাঁর সঙ্গে আর তর্ক না বাড়িয়ে আমি উত্তর করলাম। 'অপেক্ষাকৃত ঘন বাতাসে প্রবেশ করার মধ্যে একটু আনন্দও আছে বৈ-কি। তুমি কি এখানে কত বিস্ময়জনকভাবে স্পষ্ট শব্দ শুনতে পাচ্ছ, তা লক্ষ্য করেছ ?'

" 'নিশ্চয়ই। কালা লোকও এখানে তার শ্রবণ শক্তি ফিরে পাবে।'

" 'কিন্তু এই ঘনত্ব অবশ্যই বাড়বে ?'

" 'হ্যাঁ, অনিশ্চিত কোনো নিয়ম অনুসারে তেমন ঘটবে। এটা সত্য যে, ওজনের গুরুত্ব আমাদের অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে সমানুপাতিকভাবে কমে যাবে। তুমি জান কি পৃথিবী পৃষ্ঠে এর ক্রিয়া সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয়, আর পৃথিবীর কেন্দ্রে বস্তুর কোনো ওজনই থাকে না ?'

" 'আমি তা জানি ; কিন্তু বলুন তো, শেষে কি বাতাস জলের ঘনত্ব পাবে না ?'

" 'নিঃসন্দেহে, 710 অ্যাটমস্ফিয়ারের (Atmosphere) চাপে তাই ঘটবে।'

" 'আরও নিচে ?'

" 'আরও নিচে ঘনত্ব আরও বেড়ে যাবে।'

" 'আমরা তা হলে নামব কিভাবে ?'

" 'বেশ তো, আমরা তখন না হয় পকেটে পাথর পুরে নেব।'

" 'আমাকে বলতে হচ্ছে কাকা, আপনার কাছে সব রকম ঘটনার উত্তর যেন প্রস্তুত হয়েই আছে।'

"অনুমানের রাজ্যে আমি আর এগোতে চাইলাম না। এগোলেই জানতাম কোনো না কোনো অসম্ভবের মুখে হোঁচট খাব যা অধ্যাপককে আবার বকতে শুরু করাবে।

"কিন্তু এটা খুব স্পষ্ট যে, সম্ভবত এক হাজার অ্যাটমস্ফিয়ার চাপে বাতাস শেষ পর্যন্ত কঠিন অবস্থায় আসবে ; এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের দেহ ধারণ করে থাকা সম্ভব হলেও, পৃথিবীর সকলপ্রকার যুক্তি সত্ত্বেও আমাদের যাত্রায় বাধা হয়ে ইস্তফা দিতে হবে।"

কল্পনা ও গণিত

জুল ভার্নের বক্তব্যটা এবার একটু যাচাই করে দেখা যাক। আমরা দেখতে পাব ঔপন্যাসিক ভুল এবং তাঁর ভুল ধরার জন্য আমাদের পৃথিবীর গহ্বরে প্রবেশ করতে হবে না। একটা পেন্সিল আর একটুকরো কাগজ নিয়ে বসলেই যথেষ্ট হবে।

প্রথমত, বার করা যাক বাতাসের চাপ এক-সহস্রাংশ বৃদ্ধি করতে হলে আমাদের কতদূর নিচে নামতে হবে। সাধারণ বাতাসের চাপ সব সময় 760 মি.মি. পারদ স্তম্ভের ভারের সমান। পারদে যদি আমরা বাস করতাম তাহলে এক-সহস্রাংশ চাপ বাড়াতে আমাদের $\frac{760}{1,000} = 0 \cdot 76$ মি.মি. নিচে নামতে হত। প্রকৃতপক্ষে আমাদের আরও অনেক নিচে নামতে হবে। এর কারণ বাতাস পারদের চেয়ে হালকা এবং আমাদের নামতে হবে বাতাস পারদের চেয়ে যত গুণ হালকা ততগুণ। অন্যভাবে বলা যায়, আমাদের নামতে হবে আরও 10,500 গুণ। সুতরাং চাপ এক-সহস্রাংশ বাড়াতে হলে আমাদের 0·76 মি.মি. নয় (পারদের ক্ষেত্রে যেমন) $0 \cdot 76 \times 10,500$ অর্থাৎ প্রায় 8 মিটার। প্রতি 8 মিটার নিচে চাপ এক-সহস্রাংশ বাড়বে (কারণ প্রতি পরবর্তী 8 মিটারে বাতাসের স্তর পূর্ববর্তী স্তর অপেক্ষা ঘনতর হবে এবং চাপের মোট বৃদ্ধি পূর্ববর্তী স্তরের চেয়ে বেশি হবে—অর্থাৎ এই এক-সহস্রাংশ বড় অংশের এক-সহস্রাংশ)। পৃথিবীর চূড়ায় (22 কি.মি.), এভারেস্টের চূড়ায় (9 কি.মি.) বা সমুদ্র বেলায়, যেখানেই থাকি না কেন—8 মিটার নিচে নামলেই বাতাসের চাপ কমপক্ষে এক-সহস্রাংশ বাড়বে। এ থেকে গভীরতার সঙ্গে বাতাসের চাপ কিভাবে বাড়ে, তার নিম্নলিখিত তালিকায় আসা যায় ঃ

ভূপৃষ্ঠে, চাপ = 760 মি.মি. = সাধারণ চাপ
8 মি. নিচে, চাপ = সাধারণ চাপের 1·001
2×8 মি. নিচে, চাপ = সাধারণ চাপের $(1 \cdot 001)^2$
3×8 মি. নিচে, চাপ = সাধারণ চাপের $(1 \cdot 001)^3$
4×8 মি. নিচে, চাপ = সাধারণ চাপের $(1 \cdot 001)^4$

সুতরাং $n \times 8$ মি. নিচে, বাতাসের চাপ সাধারণ চাপের চেয়ে $(1{\cdot}001)^n$ গুণ বেশি হবে ; এবং বাতাসের চাপ যখন খুব বেশি নয়, বাতাসের ঘনত্ব একই হারে বাড়বে (মেরিওটির নিয়ম)।

এখন জুল ভার্নে বলেছেন যে, অধ্যাপক ও তাঁর ভাইপো মাত্র 48 কি.মি. নেমেছিলেন। সুতরাং আমরা অভিকর্ষের হ্রাস বাদ দিতে পারি এবং বাদ দিতে পারি সংশ্লিষ্ট বাতাসের ওজনের হ্রাস। সুতরাং জুল ভার্নের ভূ-গর্ভস্থ যাত্রীরা 48 কি.মি. বা 48,000 মিটার গভীরতায় কতখানি চাপ অনুভব করেছিলেন ? আমাদের সূত্রে $n = 48{,}000 : 8 = 6{,}000$। অতএব আমাদের হিসেব করে দেখতে হবে $1{\cdot}001^{6000}$। যেহেতু 1·001-কে 1·001 দিয়ে 6,000 বার গুণ করা কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ কাজ বলে আমরা লগারিদ্‌মের সাহায্য নেব। এই লগারিদ্‌ম সম্বন্ধে ফরাসী জ্যোতির্বিদ লাপ্লাস (Laplace) যথার্থই বলেছেন, শ্রমের হ্রাস করে এই পদ্ধতি গণকের জীবদ্দশা প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। (তোমরা যাঁরা লগারিদ্‌ম অপছন্দ কর তারা হয়তো লাপ্লাসের 'একস্‌পজিসন দু সিস্টেমে দু মন্ডে' (Exposition du systeme du monde) থেকে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশ বিশেষ পাঠ করে তাদের মন পরিবর্তন করে ফেলবে : "লগারিদ্‌মের আবিষ্কার, কয়েক মাস ব্যাপী গণনার সময়কে কয়েক দিনের কাজে কমিয়ে আনায়, জ্যোতির্বিদের জীবনের সময় যেন দ্বিগুণ করে দিয়েছে এবং তাকে ভ্রমাত্মক যুক্তি (Fallacy) এবং সর্বদা গণনা থেকে উদ্ভূত শ্রম থেকে রক্ষা করেছে। মানুষের মন এই কৃতিত্বের জন্য গর্ব অনুভব করতে পারে, এবং এই গর্ব আরও এই কারণে যে, এর সমস্তটাই মানুষের মন থেকে উদ্ভূত। প্রযুক্তিবিদ্যায়, মানুষ তার নিজের শক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রকৃতি থেকে উপকরণ ও বল সংগ্রহ করেছে। লগারিদ্‌ম অবশ্য পুরোপুরি তার মন থেকেই উদ্ভূত।) লগারিদ্‌মের সাহায্যে, আমরা পাই—

$$\log x = 6{,}000 \times \log 1{\cdot}001 = 6{,}000 \times 0{\cdot}00043 = 2{\cdot}6.$$

এর লগারিদ্‌ম থেকে আমরা দেখি যে, $x = 400$।

সুতরাং 48 কি.মি. গভীরতায় বাতাসের চাপ সাধারণ বাতাসের চাপের 400 গুণ বেশি। এই চাপে, পরীক্ষা দ্বারা যা দেখা গেছে, বাতাসের ঘনত্ব 315 গুণ বৃদ্ধি পাবে। অতএব জুল ভার্নের ভূ-গর্ভস্থ যাত্রীরা 'কানে ব্যথা' ছাড়া আর কিছুই অনুভব করেন নি,—এটা আমাদের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু জুল ভার্নে আরও বলে চললেন, তাঁর যাত্রীরা আরও নিচে নেমে গেলেন—প্রায় 120 কি.মি. গভীরে, এবং এমন কি 325 কি.মি. গভীরে। এই রকম গভীরতায় বাতাসের চাপ প্রচণ্ড আকার ধারণ করবে। প্রসঙ্গক্রমে আমরা জানি যে, কোনো রকম ক্ষতি বরণ না করে মানুষ 3 থেকে 4 অ্যাট্‌মস্ফিয়ারের বেশি চাপ সহ্য করতে পারে না।

একই সূত্র প্রয়োগ করে আমরা দেখতে পাই, যে গভীরতায় বাতাস জলের মত ঘন হয়ে উঠবে, অর্থাৎ 770 গুণ ঘন হবে, তা হল 53 কি.মি.। অবশ্য অধিক চাপের ক্ষেত্রে এ নিয়ম খাটবে না, কারণ এই বৃহত্তর চাপের ক্ষেত্রে গ্যাসের ঘনত্ব আর চাপের সমানুপাতিক নয়। মারিওটির নিয়ম কয়েকশ' অ্যাটমস্ফিয়ারের ঊর্ধ্বে কার্যকরী হয় না। বাতাসের পরীক্ষালব্ধ ঘনত্বের একটা তালিকা নিচে দেওয়া হল ঃ

চাপ		ঘনত্ব
200 অ্যাট্মস্ফিয়ার		190
400	”	315
600	”	387
1,500	”	513
1,800	”	540
2,100	”	564

উপরের তালিকা থেকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে ঘনত্বের বৃদ্ধি লক্ষণীয়ভাবে চাপের বৃদ্ধির পেছনে পড়ে যাচ্ছে। অতএব জুল ভার্নে বৃথাই ভেবেছিলেন যে, জলের চেয়েও ঘন বাতাসের গভীরতায় তাঁরা পেঁছিতে পারবেন। তিনি কখনই সেখানে পেঁছিতে পারতেন না, কারণ বাতাস কেবল 3,000 অ্যাট্মস্ফিয়ার চাপেই জলের মত ঘন হয়। এই চাপের ঊর্ধ্বে, বাতাস আর মোটেই সংকুচিত হয় না। আরও উল্লেখযোগ্য 0° সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রার নিচে 146° সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রায় বাতাসকে ঠাণ্ডা না করলে আমরা কেবল চাপের সাহায্যে একে কঠিন করে তুলতে পারব না।

আসল কথা কি, আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, আমি যে সব তথ্য দিলাম সেই সব তথ্য প্রকাশ হবার বহু পূর্বে জুল ভার্নে তাঁর উপন্যাস প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু এতে লেখক অভিযোগ থেকে মুক্তি পেলেও, তাঁর কাহিনী সত্যে রূপান্তরিত হয়ে উঠছে না।

মানুষ কোনোরকম ক্ষতি স্বীকার না করে কতদূর গভীরে যেতে পারে তা গণনা করার জন্য আমরা আর একবার পূর্বের সূত্রে ফিরে যাই। আমরা সর্বোচ্চ বাতাসের যে চাপ সহ্য করতে পারি তা হল 3 অ্যাট্মস্ফিয়ার। মনে করি, x হল নির্ণেয় গভীরতা। আমরা তাহলে সমীকরণের আকারে লিখতে পারি,

$$(1{\cdot}001)^{\frac{x}{8}} = 3$$

যেখানে থেকে লগারিদ্মের সাহায্যে আমরা পাই $x = 8{\cdot}9$ কি.মি.।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, জীবনকে বিপন্ন না করে আমরা নির্বিঘ্নে 9 কি.মি.

পর্যন্ত অবতরণ করতে পারি। প্রশান্ত মহাসাগর যদি সহসা শুকিয়ে যায়, আমরা বস্তুত এর শয্যায় সর্বত্র বেঁচে থাকতে পারব।

গভীর খনিতে

অবশ্যই কল্প বিজ্ঞানের ঔপন্যাসিকের কল্পনায় ভর করে নয়, বাস্তবিক পক্ষে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলের কে কতখানি নিকটবর্তী হয়েছে? খনিতে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা অবশ্য গেছেন। আমরা জানি (4র্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) যে, পৃথিবীর গভীরতম খনি রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকায়। মানুষ যে গভীরতা পর্যন্ত গেছে অর্থাৎ তিন কিলোমিটার, তার চেয়েও এটা গভীর। কারণ ড্রিল মেশিন 7·5 কি.মি.-এর বেশি খনন করেছে। মোরো ভেলজোর (প্রায় 2,000 মিটার গভীর) একটা খনি দর্শন করে ফরাসী লেখক ডঃ লুকু ডার্টেন এই কথা বলেছেন।

"রিও ডি জেনেরিয়রো থেকে প্রায় চারশ' কিলোমিটার দূরে মোরো ভেলজোর সোনার খনিগুলো রয়েছে। পার্বত্য পথে ষোল ঘণ্টা ট্রেনে করে যাত্রার পর আমরা অরণ্য পরিবেষ্টিত একটা গভীর উপত্যকায় নামি। এখানে একটা ব্রিটিশ কোম্পানী ইতিপূর্বে মানুষ যেখানে অবতরণ করে নি এমন গভীরতায় সোনার খনন কার্য চালাচ্ছে।

"সোনা স্তরে স্তরে নেমে এসেছে এবং খনি 6টি ধাপে একে অনুসরণ করেছে। উল্লম্ব স্যাফ্‌টটি কূপের মত এবং অনুভূমিক খাদগুলো সুড়ঙ্গের মত। এটা যেন মানুষের আধুনিক সমাজের প্রতিমূর্তি। পৃথিবীর ভূ-গর্ভে পেঁছানোর সবচেয়ে বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা স্বর্ণের সন্ধানে শুরু হয়—ভূ-ত্বকে এই গভীরতম খনির খনন কার্যের দ্বারা।

"ডন ক্যানভাসের সর্বাঙ্গের আচ্ছাদন আর একটা চামড়ার জ্যাকেট। চোখ দুটো ভালো করে খুলে রাখ কারণ ক্ষুদ্রতম পাথরের নুড়ি কূপে পড়ার সময় তোমায় প্রচণ্ড আঘাত হানতে পারে। খনির জনৈক অধিনায়ক তোমার সাথী হবে। গভীরতর খাদের আবহাওয়া শীতল রাখার জন্য বায়ু নিষ্কাশন ব্যবস্থার ফলে 0°-র ঊর্ধ্বে মাত্র 4° তাপমাত্রার বরফকঠিন বাতাস সুন্দরভাবে আলোকিত প্রথম সুড়ঙ্গে প্রবেশকালে তোমায় কাঁপিয়ে তুলবে।

"তুমি তোবড়ানো ধাতব খাঁচায় চড়ে প্রথম সাতশ' মিটার স্যাফ্‌ট নেমে গেলে দ্বিতীয় সুড়ঙ্গে গিয়ে পেঁছবে। তারপর তুমি পরবর্তী স্যাফ্‌টে নেমে যাও। ইতিমধ্যে বাতাস অধিকতর গরম হয়ে উঠবে। তুমি ইতিমধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠেরও নিচে নেমে গেছ।

"পরবর্তী স্যাফ্‌টে বাতাস তোমার মুখমণ্ডল পুড়িয়ে দেবে। ঘামতে ঘামতে এবং নিচে নামানো ছাদের তলা দিয়ে নিচু হয়ে যেতে যেতে তুমি গর্ত-করা যন্ত্রের (Drilling machine) গর্জন শুনতে পাবে। এখানে খনির শ্রমিকরা

কোমর বেঁকিয়ে এবং প্রচণ্ড ঘেমে পুরু ধুলোর মেঘের মধ্যে কাজ করছে দেখবে। জলের বোতল হাত ঘুরে ঘুরে চলে তো চলেই। সদ্য কুঁপিয়ে কাটা আকরিকের চাকে হাত ঠেকিও না। তাদের তাপমাত্রা 57°।

"এই জঘন্য ও ঘৃণ্য বাস্তবের মোট ফল কি? দিনে প্রায় দশ কিলোগ্রাম সোনা।"

খনির অভ্যন্তরে প্রাকৃতিক অবস্থা ও খনির শ্রমিকদের তীব্র শোষণ বর্ণনা করতে গিয়ে ফরাসী লেখক উচ্চ তাপমাত্রার কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু চাপের কথা কিছুই বলেন নি। এই চাপ 2,300 মিটার গভীরে কত হবে বার করার চেষ্টা করা যাক। পৃথিবীর পৃষ্ঠের তাপমাত্রার সমান যদি ওখানকার তাপমাত্রা হত, তাহলে পরিচিত সূত্রানুসারে বাতাসের ঘনত্ব বৃদ্ধি পাবে:

$$(1{\cdot}001)^{\frac{2.300}{8}} = 1{\cdot}33 \text{ গুণ।}$$

প্রকৃতপক্ষে, তাপমাত্রা সমান ও নির্দিষ্ট থাকে না, তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। ফলে, বাতাসের ঘনত্ব তত উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় না। পরিণামে বাতাসের ঘনত্ব প্রখর সূর্যের দাবদাহে গ্রীষ্মের দিনে যেমন শীতকালের তুহিনশীতল বাতাসের ঘনত্বের চেয়ে পৃথক হয়, তেমনই খনির নিচে বাতাসের ঘনত্ব পৃথিবী পৃষ্ঠের বাতাসের ঘনত্বের চেয়ে পৃথক হবে। এই কারণেই খনির দর্শকরা কিছুই দেখতে পান না।

আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, অপরপক্ষে এই রকম সুগভীর খনিতে বাতাসের বিশেষ আর্দ্রতা, যা উচ্চ তাপমাত্রায় সমস্ত অবস্থাকে দুঃসহ করে তোলে। দক্ষিণ আফ্রিকায় জোহানেসবার্গের নিকটবর্তী এক খনিতে (2,553 মি. গভীর) 50° তাপমাত্রায় বাতাসের 100 শতাংশ আর্দ্রতা দেখা যায়। এর প্রতিরোধের জন্য, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের (Air conditioning) ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, এই শৈত্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা প্রায় 2,000 টন বরফের ব্যবহারের সমান।

স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার বেলুনে

এতক্ষণ আমরা, অবশ্য মানসচক্ষে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে ভ্রমণ করছিলাম। সেখানে গভীরতার উপর চাপের নির্ভরতা বিষয়ক সূত্রটি আমাদের সহায়তা করেছে। এবার আমরা উর্ধ্বে যাত্রা করি, এবং ঐ একই সূত্র ব্যবহার করে দেখি খুব উচ্চে বাতাসের চাপের কি রকম পরিবর্তন হয়। স্বভাবতই সূত্রটি আমাদের একটু নতুন করে লিখলে দাঁড়াবে:

$p = (0{\cdot}999)^{\frac{h}{8}}$, যেখানে p হল বাতাসের চাপ এবং h হল মিটারে উচ্চতা। দশমিক ভগ্নাংশ 0·999 আমাদের পূর্ববর্তী দশমিক ভগ্নাংশ

0·001 স্থলে বসেছে। এর কারণ, প্রতি 8 মিটারে চাপ 0·001 দশমিক ভগ্নাংশে না বেড়ে, 0·001 ভগ্নাংশে কমবে।

এখন প্রথমত, বাতাসের চাপকে অর্ধেকে নামিয়ে আনতে হলে আমাদের কত দূর উপরে উঠতে হবে ?

এক্ষেত্রে p হবে 0·5 এবং আমাদের উচ্চতা h বার করতে হবে। আমাদের সমীকরণ দাঁড়াবে—

$$0{\cdot}5 = (0{\cdot}999)^{\frac{h}{8}}$$

যা লগারিদ্‌ম জানা থাকলে সহজেই বার করা যায়। উত্তর হবে $h = 5{\cdot}6$ কি.মি.। এই 5·6 কিলোমিটার উচ্চতায় বাতাসের চাপ সাধারণ বাতাসের চাপের অর্ধেক হবে।

এবার আমরা আরও উপরে উঠি এবং দুর্ধর্ষ সোভিয়েত মহাকাশচারীদের অনুসরণ করি, যারা ইতিমধ্যেই যথাক্রমে 19 কি.মি. ও 22 কি.মি. উপরে গমন করেছেন। এই রকম উচ্চতাকে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার উচ্চতা বলা হয় এবং এই উচ্চতায় ওঠার জন্য যে বেলুন ব্যবহার করা হয় তাকে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার বেলুন বলে। সোভিয়েত স্ট্যাটোস্ফিয়ার বেলুন ইউ.এস.এস.আর. এবং ওসোভিয়াখিম-I যথাক্রমে 1933 ও 1934 সালে 19 কি.মি. ও 22 কি.মি.-এর উচ্চতায় আরোহণের বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেছে।

এবার দেখা যাক, এত উঁচুতে বাতাসের চাপ কত হবে। 19 কিলোমিটারে এই চাপ হবে $(0{\cdot}999)^{\frac{19{,}000}{8}} = 0{\cdot}095$ এটিএম. = 72 মিলিমিটার এবং 22 কিলোমিটারে এই চাপ হবে $(0{\cdot}999)^{\frac{22{.}000}{8}} = 0{\cdot}066$ এটিএম. = 55 মিলি-মিটার পারদ স্তম্ভের সমান।

কিন্তু মনে রাখা দরকার, মেরিওটির সূত্র গ্যাসীয় পদার্থের কেবলমাত্র কম চাপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে যে, বাতাসের তাপমাত্রাও পরিবর্তনশীল, কারণ আমরা ধরে নিয়েছি যে, ঐ তাপমাত্রা সকল ক্ষেত্রে সমান। প্রকৃতপক্ষে উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রার বিশেষ পরিবর্তন হয়। ধরা হয় যে, গড়ে প্রতি কিলোমিটারে তাপমাত্রা 6·5° সে. হ্রাস পায়। এই রকম 11 কিলো-মিটার পর্যন্ত। তারপর অনেক দূর পর্যন্ত তাপমাত্রা 0° সে. নিচে 56° সে.-এ স্থির থাকে। প্রাথমিক গণিতের সাহায্যে যা সম্ভব নয়, এই সমস্ত বিষয়-গুলোকে বিবেচনা করলে, আমরা অনেক বেশি বাস্তবসম্মত ফল পাব। এই একই কারণে গভীর খনিতে বাতাসের চাপ সম্বন্ধে যে ধারণায় আমরা উপনীত হয়েছি সেই মানকে আসন্ন মান হিসেবে গণ্য করাই যুক্তিসঙ্গত হবে।

পরিচ্ছেদ ৭

তাপ

পাখা

পাখার বাতাস খাবার সময় মহিলারা স্বভাবতই বেশ স্বস্তি পায়। কেউ কেউ মনে করতে পারেন কাজটা উপস্থিত সকলের কাছেই সম্পূর্ণ নিরাপদ। বাতাসটা ঠাণ্ডা করে দেওয়ার জন্য তাদের ঐ মহিলাদের কাছেই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। দেখা যাক কাজটা বস্তুতই সেরূপ কি না।

বাতাস খাওয়ার সময় আমরা ঠাণ্ডা বোধ করি কেন? আমাদের মুখ-মণ্ডলের সংস্পর্শে আসা উপরকার বাতাস উত্তপ্ত হয়। এই উত্তপ্ত অদৃশ্য বাতাসের আস্তরণই আমাদের মুখমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে। অন্য কথায়, মুখমণ্ডলকে আরো অতিরিক্ত উত্তাপ হারাতে বাধা দেয়। যখন চারপাশের বাতাস থাকে স্থির, এই উত্তপ্ত নিশ্চল বাতাসের আস্তরণ অত্যন্ত ধীরে ধীরে শীতল ভারী বাতাসের ধাক্কায় উপরে ওঠে। যখন আমরা বাতাস করে এই উত্তপ্ত আস্তরণ সরিয়ে দি, আমাদের মুখমণ্ডল অধিকতর পরিমাণে নতুন অনুত্তপ্ত বাতাসের সংস্পর্শে আসে। এই অনুত্তপ্ত বাতাসেই মুখমণ্ডল তার উত্তাপ ছেড়ে দেয়। এইভাবেই আমরা আমাদের শীতল করে তুলি।

ফলে মহিলারা হাওয়া খাবার সময় ক্রমাগত উত্তপ্ত বাতাস তাড়িয়ে দিয়ে সেই স্থানে অনুত্তপ্ত বাতাস নিয়ে আসেন। এই অনুত্তপ্ত বাতাস আবার উত্তপ্ত হয়, আবার সরিয়ে দেওয়ার ফলে অনুত্তপ্ত বাতাস সেই স্থান দখল করে।

পাখার বাতাস এইভাবে বাতাসের মিশ্রণ ত্বরান্বিত করে এবং সমস্ত ঘরের উষ্ণতায় খুব দ্রুত সমতা আনে। অন্যকথায়, পক্ষ সঞ্চালন ঘরের অন্যান্য লোকের সংস্পর্শে থাকা অপেক্ষাকৃত শীতল বাতাসের বিনিময়ে পাখা সঞ্চালনকারীকে আরাম দেয়। এছাড়া পক্ষ সঞ্চালনের সময় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে, যা এবার তোমাদের বলব।

বাতাস কেন আমাদের অধিকতর ঠাণ্ডা বোধ করতে সহায়তা করে

তোমরা অবশ্যই জানো, শান্ত আবহাওয়ায় তুষারপাত তত বেশি কামড় দেয় না, যে রকম দেয় ঝড়ো আবহাওয়ায়। কিন্তু আমার মনে হয়, তোমরা এর কারণ

হয়তো অনেকেই ভালোভাবে জানো না। কেবলমাত্র সজীব পদার্থই বাতাসে বেশি ঠাণ্ডা অনুভব করে। বাতাস তাপমান যন্ত্রের পারদস্তম্ভকে নামিয়ে আনে না। তুষার ঝঞ্ঝার দিনে আমরা যে বড় বেশি ঠাণ্ডা বোধ করি তার কারণ, প্রথমত, বাতাস এই রকম আবহাওয়ায় আমাদের মুখমণ্ডল থেকে, এমন কি আমাদের দেহ থেকে অনেক বেশি উত্তাপ টেনে নেয়। শান্ত আবহাওয়ার সময় কিন্তু এমনটি ঘটে না, কারণ তখন দেহের চারপাশের যে বাতাসের আস্তরণ দেহের উত্তাপে উত্তপ্ত হয় তা অত তাড়াতাড়ি নতুন শীতল বাতাসের প্রবাহে সরে যায় না। বাতাস যত জোরালো হবে, ততই বেশি বেশি করে বাতাস প্রতি মিনিটে আমাদের ত্বকের সংস্পর্শে আসবে এবং ফলে, প্রতি মিনিটে বেশি বেশি করে বাতাস আমাদের দেহের উত্তাপ টেনে নেবে। শীত বোধ করার পক্ষে শুধুমাত্র এটাই যথেষ্ট।

কিন্তু আরও একটা কারণ আছে। আমাদের দেহের ত্বক এমনকি ঠাণ্ডা বাতাসেও জলীয় বাষ্প ছেড়ে দিচ্ছে। ঘামার জন্য আমাদের উত্তাপ দরকার। এই উত্তাপ আমরা পাই দেহ থেকে এবং আমাদের চারপাশের বাতাসের আস্তরণ থেকে। বাতাস যখন স্থির থাকে, আমরা ঘামি কম, কারণ আমাদের ত্বকের সন্নিবিষ্ট বাতাসের আস্তরণ জলীয় বাষ্পে শীঘ্রই সংপৃক্ত হয়, এবং স্যাঁতসেঁতে বাতাসে বাষ্পায়ন (Evaporation) খুব দ্রুত ঘটে না। কিন্তু যখন চারপাশের বাতাস থাকে সঞ্চরণশীল এবং নতুন নতুন বাতাসের অংশ বেশি বেশি করে আমাদের দেহের ত্বকের সংস্পর্শে আসে, আমরা বেশি ঘামি। এর কারণ আমাদের তখন প্রচুর পরিমাণে উত্তাপের প্রয়োজন হয় যা আমরা আমাদের দেহ থেকে সংগ্রহ করি।

এখন দেখা যাক বাতাসের ঠাণ্ডা করার ক্ষমতা কতটুকু? এটা নির্ভর করে বাতাসের বেগ ও বাতাসের উষ্ণতার উপর। সাধারণভাবে আমরা যা মনে করি তার চেয়ে বিষয়টি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বাতাস কতদূর দেহের ত্বকের উষ্ণতা কমাতে পারে তার একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। মনে করা যাক, বাতাসের উষ্ণতা 0° সেণ্টিগ্রেড-এর উপরে 4°C আছে এবং এই সময়, ধরা যাক, বাতাসের কোনো প্রবাহ নেই। তাহলে এই সময় দেহের ত্বকের উষ্ণতা 31°C। এখন প্রতি সেকেণ্ডে 2 মিটার বেগে প্রবহমান বাতাসে, যাতে পতাকা পত্‌পত্‌ করে ওড়ে না, গাছের পাতাও প্রায় নড়ে না, দেহের ত্বকের উষ্ণতা 7° নেমে আসবে। প্রতি সেকেণ্ডে 6 মিটার বেগে প্রবহমান বাতাসে, যাতে পতাকা পত্‌ পত্‌ করে নড়ে, ত্বকের উষ্ণতা 22° হ্রাস পাবে অর্থাৎ 0°-র উপর প্রায় 9°-তে নেমে আসবে।

তাহলেই দেখা যাচ্ছে, তুষারঝড় আমাদের কতখানি শীতে কাবু করবে তা শুধুমাত্র বাতাসের উষ্ণতার উপরই নির্ভর করে না, বাতাসের গতিবেগকেও এ

বিষয়ে গ্রাহ্য করতে হবে। মস্কো অপেক্ষা লেনিনগ্রাদে একই উষ্ণতার তুষারঝড় সহ্য করা কষ্টকর, তার কারণ বাল্‌টিক উপকূলে বাতাসের গড় গতিবেগ প্রতি সেকেন্ড 6 মিটার, যখন মস্কোয় ঐ গতিবেগ সেকেন্ডে 4·5 মিটার। বৈকাল হ্রদে ঐ ঝড় সহ্য করা আরও সহজ, কারণ এখানে বাতাসের গতিবেগ সেকেন্ডে মাত্র 1·3 মিটার। এই কারণেই ইউরোপের প্রবল বাতাসের তুলনায় সাইবেরিয়ার পূর্বাঞ্চলের বিখ্যাত তুষারপাত বেশি পীড়াদায়ক মনে হয় না। বরং শীতকালে বিশেষ করে, সাইবেরিয়ার পূর্বাঞ্চলের প্রায় সম্পূর্ণ বাতাসহীন আবহাওয়া লক্ষণীয়।

মরুভূমি অঞ্চলের শ্বাসকষ্ট

তাহলে দেখা যাচ্ছে রোদে-পোড়া গরমের দিনে বাতাস আমাদের বেশ উজ্জীবিত করে। তাহলে মরুযাত্রীরা শ্বাসকষ্টের কথা তোলে কেন? এই আপাত বিরোধের কারণ নিরক্ষীয় অঞ্চলে বাতাস সাধারণত শরীর অপেক্ষা বেশি উষ্ণ থাকে। এই অধিকতর উষ্ণ বাতাস মানুষকে যে, আরও উত্তপ্ত করে তুলবে এতে আর আশ্চর্য কি? এটাই ঘটনা যে এক্ষেত্রে বাতাস শরীর থেকে উত্তাপ গ্রহণ না করে বরং নিজে শরীরকে আরও উত্তপ্ত করে তোলে। সুতরাং প্রতি মিনিটে যত বেশি পরিমাণে বাতাস দেহের সান্নিধ্যে আসে ততই বেশি পরিমাণে আমরা গরম বোধ করি, যদিও বাতাস বাষ্পায়নের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। মরুভূমির লোকেরা এই কারণে গরম পোশাক ও পশুর লোমের টুপি পরিধান করে।

ঘোমটা কি শরীরকে গরম রাখে?

প্রতিদিনের পদার্থবিদ্যার এটা আর একটি সমস্যা। মহিলারা দাবি করেন যে, তাদের ঘোমটা তাঁদের গরম রাখে এবং ঘোমটা ছাড়া তাঁরা ঠাণ্ডা অনুভব করবেন। কোনো কোনো ভদ্রলোক মনে করেন এই তুচ্ছ ব্যাপারটা নিয়ে মহিলাদের এই বাগাড়ম্বর নিছক কল্পনাপ্রসূত ব্যাপার ছাড়া কিছু নয়।

আমি মনে করি, তোমরা এখন আমার পূর্ববর্তী আলোচনাগুলো অনুধাবন করে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ মহিলাদের ঐ দাবির পশ্চাতে আরও যুক্তি আছে। বুননের যতই ফাঁক থাকুক না কেন, ঘোমটার মধ্য দিয়ে বাতাস অনেক ধীরে প্রবেশ করে। মুখমণ্ডলের সরাসরি উপরকার বাতাসের আস্তরণ গরম হয় এবং ঘোমটা বাতাসের এই উষ্ণ আস্তরণ নতুন বায়ুপ্রবাহের দ্বারা সরিয়ে দিতে বাধা দেয়। সুতরাং শীতার্ত বাতাসের দিনে যখন তাপমাত্রা 0°-র কয়েক ডিগ্রী নীচে থাকে তখন বাইরে বেড়ানোর সময় মহিলারা যদি বলেন ঘোমটা তাঁদের মুখমণ্ডলকে ঠাণ্ডার হাত থেকে রক্ষা করে, তবে তার মধ্যে যুক্তি আছে বুঝতে হবে।

কুঁজো কলসী (Coolers)

তোমরা সম্ভবত জল ঠাণ্ডা করার বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন মাটির ধূসর কুঁজো-কলসী দেখেছ বা এদের সম্বন্ধে শুনেছ বা পড়েছ। দক্ষিণ অঞ্চলের দেশগুলিতে এদের বেশ চল আছে। স্পেনে এগুলি 'আলকারাজা', ইজিপ্টে 'গৌউলা' ইত্যাদি নামে পরিচিত।

এদের রহস্যজনক ঠাণ্ডা করার পদ্ধতিটা খুবই সহজ। পানীয় বা তরল পদার্থ যখন এই মাটির পাত্রের গায়ের ছিদ্রপথে বেরিয়ে আসে, তখন সেই তরল-পদার্থের ধীরে ধীরে বাষ্পায়ন ঘটে। ফলে পাত্রটি এবং তার উদরস্থিত তরল পদার্থ তাদের উত্তাপ হারায় ('বাষ্পীভবনের লীনতাপ'—'Latent heat of vaporisation')।

দক্ষিণ দেশগুলির যাত্রীরা সম্ভবত ভুলক্রমে দাবি করে যে, তাদের এই পাত্র প্রভূত পরিমাণে তাদের তরল পদার্থ শীতল করে তোলে। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই একাধিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। চারপাশের বাতাস যত গরম হবে, তত তাড়াতাড়ি এবং তত বেশি করে পাত্রের গাগুলোর সংশ্লিষ্ট তরল পদার্থের বাষ্পায়ন ঘটে, এবং ফলে পাত্রের অভ্যন্তরস্থ তরল পদার্থ বেশি পরিমাণে ঠাণ্ডা হয়। বাতাসের আর্দ্রতা (Humidity)-ও এক্ষেত্রে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। বাতাসের আর্দ্রতা বেশি হলে, বাষ্পায়ন কম হবে এবং পাত্রের তরল পদার্থ ঠাণ্ডাই হবে না। বিপরীত পক্ষে, বাষ্পায়ন খুব দ্রুত হবে যখন বাতাস থাকে শুষ্ক, ফলে তরল পদার্থ শীতল হবার প্রবণতাও বাড়বে। বাতাসের প্রবাহও বাষ্পায়ন ত্বরান্বিত করবে এবং পাত্রের তরল শীতল হতে সাহায্য করবে। এ বিষয়টি তোমরাও নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ যে, গরমকালে বাতাস বইলে পরনের ভিজে কাপড় দ্রুত শুকিয়ে যায়। কুঁজো বা কলসী 5°-র বেশি উষ্ণতা কমাতে পারে না। দক্ষিণের প্রখর তাপদগ্ধ দিনে, যখন উষ্ণতা সময় সময় প্রায় 33°C ওঠে, কুঁজো বা কলসীর জলের উষ্ণতা দাঁড়ায় 28°। ফলে এরকম শীতল করার ক্ষমতা এসব পাত্রের কার্যত প্রায় নেই বললেই চলে, এবং প্রকৃতই এর জন্য এদের ব্যবহারও এরকম উষ্ণতায় করা হয় না। এদের বেশ সফলতার সঙ্গেই ব্যবহার করা হয় অন্য কারণে—শীতল জল'কে 'শীতল রাখার জন্য'।

পানীয় জল বা তরল পদার্থ কতদূর কুঁজো বা কলসী শীতল করতে পারে তা এবার একটু পরিমাপ করে দেখা যাক। ধরা যাক, পাত্রে 5 লিটারের মত জল ধরে এবং আরও ধরা যাক, 0·1 লিটার মত জলের বাষ্পায়ন ঘটেছে। 1 লিটার (1 কে.জি) বাষ্পায়ন ঘটাতে 33°C উষ্ণতার গরমের দিনে 580 ক্যালরি উত্তাপের প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে 0·1 কে.জি. জলের বাষ্পায়ন ঘটেছে। ফলে আমাদের প্রয়োজন ছিল 58 ক্যালরির। যদি এই উষ্ণতার

সমস্তটাই কলসীর জল থেকেই সংগৃহীত হত, তাহলে এর উষ্ণতা প্রায় 58/5 বা প্রায় 12° মত নেমে যেত। কিন্তু, বাষ্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত উত্তাপই পাত্রের গা এবং তার চারপাশের বাতাস থেকে সংগৃহীত হয়েছে। আরও, শীতল হবার সময় পাত্রের জলও পাত্রের চারপাশের উত্তপ্ত বাতাস দ্বারা যুগপত্ উত্তপ্ত হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উষ্ণতার প্রকৃত হ্রাস, অর্থাৎ শীতল করার ক্ষমতা, আমাদের অংকের অর্ধেক মাত্র।

বলা কঠিন শীতল করার ক্ষমতা কোন্‌খানে বেশি হবে—রোদে না ছায়ায়। সূর্যের উত্তাপ বাষ্পায়ন ত্বরান্বিত করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উত্তাপের অন্তঃপ্রবাহও বাড়ায়। আমার ধারণা, কুঁজো বা কলসী রাখার সবচেয়ে প্রশস্ত জায়গা হল ছায়ার নিচের শুকনো জায়গা।

বরফ ছাড়া 'বরফ-বাক্স'

খাদ্যবস্তু শীতল রাখার বাক্স বা বরফহীন 'বরফ বাক্স'-ও বাষ্পায়নের শীতল করার ক্ষমতার উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্যাপারটা খুবই সোজা। একটা কাঠের বাক্স —লোহার উপর দস্তার প্রলেপ মাখানো হলে আরও ভালো হয়—আর ভেতরে খাদ্যবস্তু রাখার জন্য সেলফ। উপরে ঠাণ্ডা জলের একটা লম্বা পাত্র। তারপর একটুকরো ক্যানভাস্ কাপড়ে বাক্সটা জড়ানো। কাপড়ের একটা দিক বাক্সের বাইরে আর নিচের দিকটা বাক্সটির নিচের সেল্‌ফের তলায় রক্ষিত একটা পাত্রে ডোবানো। ক্যানভাসটা পাত্রের জল শুষে নিয়ে উপরে পাঠায়। ইতিমধ্যে জলের ধীরে ধীরে বাষ্পায়ন ঘটে যখন জল ক্যানভাসের ভেতর দিয়ে উপরে ওঠে, যেমন করে পলতে তেল শোষণ করে উপরে তোলে। ফলে ক্যানভাসে জড়ানো 'বরফ বাক্সের' সমস্ত কক্ষগুলো শীতল হয়। স্বভাবতই সমস্ত জিনিসটা ঘরের সবচেয়ে ঠাণ্ডা জায়গায় রাখলে ভালো হয়। প্রতি সন্ধ্যায় পাত্রের জলটা বদলে দিলে ভালো হয়, তাতে সারারাত্রে জল আরও ঠাণ্ডা হবে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, পাত্র দুটি এবং ক্যানভাসটি খুব নিষ্কলঙ্ক ও পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন।

মানুষ কত বেশি উত্তাপ সহ্য করতে পারে

আমাদের যা ধারণা মানুষ তার চেয়ে অনেক বেশি উত্তাপ সহ্য করতে পারে। দক্ষিণ অক্ষাংশের মানুষ, আমরা মাঝামাঝি উষ্ণ অঞ্চলে যে রকম উত্তাপ সহ্য করতে পারি তার চেয়ে অনেক বেশি উত্তাপ সহ্য করে। মধ্য অস্ট্রেলিয়ায় ছায়াচ্ছন্ন অঞ্চলেও উষ্ণতা অনেক সময় 46°C ওঠে। এমনও কোনো কোনো অঞ্চল দেখা যায় যেখানে ঐ উষ্ণতা ছায়াচ্ছন্ন অঞ্চলে 55°C পোঁছায়। লোহিত সাগর থেকে পারস্য উপসাগরে গমনরত জাহাজের কেবিনে উষ্ণতা 50°C কি তারও বেশি মাঝে মাঝে পরিলক্ষিত হয়। যদিও ঐ সব কেবিনে ক্রমাগত বায়ুনিষ্কাশনের ব্যবস্থা আছে।

পৃথিবীপৃষ্ঠে এ পর্যন্ত সর্বাধিক উষ্ণতা পরিলক্ষিত হয়েছে 57°C। ক্যালিফোর্নিয়ার মৃত্যু-উপত্যকা ('ভ্যালি অব ডেথ')-য় এই উষ্ণতা দেখা গেছে। মধ্য এশিয়ায়, রাশিয়ার সর্বাপেক্ষা উষ্ণ অঞ্চলেও উষ্ণতা কখনো 50°C-এর উর্ধ্বে ওঠে নি।

তোমরা সম্ভবত অনুমান করেছ যে, উল্লিখিত সমস্ত উষ্ণতাই অবশ্য ছায়াচ্ছন্ন অঞ্চলের। এর কারণ কি তাহলে বলি। ছায়াচ্ছন্ন স্থানেই তাপমান যন্ত্র বাতাসের নির্ভুল তাপ পরিমাপ করতে পারে। যদি তাপমান যন্ত্রটি রোদে রাখা হয়, চারপাশের বাতাসের উষ্ণতা অপেক্ষা যন্ত্রটি রোদে বেশি উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে। মোট কথা, উষ্ণ প্রবাহের সময়, তাপমান যন্ত্র রোদে কোনখানের উষ্ণতা গ্রহণ করবে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট করে বলা খুব মুশকিল।

মানুষ কতখানি উষ্ণতা সহ্য করতে পারে তা নির্ণয় করার জন্য অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। দেখা গেছে যখন আমরা শুষ্ক বাতাসে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হয়ে উঠি, তখন আমরা ফুটন্ত জলের উষ্ণতা (100°C)-র চেয়ে বেশি উষ্ণতা সহ্য করতে পারি। ব্রিটিশ পদার্থবিদ ব্ল্যাগডেন ও সেণ্ট্রি পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন এই চরম উষ্ণতা এমন কি 160°C-ও হতে পারে। পরীক্ষাটা চালানোর জন্য তাঁরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা রুটি তৈরির কারখানায় উত্তপ্ত চুল্লীর পাশে কাটান। টিনডাল এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করেছেন, "ডিম সিদ্ধ হয়ে যায় বা মাছ ভাজা হয়ে যায় এমন উত্তপ্ত বাতাসেও মানুষ নিরাপদে থাকতে পারে।

এর কারণ কি, এবার দেখা যাক। আমাদের দেহ, একে স্বাভাবিক রাখার জন্য, প্রকৃতপক্ষে ক্রমাগত উষ্ণতা ত্যাগ করে চলেছে। প্রচুর পরিমাণে ঘেমে দেহ উত্তাপ প্রতিরোধ করে। এই ঘাম দেহের সরাসরি চারধারে বিদ্যমান বাতাসের আস্তরণের উত্তাপ অনেকখানি শোষণ করে নেয়। এইভাবে দেহের উষ্ণতা হ্রাস পায়। এই প্রসঙ্গে দুটি প্রয়োজনীয় তথ্য জানা দরকার : দেহ যেন উত্তাপের উৎসের প্রত্যক্ষ সংযোগে না আসে এবং বাতাস যেন সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হয়।

মধ্য এশিয়ায় লেনিনগ্রাদের 24°C উষ্ণতার তাপ প্রবাহের তুলনায় 37°C উত্তাপ সহ্য করা অনেক সহজ। এর কারণ লেনিনগ্রাদের বাতাস অত্যন্ত আর্দ্র এবং প্রায়-বৃষ্টিহীন মধ্য এশিয়ার বাতাস অত্যন্ত শুষ্ক।

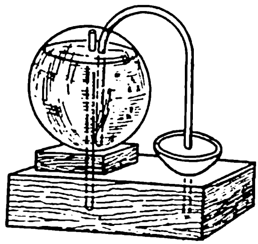
তাপমান যন্ত্র না চাপমান যন্ত্র ?

পুরাণে আছে, এক সিম্‌পল সিমন স্নানাধারে স্নান করার সাহস পেতেন না, কারণ, তিনি বর্ণনা করেছিলেন যে, তিনি "স্নানাধারের সঙ্গে একটা চাপমান যন্ত্র সংযুক্ত করে রেখেছিলেন এবং চাপমান যন্ত্রটি ঝড়ের ইঙ্গিত বহন করত।"

কিন্তু তাপমান ও চাপমান যন্ত্রের পার্থক্য নিরূপণ সর্বদা অত সহজ নয়।

কয়েক ধরনের তাপমান যন্ত্র বা থার্মোস্কোপ আছে যাদের অবশ্য চাপমান যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা যায় এবং অনুরূপভাবে কিছু চাপমান যন্ত্রকে তাপমান যন্ত্র বলেও ধরা যায়। যোগ্য দৃষ্টান্তস্বরূপ আলেকজান্দ্রিয়ার হেরনের আবিষ্কৃত থার্মোস্কোপের কথা বলা যায়। সূর্যকিরণে পাত্রের উপরিভাগের বাতাসের সম্প্রসারণ ঘটে যা পাত্রের জলের উপর চাপ সৃষ্টি করে। ফলে জল বাঁকানো নলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। নলের অপর প্রান্তের সঙ্গে সংলগ্ন ফাঁদেলের মধ্য দিয়ে ঐ জল নিচের বাক্সে গিয়ে জমা হয়।

চিত্র 83



হেরনের থার্মোস্কোপ (Thermoscope)

বিপরীত পক্ষে, ঠাণ্ডার দিনে, গোলকাকৃতি পাত্রের বাতাস সংকুচিত হয় এবং জল নিচের বাক্স থেকে বাইরের বাতাসের চাপে উত্তোলিত হয় এবং নলের সোজা দণ্ডের মধ্য দিয়ে পাত্রে ফিরে আসে।

বাতাসের বিভিন্ন চাপে যন্ত্রটি অবশ্য প্রতিক্রিয়া করে ; যখন বাইরের বায়ুমণ্ডলের বাতাসের চাপ কমে আসে, পাত্রের অভ্যন্তরস্থ উচ্চ চাপের বাতাস আয়তনে বাড়ে। এইভাবে সম্প্রসারিত বাতাস পাত্রের জলকে বাঁকা নলের মধ্য দিয়ে ফাঁদেলে যেতে বাধ্য করে। বিপরীত পক্ষে, যখন বাইরের বায়ুমণ্ডলের চাপ বাড়ে, নিচের বাক্সের কিছু জল আবার পাত্রে উঠে আসে। উষ্ণতার প্রতি ডিগ্রী পার্থক্যে গোলকের অভ্যন্তরস্থ বাতাসের আয়তনে সমপরিমাণ পার্থক্য সৃষ্টি করে (760 : 273 অর্থাৎ প্রায় 2·5 মিলিমিটার পারদস্তম্ভের উচ্চতার পার্থক্য)। মস্কোয় বাতাসের চাপের ওঠা-নামা 20 বা তারও বেশি মিলিমিটার পার্থক্য সূচনা করে। এটা হেরনের থার্মোস্কোপে 8°C, অর্থাৎ বাতাসের চাপের এই পতন উষ্ণতার 8° উত্থান বলে সহজেই ধরে নেওয়া যায়।

অতএব দেখা যাচ্ছে প্রাচীন এই থার্মোস্কোপটি (তাপমান যন্ত্রটি) ভালোভাবেই ব্যারোস্কোপ (চাপমান যন্ত্র)-এর কাজ করতে পারে। এক সময় ওয়াটার ব্যারোমিটার বিক্রি হত যা থার্মোমিটার (তাপমান যন্ত্র)-এর কাজও করত। ক্রেতা বা আবিষ্কারকের মনে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ জাগত না।

বাতির কাচ কি কারণে ব্যবহার করা হয় ?

বর্তমান আকারে আসতে বাতির কাচকে যে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আসতে হয়েছে তা অল্প সংখ্যক লোকই জানে। হাজার হাজার বছর মানুষ আলোর জন্য কোনো রকম কাচ ছাড়াই শিখা ব্যবহার করত। এই বড় রকমের পরিবর্তনটির জন্য লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি (1452—1519)-র মত প্রতিভার প্রয়োজন ছিল। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি অবশ্য কাচের পরিবর্তে ধাতু ব্যবহার করেছিলেন। পরে আরও তিনটি শতাব্দী পার হয়ে গেছে যার পর মানুষ স্বচ্ছ কাচের চোঙ (Cylinder) ব্যবহার করতে শিখল। আজকের বাতির যে কাচ ব্যবহার করা হচ্ছে তা বেশ কয়েক পুরুষের কলাকৌশলের ফল।

এখন দেখা যাক এই কাচের ব্যবহার কি জন্য ? আমার সন্দেহ, তোমরা কেউই এর নির্ভুল উত্তর দিতে পারবে কি না। বাতাস থেকে আগুনের শিখাটি রক্ষা করা নিছকই গৌণ ব্যাপার। কাচ লাগানোর অন্যতম উদ্দেশ্য হল আগুনের শিখার ঔজ্জ্বল্য বাড়ানো, দহন ক্রিয়া ত্বরান্বিত করা। অন্যভাবে বলা যায়, কাচ ধূমনালী (চিমনি)-র কাজ করে। এটা আগুনের শিখার কাছে আরও বাতাস আনে এবং বাতাসের শুষ্কতা বাড়ায়।

ব্যাপারটা আলোচনা করা যাক। আগুনের শিখা কাচের মধ্যকার বাতাসের স্তম্ভকে বাতির চারপাশের বাতাস অপেক্ষা অনেক বেশি উত্তপ্ত করে। উত্তপ্ত হয়ে এবং এইভাবে হালকা হয়ে বার্নারের নিচের গর্ত দিয়ে যে বাতাস প্রবেশ করে তা, অপেক্ষাকৃত ভারী ও ঠাণ্ডা বাতাসের চাপে উপরে উঠে যায়। সমস্ত ঘটনাটি ঘটে আর্কিমিডিসের নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। এইভাবেই আমরা বাতির চোঙের মধ্যে বাতাসের নিরবচ্ছিন্ন ঊর্ধ্বগতি প্রবাহ পাই যা দহনের ফলে উৎপন্ন বস্তু উপরে ক্রমাগত ঠেলে দিয়ে চোঙের ভেতর নতুন বাতাস নিয়ে আসে। কাচটা যত লম্বা হবে, উত্তপ্ত ও অনুত্তপ্ত বাতাসের মধ্যে পার্থক্য তত বাড়বে, ফলে আরও তীব্রভাবে বাতাস ভেতরে ঢুকবে এবং দহন ক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে। এই ঘটনা থেকেই বোঝা যায় কারখানার চিমনি কেন এত উঁচু করা হয়।

বিস্ময়ের কথা, লিওনার্দোর এই বিষয়গুলির উপর খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল। তাঁর লেখা পাণ্ডুলিপিতে আমরা দেখি: আগুন দেখা দেয় যেখানে, তার চারপাশেই ঝড় বয়: এই বায়ুপ্রবাহ আগুনকে পুষ্ট করে এবং আগুনের বৃদ্ধি ঘটায়।

আগুনের শিখা আপনা-আপনি নিভে যায় না কেন ?

দহন ক্রিয়া আলোচনা করতে বসে আমরা নিজেদের অজান্তেই যে প্রশ্নের সম্মুখীন হই তা হল: আগুন কেন নিজের ইচ্ছায় নিভতে পারে না ? বস্তুত,

দহনের ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প প্রস্তুত হয়। এই দুটি উৎপন্ন বস্তুই অদাহ্য। স্বভাবতই এরা দহনক্রিয়া চালাতে পারে না। ফলে, কোনো আগুনের শিখা জ্বলতে আরম্ভ করলেই অদাহ্য এই দুটি বস্তুর দ্বারা শিখাটি ঘেরাও হয়ে যায়, যা বাতাসের প্রবেশের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আমরা জানি বাতাস ছাড়া দহন চলতে পারে না এবং তাহলে আগুনের শিখা তো নিভে যাবারই কথা।

কিন্তু সে রকমটি ঘটে না কেন? সমস্ত জ্বালানি নিঃশেষিত না হওয়া পর্যন্ত দহন চলতে থাকে কেন? কারণ বায়বীয় পদার্থ (Gases) উত্তপ্ত হলে আয়তনে বাড়ে এবং সেই কারণে অপেক্ষাকৃত হালকা হয়। দহনের ফলে উত্তপ্ত উৎপন্ন বস্তু এই কারণেই যেখানে উৎপন্ন হয় সেখানে থাকে না, অর্থাৎ আগুনের শিখার চারপাশে থাকে না, বরং নতুন আগত বাতাসের দ্বারা তাড়িত হয়ে উপরে উঠে যায়। যদি বায়বীয় পদার্থের ক্ষেত্রে আর্কিমিডিসের নিয়ম না খাটত, অথবা অভিকর্ষ বলে কোনো বস্তু যদি না থাকত, তাহলে প্রত্যেক আগুনের শিখা কিছুক্ষণ জ্বলেই আপনা-আপনি নিভে যেত।

আগুনের শিখার দহনের পক্ষে, দহনের ফলে উৎপন্ন বস্তু কত ক্ষতিকারক। বাতি ফুঁ দিয়ে নেভাতে গিয়ে তোমরা এই কাজটি কর, যদিও নিজেদের অজান্তে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তোমরা কিভাবে নেভাও? উপর থেকে তোমরা ফুঁ দাও, অর্থাৎ দহনের ফলে উৎপন্ন অদাহ্য বস্তুকে চাপ দিয়ে শিখার কাছাকাছি পাঠিয়ে দিয়ে থাক: ফলে অতিরিক্ত মুক্ত বাতাস না থাকায় আগুনের শিখা নিভে যায়।

জুল ভার্নে যে অধ্যায় লেখেন নি

জুল ভার্নে তিনজন দুঃসাহসী যাত্রীর চন্দ্র অভিমুখে প্রক্ষিপ্ত বস্তু (Projectile)-তে চড়ে দুর্ধর্ষ অভিযানের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই বিশেষ অস্বাভাবিক অবস্থায় মিচেল আর্ডেন কিভাবে রান্না করেছিলেন তা আমাদের কাছে বর্ণনা করতে ভুলে গেছেন। খুব সম্ভবত মহাশূন্যে রান্নার বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি মনে করেন নি। এটা উপন্যাস রচয়িতার এক মস্ত ত্রুটি। তার কারণ মহাশূন্যে ধাবমান প্রক্ষিপ্ত বস্তুটির মধ্যেকার সবকিছুই ভারহীন অবস্থায় থাকে। (এই বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপক বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনার জন্য গ্রন্থকারের এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য) এটা খুবই দুঃখজনক যে, জুল ভার্নের মত বিজ্ঞান-নির্ভর ঔপন্যাসিক এমন একটা কৌতূহল উদ্দীপক বিষয় বাদ দিয়ে যাবেন। কারণ আমার সঙ্গে সকলেই নিশ্চয়ই একমত হবে যে, ভারহীন রান্নাঘরে রান্নার বিষয়টায় প্রভূত কল্পনার খোরাক ছিল। প্রতিভাবান লেখকের 'জার্নি টু দি মুন' (চাঁদে যাত্রা) গ্রন্থে অনুপস্থিত এ বিষয়টি নিয়ে রচনার

সাধ্যমত চেষ্টা করে দেখা যাক। কিন্তু জুল ভার্নেকে অনুকরণ করার এই দীন প্রচেষ্টা পাঠ করার সময় ভুলে যেও না যে, প্রক্ষিপ্ত বস্তুর মধ্যে 'অভিকর্ষ' বলে কিছু ছিল না ; ভেতরকার কোনো বস্তুরই ওজন এক আউন্সের ভগ্নাংশমাত্রও নয়।

ভারহীন অবস্থায় প্রাতরাশ

"বন্ধুগণ ! এখনও আমাদের প্রাতরাশ হল না", মিচেল আরডেন বললেন। "আমরা আমাদের ভার হারাতে পারি, কিন্তু ক্ষুধা তো হারাই নি। সুতরাং আমি তোমাদের জন্য এখন ভারহীন প্রাতরাশ প্রস্তুত করি। আমি নিশ্চিত যে, তোমরা যে সব প্রাতরাশ এ পর্যন্ত খেয়েছ এটি হবে তার মধ্যে সবচেয়ে হালকা।"

আর উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে ফরাসী মানুষটি প্রাতরাশ প্রস্তুতে মন দিলেন।

"মনে হচ্ছে আমাদের জলের বোতল খালি"—আরডেন আপন মনেই বিড় বিড় করে উচ্চারণ করলেন, জলের বড় বোতলটার ছিপি খুলতে খুলতে। "কিন্তু তুমি আমাকে বোকা বানাতে পারবে না, আমি জানি তুমি কেন এত হালকা। এই তো, ছিপি খুলে গেছে। এবার এগিয়ে যাও। পাত্রে তোমার ভারহীন বস্তুটা ঢালো দেখি!"—বোতলটাকে সম্বোধন করেই আরডেন যেন স্বগত উক্তিগুলো করে গেলেন।

তিনি বোতলটাকে এদিক ওদিক ঝাঁকালেন কিন্তু জল পড়ল না।

"তুমি বৃথাই চেষ্টা করছ আরডেন",—প্রিয়বন্ধুর সাহায্যে এগিয়ে এসে নিকোল বললেন। "তোমার বোঝা উচিত আমাদের উৎক্ষিপ্ত বস্তুর মধ্যে যেখানে কোনো অভিকর্ষ'ই নেই, সেখানে জল একটুও পড়বে না ! তোমাকে এটা নাড়িয়ে নাড়িয়ে ঘন সিরাপের মত ঢালতে হবে।"

আরডেন তৎক্ষণাৎ নাড়ানো বোতলটার তলদেশে জোরে জোরে থাপ্পর মারলেন। কী আশ্চর্য, হাতের মুঠোর মত মস্ত বোতলটার মুখ থেকে মস্ত একটা জলের বল বেরিয়ে এল—জমাট, শক্ত।

"জলের কি হল ?"—পরম বিস্ময়ে উচ্চারণ করলেন আরডেন। এমনটি তো আশা করি নি ! বিজ্ঞ বন্ধুগণ, অনুগ্রহ করে একটু বুঝিয়ে বল না, কি ঘটল ?"

"প্রিয় আরডেন, ওটা এক বিন্দু জল ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারহীন জগতে, যেখানে অভিকর্ষ বলে কিছু নেই, তরল বিন্দু যে কোনো আকার নিতে পারে। মোট কথা, অভিকর্ষকে ধন্যবাদ, তরল পদার্থ যে পাত্রে থাকে সেই পাত্রের আকারই ধারণ করে, স্রোতের আকারে পড়ে, ইত্যাদি। যেহেতু সবই ভারহীন, তরল পদার্থ তার নিজের অভ্যন্তরীণ অণুগুলোর বলের উপর অবস্থান

করে। সেই কারণেই স্বাভাবিকভাবেই তরল পদার্থ গোলকের আকার নেয়, প্ল্যাটুর বিখ্যাত পরীক্ষায় তেল যেমন আকার ধারণ করেছিল।"

"প্ল্যাটু ও তাঁর বিখ্যাত পরীক্ষাকে আমি থোরাই কেয়ার করি। আমাকে জল ফোটাতেই হবে প্রাতরাশের জন্য, আমি জোর করে বলতে পারি কোনো আণবিক বলই আমায় বাধা দিতে পারবে না।"—ফরাসী ভদ্রলোক ক্ষেপে গেলেন।

ঝাঁকিয়ে জলটা পাত্রে ঢালার জন্য তিনি বোতলটা খুব রাগের সঙ্গে ঝাঁকালেন। কিন্তু পাত্রটা আবার বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সব কিছুই যেন বাদ সাধছে। জলের মস্ত মস্ত ফোঁটা পাত্রের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে থাকল যখনই পাত্রের সংস্পর্শে এলঃ তারা টপকে টপকে বাইরে পড়তে থাকল এবং শীঘ্রই পাত্রটা জলের ঘন আস্তরণে ঢেকে গেল। এই অবস্থায় জলকে ফোটানোর প্রশ্নই ওঠে না।

"একত্রে এঁটে থাকার মস্ত বলের একটা চমকপ্রদ পরীক্ষা আছে", স্থির চিত্ত নিকোল রুষ্ট ফরাসী ভদ্রলোককে বললেন। "অত উত্তেজিত হয়ো না। তুমি কঠিন বস্তুর সাধারণ আর্দ্র অবস্থা নিয়ে পরীক্ষা করছ, পার্থক্য শুধু এই, এক্ষেত্রে অভিকর্ষ কোনোরকম বাধা দিচ্ছে না। সুতরাং তুমি সমস্ত প্রক্রিয়াটাই দেখতে পারছ।"

"খুবই দুঃখের বিষয় যে, এটা বাধা দিচ্ছে না!"—আরডেন খুব উত্তেজিত হয়ে বাধা দিলেন। "এবং এটা ভিজানোর বিষয়, না অন্য কিছু, তা জানি না, তবে আমার তো জল পাত্রের মধ্যে থাকা দরকার, নিশ্চয়ই চারধারে নয়। দেখ, দেখ, একবার ভালো করে চেয়ে দেখ! কে এই অবস্থায় রান্না করতে রাজি হবে!"

"তুমি ওটা সহজেই বন্ধ করতে পার যদি ওটা তোমার মতানুসারে হয়," মিঃ বারবিকেন জোর গলায় ঘোষণা করলেন। "মনে রেখ গ্রীজ বা তৈলাক্ত পদার্থ দিয়ে হালকাভাবে প্রলেপিত বস্তুকে জল ভেজাতে পারে না। বাইরে প্রলেপটা মাখাও, তাহলে জল ভেতরে থাকবে।"

"ভালো কথা, এটাই তো প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা"—উৎফুল্ল আরডেন উপদেশটা গ্রহণ করতে করতে বললেন। তারপর তিনি গ্যাস বার্নারটা জ্বালালেন, ফোটানোর জন্য পাত্রটাকে বসাতে, কিন্তু এবারও সবকিছু বাদ সাধল। এবার গ্যাস বার্নারটা খেয়াল খুশি মত কাজ শুরু করে দিল। এর আগুনের শিখা আধ মিনিটের মত কাঁপতে থাকল তারপর আবার নিভে গেল। আরডেন অবাক হয়ে গেলেন। তিনি আগুনটার পরিচর্যা করতে লাগলেন কিন্তু তার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হল। আগুনের শিখা জ্বলল না।

"বারবিকেন ! নিকোল !! এই অবাধ্য শিখাটিকে জ্বালিয়ে রাখার জন্য তোমাদের পদার্থবিদ্যার নিয়মানুসারে এবং গ্যাস কোম্পানীগুলোর বিধি অনুসারে কি কোনো পথ নেই ?"—মনমরা ফরাসী ভদ্রলোকটি বন্ধুদ্বয়ের কাছে কাতর প্রার্থনা জানালেন।

"এর মধ্যে অস্বাভাবিক বা আশানুরূপ নয় এমন কিছু তো দেখছি না," নিকোল বোঝাতে লাগলেন। "আগুনের শিখাটি প্রকৃতপক্ষে পদার্থবিদ্যার নিয়মানুসারে যেমন জ্বলা উচিত তেমনিই জ্বলছে। আর গ্যাস কোম্পানীর বিধি-বিধানের কথা বলছ, আমার ধারণা কোম্পানীগুলো গোল্লায় যেত যদি অভিকর্ষ বলে কিছু না থাকত। তোমাদের অজানা নেই যে, দহনক্রিয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প সৃষ্টি করে—দুটোই গ্যাস—যা জ্বলে না। সাধারণভাবে এই দুটি পদার্থ শিখার কাছে থাকে না, কারণ তারা উত্তপ্ত এবং সেই কারণে হালকা এবং নতুন বায়ুর প্রবাহ তাদের স্থানান্তরিত করে। কিন্তু এখানে আমাদের অভিকর্ষ না থাকায় উৎপন্ন পদার্থ দুটি যেখানে উৎপন্ন হয় সেখানেই থেকে যায়—স্থানান্তরিত হয় না। তারা শিখাটিকে ঘেরাও করে রাখে এবং নতুন বাতাসের আগমনে বাধা দেয়। এই কারণেই শিখাটি হয় বিবর্ণ এবং খুব তাড়াতাড়ি নিভে যায়। প্রসঙ্গক্রমে আগুন নেভানোর জন্য ঠিক এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, অদাহ্য কোনো গ্যাস দিয়ে আগুনকে ঘিরে ধরা হয়।"

"ওটার অর্থ, আমাদের জননী পৃথিবীর যদি অভিকর্ষ না থাকত তাহলে দমকল বাহিনীর প্রয়োজন হত না, এবং আগুন নিভে যেত আপনা-আপনি নিজেরাই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ? এটা কি ঠিক ?"—ফরাসী ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন।

"নিশ্চয়ই। কিন্তু প্রাতরাশটা তৈরি করার জন্য, এসো বার্নারটা আর একবার জ্বালাই এবং শিখার উপর আমরা ফুঁ দিই, অগ্নি-নির্বাপক গ্যাস দুটিকে সরিয়ে দেবার জন্য। এইভাবে, আমার মনে হয়, আমরা কৃত্রিম শুকনো আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে পারি এবং পৃথিবীপৃষ্ঠে ঘরে যেমন জ্বলে এখানেও আগুনের শিখা তেমনই জ্বলবে।"

তাই করা হল। আরডেন আর একবার বার্নারটা জ্বাললেন এবং রান্না করতে লাগলেন। রান্নার ফাঁকে ফাঁকে দেখতে লাগলেন, কোনোরকম অশুভ কামনা না করে অগ্নিশিখাটিকে প্রজ্বলিত রাখার জন্য নিকোল ও বারবিকেন কিভাবে পর্যায়-ক্রমে ফুঁ দিচ্ছে ও হাওয়া করছে। কিন্তু ফরাসী ভদ্রলোকের অন্তরের গভীরতম প্রদেশের ধারণা যে, শিখা না জ্বলার ও সমস্ত অসুবিধার কারণ তার বন্ধুদ্বয় ও তাঁদের বিজ্ঞান।

"হা-হা ! তোমরা দেখছি চোঙের (চিমনির) মতই বেশ কাজের।"—আরডেন

সাগ্রহে বললেন। "পণ্ডিত তোমাদের জন্য খুব দুঃখ হচ্ছে, বন্ধু; কিন্তু প্রাতরাশ গরম গরম খেতে হলে তোমাদের পদার্থবিদ্যার নিয়ম মেনে চলতে হবে।"

পনের মিনিট অতিবাহিত হয়ে গেল। তারপর আধ ঘণ্টা; তারপর পুরো এক ঘণ্টা। পাত্রটির বস্তু কিন্তু ফোটার কোনো লক্ষণই দেখালো না।

"প্রিয় আরডেন তোমাকে ধৈর্য ধরতে হবে। সাধারণ জল, যার ভার আছে, খুব তাড়াতাড়ি ফোটে, কেন? কেবল এই কারণেই যে, ওর বিভিন্ন স্তর পরস্পর মেশে। উত্তপ্ত এবং ফলে ওজনে হালকা নিচের স্তর অপেক্ষাকৃত শীতল ও ভারী স্তরের চাপে উপরে উঠে আসে এবং ফলে পাত্রের জলের সমস্তটাই তাড়াতাড়ি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কখনো জলকে উপর থেকে উত্তপ্ত করার চেষ্টা করেছ কি? তা হলে আর জলের বিভিন্ন স্তর মিশবে না, কারণ উত্তপ্ত উপরিভাগ সবসময়ই উপরে থাকবে। জল তাপের খুবই খারাপ পরিবাহী (Conductor)—নিশ্চয়ই তোমাদের জানা আছে। এর তাপ পরিবহণ ক্ষমতা, বলতে গেলে, নগণ্য। নিচে বরফের চাঁই রেখে জলকে উপর থেকে উত্তপ্ত করে ফোটানোর চেষ্টা করতে পার। কিন্তু এখানে, ভারহীন অবস্থায়, কোন দিক থেকে জলকে উত্তপ্ত করা হচ্ছে, সে প্রশ্নই ওঠে না। পাত্রের বিভিন্ন জলের স্তর মিশবে না এবং জল খুব ধীরে ধীরে গরম হবে। তাড়াতাড়ি গরম করতে চাইলে, জলকে অনবরত ঘুঁটতে হবে।"

নিকোল আরডেনকে সাবধান করে দিলেন, "জলকে ফুটন্ত জলের উষ্ণতায় না এনে ঐ উষ্ণতার সামান্য নিচে রেখ। ফুটন্ত জলের উষ্ণতায় নিয়ে এলে, তিনি বোঝাতে লাগলেন, প্রচুর বাষ্প হবে। যেহেতু ভারহীন অবস্থায়, জলের ও বাষ্পের আপেক্ষিক গুরুত্ব একই হবে,—দুটোই শূন্য হবে—এটা জলের সঙ্গে মিশে যাবে এবং একটা সমসত্ত্ব (Homogeneous) ফেনার উদ্ভব হবে।"

আরডেন ছোলার ব্যাগটা খুলতে গিয়ে সবচেয়ে বিরক্ত হলেন। তিনি একটা ব্যাগ একটু নাড়াতেই ছোলাগুলো গড়াতে গড়াতে চারদিকে বাতাসে ছড়িয়ে গেল, দেওয়ালে দেওয়ালে ধাক্কা খেল, টপকে বেরিয়ে গেল। মস্ত একটা দুর্ভাগ্য যেন ডেকে আনল ওগুলো। নিকোল দৈবক্রমে একটা শুঁকে ফেলেছিলেন এবং প্রায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। বিপদটা ওতরানোর জন্য এবং ছোলাগুলো উদ্ধার করার জন্য আমাদের বন্ধুরা প্রজাপতি ধরার একটা জাল দিয়ে ওগুলো ধরতে লাগলেন। চাঁদের প্রজাপতি ধারার জন্য আরডেন ওটা সঙ্গে নিয়েছিলেন।

এ রকম প্রতিকূল অবস্থায় রান্না করা সত্যিই দুঃসাধ্য ব্যাপার। আরডেন ঠিকই বলেছিলেন এ রকম অবস্থায় অভিজ্ঞ পাচকও রান্না-বান্নায় সমস্ত উপকরণ ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। মাংস চাপাতে গিয়ে আরও বিপদ দেখা দিল। চিমটে দিয়ে মাংসটা ঝুলিয়ে রাখতে হল, কারণ ওর নিচের উত্তপ্ত তেলের বাষ্প আধ-সিদ্ধ মাংসটা উপরে তুলে দিচ্ছিল—লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছিল মাংস। শূন্যে 'উপর-

নিচ' বলে কিছুই নেই, তবুও বোঝানোর স্বার্থে 'উপরে' কথাটা ব্যবহার করা হল।

ভারহীন এ রকম জগতে খাওয়া-দাওয়া করাও এক অদ্ভুত বিচিত্র দৃশ্যের সৃষ্টি করল। নানারকম ভঙ্গিমায় তাঁরা বায়ুমণ্ডলের মধ্যবর্তী স্তরে ঝুলতে থাকল। তাদের মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি লাগতে লাগল। স্বভাবতই এ অবস্থায় বসা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। চেয়ার, টেবিল, কোচ, বেঞ্চি ভারহীন জগতে কোনো কাজেই আসে না। আরডেন 'প্রাতরাশ টেবিল', 'প্রাতরাশ টেবিল' বলে পীড়াপীড়ি করছিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ রকম জগতে টেবিলের কোনো প্রয়োজনই ছিল না।

প্রাতরাশ তৈরি করাই ছিল কঠিন, আরও কঠিন হয়ে দাঁড়াল প্রাতরাশ খাওয়া। প্রথমত আরডেন কঠিন তরল ঢালতেই পারলেন না। সারা সকালের পরিশ্রমই পণ্ডশ্রমে পরিণত হল। ভুলে গিয়েছিলেন তৈরী সুপটাও ভারহীন। অবাধ্য সুপটা বার করার জন্য উপুড় করা বোতলটার পেছনে তিনি জোরে জোরে থাপ্পর মারতে লাগলেন। মস্ত একটা গোলাকার ফোঁটা উড়ে গেল—সুপটাই অমন আকার নিয়েছে। আরডেনকে বাজীকরের কলাকৌশলের নানা কেরামতি দেখাতে হল এত কষ্ট করে তৈরী সুপটাকে ধরা ও পাত্রে রাখার জন্য।

চামচগুলো কোনো কাজেই এল না। সুপ আঙুলের ডগা পর্যন্ত চামচগুলো ভিজিয়ে দিল। তিন বন্ধু তখন চামচগুলোয় মাখন মাখিয়ে নিলেন যাতে না ভেজে, কিন্তু কোনো ফল হল না। সুপটা ছোট বলের আকার নিল কিন্তু তাঁরা কিছুতেই ঐ ভারহীন সুপের বড়ি মুখে দিতে পারলেন না।

শেষে নিকোল একটা উপায় বার করলেন। তিনি কিছু মোম মাখানো কাগজ পাকিয়ে টিউবের মত করলেন এবং তিনজন অভিযাত্রী সুপটা চুষে খেলেন ঐ টিউবের মধ্য থেকে। একই পদ্ধতি তাঁরা গ্রহণ করলেন জল, মদ ও অন্যান্য তরল পদার্থ পান করার জন্য। (এই বই-এর প্রথম খণ্ড পড়ে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করে আমাকে লিখে পাঠিয়েছ ভারহীন রাজ্যে এই পদ্ধতিতেও কিভাবে পান করা সম্ভব হবে। উৎক্ষিপ্ত বস্তুটির—প্রজেক্টাইলের ভেতরের বাতাসেরও কোনো ওজন নেই, ফলে এর কোনো চাপ নেই। অতএব চুষে চুষে তরল পান করাও অসম্ভব।

খুবই বিস্ময়ের, এ মতটা কিছু কিছু মদত পেয়েছিল। কিন্তু এটা তো ঠিক যে, বাতাসের ভারহীনতা চাপের উপর কোনো প্রভাবই বিস্তার করতে পারে না। বদ্ধ জায়গায় বাতাস যে চাপ দেয় তা তার ওজন আছে বলে মোটেই নয়, বরং তার কারণ বায়বীয় পদার্থ হিসেবে এর সম্প্রসারণের প্রবণতার সীমা নেই। আমাদের গ্রহের উন্মুক্ত শূন্যে অভিকর্ষই সম্প্রসারণের বাধা এবং এই প্রথানুযায়ী পারস্পরিক সম্পর্কই আমার সমালোচকের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল।)

জল আগুন নেভায় কেন ?

প্রশ্নটা খুবই সোজা। কিন্তু অনেকেই ঠিক উত্তরটা দিতে পারে না। আশা করি তোমরা আমায় ভুল বুঝবে না, যদি আগুনের সঙ্গে জলের কাজ কি তা একটু বুঝিয়ে বলি। প্রথমত, জল জ্বলন্ত বস্তুর সংস্পর্শে এলেই বাষ্পীভূত হয়, ফলে জ্বলন্ত বস্তু তার উত্তাপ অনেকখানি হারায়। প্রকৃত পক্ষে সমপরিমাণ শীতল জলকে ফুটন্ত অবস্থায় আনতে যে পরিমাণ উত্তাপের প্রয়োজন হয় ফুটন্ত জলকে বাষ্পে পরিণত করতে তার চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি উত্তাপের প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয়ত, এইভাবে জল থেকে উদ্ভূত বাষ্প আয়তনে জল অপেক্ষা কয়েক'শ গুণ বেশি জায়গা অধিকার করে। উদ্ভূত বাষ্প জ্বলন্ত বস্তুটিকে ঘিরে ধরে এবং নতুন বাতাসের প্রবাহকে দূরে রাখে। বাতাস ছাড়া 'দহন' অসম্ভব।

আরও ভাল অগ্নি নির্বাপক হিসাবে কাজ করানোর জন্য জলের সঙ্গে বারুদ মেশানো হয়। স্ববিরোধী (Paradox) মনে হলেও এর মধ্যে যুক্তি আছে। বারুদ তাড়াতাড়ি জ্বলে যায়, আর এই জ্বলার সময় প্রচুর পরিমাণে অদাহ্য গ্যাসের উদ্গিরণ করে। এই অদাহ্য গ্যাস জ্বলন্ত বস্তুটিকে ঘেরাও করে দহন জটিল করে তোলে।

আগুন দিয়ে আগুন নেভানো

তোমরা সম্ভবত জানো অরণ্যের আগুন নেভানোর জন্য অরণ্যের যে দিকে আগুন জ্বলছে তার অপর দিকে আগুন জ্বেলে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় আগুন প্রথম আগুনের দিকে ছুটে যায় এবং দাহ্য বস্তুগুলো আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করে প্রথম জ্বলা আগুনটির জ্বালানি ফুরিয়ে দেয়। এরপর তাদের যখন পরস্পরের সাক্ষাৎ হয়, আগুনের দেওয়াল দুটো ধ্বংস হয়ে যায়, যেন পরস্পরের সঙ্গে মারামারি করে দুটিতেই মরা পড়ে।

তোমরা নিশ্চয়ই ফেনিমোর কুপার-এর 'প্রেইরী' রচনায় এ সম্বন্ধে পড়ে থাকবে। সেই চরম উত্তেজনাময় নাটকীয় মুহূর্তটি তোমরা নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি, যখন বৃদ্ধ অরণ্যচারী মৃত্যুর হাত থেকে পথিকদের বাঁচিয়ে ছিলেন ? তবু ওর সারাংশটা তুলে দেওয়া হল ঃ

"...বৃদ্ধ মানুষটি...হঠাৎ অদ্ভূত মূর্তি ধারণ করলেন।

" 'এখনই উঠে পড়ে কাজে লাগতে হবে,'—তিনি বললেন।

" 'অনেক দেরীতে তোমার স্মরণে এল, হতভাগ্য বৃদ্ধ,—মিড্‌লটন চীৎকার করে উঠলেন। 'আগুনের শিখা আমাদের থেকে আর মাত্র $\frac{1}{4}$ মাইল দূরে এবং বাতাস ভয়ঙ্করভাবে ওকে এই অঞ্চলে ছুটিয়ে নিয়ে আসছে।"

"হায়! আগুনের শিখা! আগুনের কুণ্ডলি! আমি ওকে থোরাই পরোয়া করি···এসো, বালকেরা এসো···এই ছোট ঝরা ঘাসের উপর হাত রেখে আমি

চিত্র ৪৪



আগুন দিয়ে আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ।

যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, মাটিটা ঘাসশূন্য করে ফেল।···কুড়ি ফুট ব্যাসের গোলাকার ভূমিকে তৃণশূন্য করতে মাত্র কয়েক মুহূর্ত যথেষ্ট। এই ছোট ক্ষেত্রটুকুর এক প্রান্তে বৃদ্ধ মানুষটি মহিলাদের এনে জড়ো করলেন। মিডলটন ও পলকে বললেন তাদের হালকা, অগ্নিদাহ্য পোশাকগুলো দলের চাদর দিয়ে মুড়ে ফেলতে। সাবধান হয়ে যাবার পর মুহূর্তেই, বৃদ্ধ তৃণভূমির অপরপ্রান্তে চলে গেলেন। ওখানটা তখনো দীর্ঘকায় ভয়ংকর বৃত্ত পরিব্যাপ্ত। তিনি শুকনো একমুঠো লতাপাতা খুঁজে নিলেন। তারপর সেগুলো বন্দুকের খোলে পুরে দিলেন। আগুনের ঝলসানিতে শুকনো দাহ্যবস্তুগুলো জ্বলে উঠল। তারপর তিনি ঐ সামান্য অগ্নিশিখা দণ্ডায়মান ধোঁয়ার শয্যার মধ্যে ফেললেন। তারপর অগ্নিসংযোগ ঘটিয়ে বৃত্তের কেন্দ্রে চলে এলেন ধৈর্য ধরে 'কি হয়' দেখার জন্য।

"সুক্ষ্ম বস্তুটি নতুন ইন্ধনের জন্য লালায়িত হয়ে উঠল এবং মুহূর্তের মধ্যে ঘাসের মধ্যে অগ্নিশিখা ছড়িয়ে পড়ল···

"এবার', আঙুল তুলে তাঁর স্বভাবসুলভ শান্তভাবে হাসতে হাসতে বলে উঠলেন, 'তোমরা দেখতে পাবে কিভাবে আগুন আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ করে'·····

" 'কিন্তু এটা কি বিপজ্জনক নয়?'—বিস্মিত মিডলটন চীৎকার জুড়ে দিলেন; 'শত্রুকে এড়িয়ে না গিয়ে তাকে কি আরও কাছে টেনে আনা হচ্ছে না? ···আগুন শক্তি ও উত্তাপ পেয়ে তিন দিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল, জ্বালানীর অভাবে চতুর্থদিকে নিভতে নিভতে। আগুন যতই বাড়তে লাগল এবং স্ফীতকায়

গর্জন যতই এর শক্তি ঘোষণা করতে লাগল, এ এর সম্মুখের কিছুই পুড়িয়ে নিঃশেষিত করে দিল। কাস্তে দিয়ে ছেঁটে পরিষ্কার করে দেওয়ার চেয়ে ধোঁয়াটে পোড়া মাটি আরও যেন উন্মুক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু পলায়মান পথিকদের অবস্থা এখনো সংকটপূর্ণ হত যদি না আগুন ঘিরে ধরার সময় নিরাপদ স্থানটির ক্ষেত্র বৃদ্ধি পেত। বৃদ্ধ অরণ্যচারী যে দিকটায় ঘাসগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন সে দিকে এগিয়ে এসে তারা উত্তাপের হাত থেকে রেহাই পেলেন। তাঁদের ধোঁয়ার মেঘে ঢেকে দিয়ে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই চারদিকেই অগ্নিশিখা পশ্চাদপসরণ করতে লাগল। কিন্তু আগুনের লেলিহান শিখা তখনও পাক খেতে খেতে অগ্রবর্তী হচ্ছে। তারা কিন্তু আগুনের ভয়ংকর ঝড় থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ হলেন।

"দর্শকমণ্ডলী অরণ্যচারী বৃদ্ধের এই সহজ পরীক্ষাটা, কলম্বাসের প্রান্তের উপর ডিম দাঁড় করানোর পরীক্ষাটা ফারডিনাণ্ডের পারিষদের যে রকম বিস্ময়ের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন, ঠিক সেই রকম বিস্ময়ের সঙ্গে গ্রহণ করলেন।···

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন, অরণ্য কি প্রেইরী বনভূমির আগুন নেভানোর পদ্ধতিটা যত সহজ মনে হয়, ঠিক তত সহজ নয়। খুব কুশলী হাতের প্রয়োজন এই কাজে। পারদর্শিতা না থাকলে ঘটনা আরও খারাপের দিকে যেতে পারে।

আমি কি বোঝাতে চাইছি তোমরা সহজেই বুঝতে পারবে যদি তোমরা নিজেদের প্রশ্ন করঃ বৃদ্ধ অরণ্যচারী যে আগুন জ্বালিয়েছিলেন তা অপর আগুনের দিকে ছুটে যাচ্ছিল কেন, বিপরীত দিকে না ছুটে? বস্তুত, বাতাস ছুটছিল পথিকদের মুখের দিকে এবং আগুনকে তাদের দিকে ছুটিয়ে আনছিল। যদি বৃদ্ধের জ্বালা আগুন অপর দিকে না ছুটত? সে অবস্থায় পথিকেরা দেখতেন আগুনের কুণ্ডলী তাঁদের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে এবং নিজেরাই পুড়ে শেষ হয়ে যেতেন।

তাহলে বৃদ্ধের জানা গুপ্ত বিষয়টি কি? বিষয়টি হল, পদার্থবিদ্যার একটা সহজ নিয়ম তাঁর জানা ছিল। যদিও বাতাস জ্বলন্ত প্রেইরী অঞ্চল থেকে পথিকদের দিকে প্রবাহিত হচ্ছিল, অগ্নিশিখাগুলোর ঠিক সামনে বিপরীত দিক থেকেও আর একটা বায়ুপ্রবাহ আসছিল। বস্তুতঃই, নিচের আগুন দ্বারা উত্তপ্ত হয়ে, এর উপরকার বাতাস হালকা হয়ে প্রেইরী থেকে ছুটে আসা অপেক্ষাকৃত শীতল বাতাসের ধাক্কায় উপরে উঠে যাচ্ছিল। এই কারণেই অগ্নিশিখার প্রান্ত ভাগে একটা শুষ্ক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়।

আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ করার আগুন ধরাতে হবে যখন মূল আগুন, এই শুষ্ক বাতাস একজন বোধ করতে পারে এরকম একেবারে কাছে চলে এসেছে। আর এই

কারনেই অরণ্যচারী বৃদ্ধ মানুষটি তাড়াহুড়ো করেন নি, প্রয়োজনীয় মুহূর্তটির জন্য শান্তচিত্তে অপেক্ষা করেছেন। যদি এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের পূর্বে তিনি আগুন জ্বালিয়ে দিতেন, তাহলে তাঁর জ্বালা আগুন উল্টোদিকে ছড়িয়ে পড়ত এবং পথিকদের দারুন সংকটপূর্ণ আবর্তে নিক্ষেপ করত। আবার খুব বেশি দেরী হয়ে গেলেও ঠিক তদনুরূপ ঝুঁকি ছিল, কারণ আগুন তাহলে খুবই কাছে এসে পড়ত।

আমরা কি ফুটন্ত জলে জল ফোটাতে পারি

একটা ছোট জার বা বোতল নাও। পাত্রটা জলে পূর্ণ কর এবং এটাকে একটা জলপূর্ণ পাত্রের উপর বসাও যেটা আগুনের উপর বসানো হয়েছে। কিন্তু ওটা যেন এটার তলদেশ স্পর্শ না করে। শেষের শর্তটি পূরণের জন্য একটা তারের ফাঁসে পাত্রটিকে ঝুলিয়ে দিতে পার। মনে হতে পারে আগুনের উপর বসানো পাত্রের জল যখন ফুটবে, জার বা বোতলের জলও তখন ফুটবে। কিন্তু, প্রকৃত পক্ষে যতক্ষণই অপেক্ষা কর না কেন, তা কখনই ঘটবে না। জারের জল গরম হবে খুব, কিন্তু ফুটবে না। ফুটন্ত জল, আমরা দেখতে পাই, খুব গরম হলেও, জল ফোটানোর মত যথেষ্ট গরম নয়।

বিষয়টা বিস্ময়কর, সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই অভিপ্রেত হওয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে, জলকে ফুটন্ত অবস্থায় আনতে, একে 100°C তাপমাত্রা পর্যন্ত উত্তপ্ত করাই যথেষ্ট নয়। আরও উত্তাপের প্রয়োজন পরবর্তী ধাপে যাবার জন্য অর্থাৎ জলকে পরবর্তী স্তরে, বাষ্পে, নিয়ে যাবার জন্য।

পরিশুদ্ধ জল 100°C-এ ফোটে। সাধারণ অবস্থায় এটা তার অধিক উষ্ণতায় ওঠে না, আমরা যতই একে উত্তপ্ত করি না কেন। এর অর্থ দাঁড়ায়, জারের জলকে উত্তপ্ত করার জন্য আমরা যে উত্তাপ ব্যবহার করছি তার উষ্ণতা 100°C এবং তার বেশি নয়। যখন দুই পাত্রের উষ্ণতা সমান হয়, পাত্রের জল জারের জলকে তার অধিক উষ্ণতা দিতে পারে না।

মোট কথা ঃ এইভাবে জারের জলকে উত্তপ্ত করতে আমরা একে সেই পরিমাণ উত্তাপ দিতে পারি না যা জলকে বাষ্পে পরিণত করার জন্য প্রয়োজন। (100° সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতায় উত্তপ্ত প্রতি গ্রাম জলকে পরবর্তী বাষ্পের স্তরে নিয়ে যাবার জন্য আরও 500 ক্যালরি উত্তাপের প্রয়োজন।) এই কারণেই জারের জল গরম হলেও ফোটে না।

তোমরা বোধ হয় জানতে চাইবে জারের জল ও পাত্রের জলের মধ্যে পার্থক্য কি? বস্তুত, উভয় পাত্রেরই জল একই রকম। পার্থক্য একমাত্র এই যে, পাত্রের জল থেকে জারের জল কাচের একটা দেওয়াল দিয়ে আলাদা করা। তা হলে এই জল পাত্রের জলের মত একই রকমভাবে প্রভাবিত হয় না কেন?

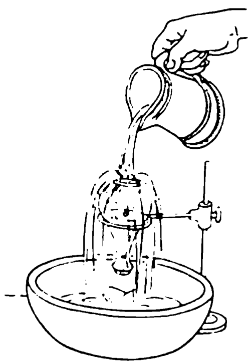
এর কারণ প্রধানত এই যে, কাচের দেওয়াল জারের জলকে, পাত্রের সমস্ত জল মিশ্রিত হবার জন্য যে প্রবাহের সৃষ্টি হয়, তাতে অংশগ্রহণ করতে বাধা দেয়। পাত্রের জলের প্রতিটি কণা পাত্রের তলদেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে। জারের জল কিন্তু ইতিমধ্যে পাত্রের ফুটন্ত জলের সংস্পর্শে আসে মাত্র।

অতএব, আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিশুদ্ধ ফুটন্ত জলে জল ফোটানো অসম্ভব। কিন্তু যেই মাত্র আমরা ওতে একটু লবণ মিশিয়ে নিই, ছবিটা পাল্টে যায়। লবণাক্ত জল 100° সেণ্টিগ্রেডে নয়, এর চেয়ে কিছু বেশি উষ্ণতায় ফোটে। ফলে জারের বিশুদ্ধ জল পাত্রের লবণাক্ত ফুটন্ত জলের সংস্পর্শে এসে ফুটতে থাকবে।

আমরা কি বরফে জল ফোটাতে পারি ?

ফুটন্ত জলই যখন জল ফোটাতে পারল না তখন বরফ কি করে জল ফোটাবে ? এ তো অসম্ভব কথা ! উত্তরে বলব, ভাল করে ভেবে দেখ, হঠাৎ কোনো সিদ্ধান্তে না আসাই বিজ্ঞানসম্মত। আগের পরীক্ষার কাচের জারটা ব্যবহার করে এই পরীক্ষাটা করে দেখ। এর অর্ধেকটা জলে পূর্ণ করে ওটাকে ফুটন্ত লবণাক্ত

চিত্র 85



ঠাণ্ডা জল ঢালার পর পাত্রের জল ফুটছে।

জলে ডোবাও। জারের জল ফুটতে আরম্ভ করলেই, এটা বার করে নাও এবং তাড়াতাড়ি শক্ত করে ছিপি দিয়ে বন্ধ কর। তারপর ওকে উল্টে ধর এবং ফোটা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। তারপর একটু ফুটন্ত জল ওর উপর ঢালো। ভেতরের জল ফুটবে না। কিন্তু জারের নিচে একটুকরো বরফ দাও কিংবা শীতল জল ওর গায়ে ঢালো, 85 নং চিত্রে যেমন দেখানো হয়েছে, জারের জল সঙ্গে সঙ্গে ফুটতে শুরু করবে। তাহলে ফুটন্ত জল যা পারল না, বরফ সেই অসম্ভবটি সম্ভব করে তুলল।

এটা আরও আশ্চর্যজনক এই কারণে যখন তুমি আঙুল দিয়ে স্পর্শ করবে, এটা খুব গরম বোধ হবে না। তবুও দেখতে পাবে ভেতরের জল ফুটছে। এর

চিত্র 86



আশাতীতভাবে ঠাণ্ডা করলে টিনের পাত্রের ক্ষেত্রে কি ঘটে।

উত্তর এই যে, বরফ জারের দেওয়াল বা গাগুলো বেশ ঠাণ্ডা করে দিয়েছে। ভেতরের বাষ্প ফোঁটায় ফোঁটায় জমে জল হয়েছে। কিন্তু জারের ভেতরের বাতাস জল ফোটার সময় বাইরে বেরিয়ে যাওয়ায়, এখন জারের ভেতরের জলের উপর চাপ অনেক কম। ইতিমধ্যেই তোমরা জেনেছ অপেক্ষাকৃত কম চাপে তরল পদার্থ কম উষ্ণতায় ফোটে। ফলে, আমরা জারের ভেতর ফুটন্ত জল পাচ্ছি। কিন্তু এমন ফুটন্ত জল যা খুব বেশি গরম নয়।

যদি জারের গাগুলো খুব পাতলা হয়, বাষ্পের হঠাৎ ঘনীভূত হবার সময় ছোট-খাটো বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। জারের ভেতর থেকে পর্যাপ্ত প্রতিরোধ না আসায়, বাইরের বাতাসের চাপ ওকে ফাটিয়ে দেবে। (প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন, 'বিস্ফোরণ' শব্দটি, বোধহয় এ ক্ষেত্রে, যথোপযুক্ত নয়।) গোলাকার পাত্র বা আধার ব্যবহার করাই এক্ষেত্রে বেশি যুক্তিযুক্ত—তাহলে বাইরের বাতাসের চাপ এর হেলান গায়ে পড়বে। কাঁচ ফাটবে না।

এই পরীক্ষাটা করার জন্য টিনের পাত্র ব্যবহার করা সবচেয়ে নিরাপদ। টিনের পাত্রে কিছু জল ফোটার পর, পাত্রটার ঢাকা খুব শক্ত করে বন্ধ কর। তারপর পাত্রটির গায়ে ঠান্ডা জল ঢালো। টিনের ভেতরের বাষ্প জলে ঘনীভূত হয়ে যাবার জন্য বাইরের বাতাসের চাপে টিনের গা ফেটে যাবে। মনে হবে টিনটাকে যেন ভারী হাতুড়ি দিয়ে পেটানো হয়েছে।

‘ব্যারোমিটার স্যুপ’

মার্ক টোয়েন তাঁর ‘এ ট্র্যাম্প আব্রড’ গ্রন্থে আল্‌প্‌স পর্বতে ওঠার সময় যে আজগুবি ঘটনা ঘটে তা নিম্নলিখিতভাবে বিবৃত করেছেন।

“আমাদের কষ্ট লাঘব হয়ে আসায়, আমি এখন ঠিক করলাম অভিযাত্রীরা তাঁবুতে বিশ্রাম নিক এবং অভিযানের বিজ্ঞানবিভাগকে একটা সুযোগ দেওয়া যাক। প্রথমে, কত উঁচুতে উঠেছি দেখার জন্য আমি চাপমান যন্ত্রের পরিমাপ গ্রহণ করলাম। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না যে এতে কোনো ফল হল। বিজ্ঞানসম্মত ধারণার দ্বারা আমি বুঝতে পারলাম তাপমান যন্ত্র বা চাপমান যন্ত্র ফোটানো দরকার তাদের নির্ভুল করার জন্য। কিন্তু বুঝতে পারলাম না কোনটাকে ফোটাতে হবে, তাই দুটোকেই ফোটালাম। তাতেও কোনো ফল হল না। সুতরাং দুটো যন্ত্রকেই ভাল করে পরীক্ষা করলাম এবং দেখতে পেলাম দুটোর মধ্যেই যথেষ্ট ত্রুটি আছে ঃ চাপমান যন্ত্রের পিতলের নির্দেশক (Pointer) ছাড়া কোনো কাটা ছিল না এবং তাপমান যন্ত্রের বর্তুলটি টিনের পাতের দ্বারা বোঝাই হয়ে ছিল।……

চিত্র 87



মার্ক টোয়েনের গবেষণা।

আর একটা চাপমান যন্ত্রের খোঁজ করলাম। এটা ছিল নতুন ও নির্ভুল। বিনের স্যুপে, যা পাচকেরা তখন তৈরি করছিল, আমি সেই স্যুপে ওটাকে আধঘণ্টা ফোটালাম। আশাতীত ফল পাওয়া গেল। যন্ত্রের কোনো ক্ষতিই হল না। কিন্তু পাচকের মতে স্যুপে এমনি একটা চাপমান যন্ত্রের স্বাদ নাকি পাওয়া যাচ্ছিল যে, প্রধান পাচক মূল্যের রসিদে নাম বদল করে বসলেন। স্যুপটা সকলেরই এত পছন্দ হল যে, আমি পাচককে প্রতিদিন ‘ব্যারোমিটার স্যুপ’ তৈরি করার জন্য আদেশ দিলাম। অবশ্য এ রকম ধারণাও দেখা দিল যে, চাপমান যন্ত্রের ক্ষতি হতে পারে, কিন্তু আমি তা ভ্রূক্ষেপই করলাম না।

আমি দেখিয়ে দিলাম যে, চাপমান যন্ত্রটির সাহায্যে আমার পছন্দমত যেহেতু পর্বতের উচ্চতা পরিমাপ করতে পারছি না, সুতরাং ওটা আমার আর কোনো প্রকৃত কাজে আসবে না।

কিন্তু ঠাট্টা-তামাসা থাক, আসল প্রশ্নের উত্তরটা চিন্তা করা যাক: আমরা আদতে কি ফুটিয়ে ছিলাম ? তাপমান যন্ত্র না চাপমান যন্ত্র ? উত্তর—তাপমান যন্ত্র। কেন ? তার ব্যাখ্যা এই:

আগেই আমরা অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি যে, জলের উপর চাপ যত কম হবে, জল তত কম তাপে ফুটবে। যেহেতু যত উপরে ওঠা যায় বায়ুমণ্ডলের চাপ তত কমে আসে, সুতরাং জল তত অধিকতর কম উষ্ণতায় ফোটে। বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন রকম চাপে বিশুদ্ধ জল কি রকম উষ্ণতায় ফুটবে তার একটা তালিকা নিম্নে দেওয়া হল:

সেণ্টিগ্রেড স্কেলে যে উষ্ণতায় জল ফোটে	মিলিমিটারে বায়ুমণ্ডলের চাপ
101	787·9
100	760
98	707
96	657·5
94	611
92	567
90	525·5
88	487
86	450

সুইজারল্যাণ্ডের বার্নে'তে যেখানে বাতাসের চাপ গড়ে 713 মি.মি. সেখানে 97·5°C উষ্ণতায় খোলা পাত্রে জল ফোটে অথচ মণ্ট ব্ল্যাঙ্কের চূড়ায় যেখানে বাতাসের চাপ 424 মি.মি. সেখানে মাত্র 84·5°C উষ্ণতায় জল ফোটে। প্রতি কি.মি. উর্ধ্বে যে উষ্ণতায় জল ফোটে তা 3° সেণ্টিগ্রেড করে নেমে আসে। সুতরাং জল যে উষ্ণতায় ফুটবে আমরা যদি তার পরিমাপ করি, অথবা মার্ক টোয়েনের কথায়, "যথাযথ তালিকার দিকে লক্ষ্য রেখে 'তাপমান যন্ত্রকে ফোটাও'," মানি, তাহলে আমরা ঐ উষ্ণতার সাহায্যে উচ্চতা পরিমাপ করতে পারব। অবশ্য এটা করতে যথাযথ তালিকাটি আমাদের সামনে থাকা দরকার যা মার্ক টোয়েন একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন।

এ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত যন্ত্রের নাম 'হিপসোমিটার' (Hypsometer)—ধাতব চাপমান যন্ত্রের মতই যা সহজে বহন করে নিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু এই যন্ত্র চাপমান যন্ত্রের চেয়ে অনেক নির্ভুলভাবে উচ্চতা গণনা করে দেখায়।

অবশ্য, চাপমান যন্ত্র আমরা কত উঁচুতে উঠেছি তাও জানায়, কারণ বায়ুমণ্ডলের চাপ মাপার জন্য একে সিদ্ধ করার প্রয়োজন হয় না ; বস্তুত যত উঁচুতে ওঠা যায় বায়ুমণ্ডলের চাপ ততই কমে আসে। এ ক্ষেত্রেও বায়ুমণ্ডলের চাপ সমুদ্রতল থেকে উপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে নেমে আসে তা দেখানোর জন্য আমাদের একটা তালিকার বা অন্তত যথাযথ সূত্রটি জানার প্রয়োজন হয়। হাস্যরসিক মানুষটি কিন্তু সবকিছু গুলিয়ে ফেলেছিলেন এবং তাই 'ব্যারোমিটার সুপ' রান্না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

ফুটন্ত জল কি সব সময় গরম ?

সাহসী ব্যাটম্যান বেন-জোউফ, যাঁর সম্বন্ধে জুল ভার্নের হেক্টর সেরভাডাক বইতে পড়েছ, স্থির নিশ্চিত ছিলেন যে, ফুটন্ত জল, যেখানেই ফোটানো হোক না কেন, সব সময়ই খুব গরম। আমার ধারণা তিনি বন্দুক নিয়েই সারা জীবন কাটিয়ে দিতেন যদি না সেরভাডাকের সঙ্গে ধূমকেতুতে তাঁর সাক্ষাৎ হয়ে যেত। এই অশুভ আকাশচারী বস্তুটি জননী পৃথিবীর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে একটা অংশ আমাদের দুই বীরকে তার উপর রেখে ছিন্ন করে দেয় এবং তাঁদের নিয়ে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে বহন করে বেড়ায়। এই সময়ই ব্যাটম্যান তাঁর জীবনে সর্বপ্রথম দেখতে পেলেন যে, ফুটন্ত জল সব জায়গায় একই রকম গরম নয়। প্রাতরাশ প্রস্তুত করার সময় তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে এই আবিষ্কারটি করে বসলেন।

"বেন-জোউফ পাত্রটি জলে পূর্ণ করে ফোটাতে দিলেন। তাঁর হাতে ডিম ছিল। পালকের মত এত হালকা ঠেকল সেগুলো যে, মনে হল ওদের ভেতরটা খালি।

"দু' মিনিটের মধ্যেই যখন জল ফুটতে শুরু করে দিল, বেন-জোউফ চীৎকার করে উঠলেন :

" 'কি সৌভাগ্য ! আগুনটা কত গরম !'

" 'আগুনটা বেশি গরম নয়,' সেরভাডাক একটু ভেবে উচ্চারণ করলেন, 'শুধু জল শীঘ্র ফুটছে।'

'তারপর তিনি দেয়াল থেকে তাপমান যন্ত্রটা নামিয়ে ফুটন্ত জলে ডোবালেন। তাপমান যন্ত্রে 66° সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতা সূচিত করল।

" 'ভগবান আমাদের রক্ষা করুন,' অধিনায়ক চীৎকার করে উঠলেন, 'জল 66 ডিগ্রীতে ফুটছে, 100 ডিগ্রীতে নয় !'

'ভালো কথা, কি বল অধিনায়ক ?'

" 'বেন-জোউফ, আমি পরামর্শ দিচ্ছি ডিমগুলো 15 মিনিট সেদ্ধ কর।'

" 'তাহলে তো ডিম খুব শক্ত ঠেকবে।'

" 'না, বন্ধু না, বরং তারা ঠিক ঠিক সিদ্ধ হয়ে উঠবে।'

"স্পষ্টতই এমনটি ঘটেছিল তার কারণ বায়ুমণ্ডলের উচ্চতা কমে গেছে। যে বায়ুস্তম্ভ ভূমিতে চাপ দিচ্ছে তার উচ্চতা এক-তৃতীয়াংশ কমে গেছে। ফলে জলের উপর চাপ কমে গেছে। এই হ্রাসপ্রাপ্ত চাপের জন্যই জল ফুটছে 100 ডিগ্রীর পরিবর্তে 66 ডিগ্রীতে। এ রকমই ঘটবে সমুদ্রতল থেকে 11 কিলোমিটার ঊর্ধ্বের পর্বতচূড়ায়। অধিনায়কের হাতে যদি চাপমান যন্ত্র থাকত, তাহলে তাও বায়ুমণ্ডলের চাপের হ্রাস সূচিত করত।"

তাঁদের এই অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। তাঁরা দাবি করেছেন 66° সেণ্টিগ্রেডে জল ফুটেছে। আমাদের তা সরাসরি মেনে নেওয়া উচিত। কিন্তু এটা খুবই সন্দেহজনক তাঁদের চারপাশের বিরল বায়ুমণ্ডলে অভিযাত্রীদ্বয় শারীরিক দিক থেকে সুস্থ ছিলেন কি না···।

জুল ভার্নে ঠিকই লক্ষ্য করেছিলেন যে, 11,000 মিটার ঊর্ধ্বে জল ঐ উষ্ণতায় ফুটছে। এই উচ্চতায়, গণনানুসারে, জল প্রকৃতপক্ষেই 66°C উষ্ণতায় ফুটবে। (আমরা যেমন পূর্বে লক্ষ্য করেছি, প্রতি কিলোমিটার ঊর্ধ্বে যে উষ্ণতায় জল ফোটে তা 3°C কমে আসে এবং সুতরাং 66° উষ্ণতায় জল ফোটাতে হলে অন্তত $34 : 3 \approx 11$ কিলোমিটার ঊর্ধ্বে উঠতে হবে।) এক্ষেত্রে বায়ুর চাপ হবে পারদ স্তম্ভের মাত্র 190 মি.মি., যা প্রকৃতপক্ষে সাধারণ বায়ুর চাপের এক-চতুর্থাংশ মাত্র। এই পরিমাণ স্বল্প বাতাসে শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া বাস্তবিক পক্ষে প্রায় অসম্ভব। আমরা জানি, বিমান চালকেরা, যাঁরা অক্সিজেন ছাড়া ঐ উচ্চতায় ওঠে, তাঁরা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু সেরভাডাক এবং তাঁর ব্যাটম্যান মোটামুটি সুস্থ অনুভব করেছিলেন। ভাগ্যে সারভাডাকের কাছে কোনো চাপমান যন্ত্র ছিল না; তাহলে পদার্থবিদ্যার নিয়মানুসারে চাপমান যন্ত্রটি যা নির্দেশ করতো জুল ভার্নেকে তার স্থানে অন্য অংকই দেখাতে হত।

যদি আমাদের দুই অভিযাত্রীদ্বয় কল্পিত ধূমকেতুতে না চড়ে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, মঙ্গল গ্রহে চড়ে বসতেন, যেখানে বায়ুর চাপ 60-70 মি.মি.-এর অধিক নয়, তা হলে তাঁরা আরও ঠাণ্ডা ফুটন্ত জল পান করতেন যার উত্তাপ মাত্র 45°C।

বিপরীত পক্ষে, গভীর খনির তলদেশে ফুটন্ত জল অত্যন্ত গরম হবে। কারণ সেখানে বায়ুর চাপ ভূ-ভাগের চেয়ে অপেক্ষাকৃতভাবে অনেক বেশি। 300 মি. নিচে জল ফোটে 101°C-এ এবং 600 মি. নিচে 102°C-এ।

চাপ যখন খুব বাড়ানো হয়, বাষ্পীয় ইঞ্জিনের বয়লারেও জল ফোটে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 14 এটিএম. বায়ুর চাপে জল ফুটবে 200°C-এ। বিপরীত পক্ষে বায়ু-নিষ্কাশন পাম্পের বেলজারে জল ঘরের উষ্ণতাতেই (Room temperature) ফুটবে। এক্ষেত্রে ফুটন্ত জলের উষ্ণতা হবে মাত্র 20°C।

উষ্ণ বরফ

এতক্ষণ আমরা ঠাণ্ডা ফুটন্ত জলের কথা বললাম। আরও বিস্ময়কর আর একটা জিনিস আছে—'গরম বরফ'। আমরা জানি জল 0°C উষ্ণতার উর্ধ্বে কঠিন অবস্থায় থাকতে পারে না। পদার্থবিদ ব্রিজ্‌ম্যান অবশ্য দেখিয়েছেন মোটেই তা নয়। খুব উচ্চ চাপে জল ঘনীভূত হয়ে কঠিন আকার নেয় এবং 0°C উষ্ণতার বেশ উর্ধ্বেও সেই অবস্থায় থাকতে পারে। সাধারণভাবে ঐ পদার্থবিদ দেখান যে, একের বেশি রকমেরও বরফ থাকতে পারে।

'আইস্ নং 5' বলে খ্যাত বরফ বাতাসের প্রচণ্ড চাপ 20,600 এটিএম.-এ পাওয়া যায়, এবং 76°C তাপমাত্রায় এটা কঠিন অবস্থায় থাকে। আমরা যদি এটা স্পর্শ করতে পারি, এটা আমাদের আঙুল প্রচণ্ডভাবে শিরশিরিয়ে দেবে। কিন্তু আমরা স্পর্শ করতে পারব না কারণ, সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ইস্পাতের তৈরী পুরু পাতের দেওয়াল বিশিষ্ট পাত্রে অত্যধিক চাপে এটা তৈরি করা হয়। আমরা এটা চোখে দেখতেও পাই না। কেবল মাত্র গৌণভাবে এর গুণাগুণ সম্বন্ধে আমরা জানতে পেরেছি।

বিস্ময়ের ও কৌতূহলের কথা যে, এই কঠিন বরফ,—'উষ্ণ বরফ'—সাধারণ বরফের চেয়ে ঘন। এমন কি জলের চেয়েও ঘন। এর আপেক্ষিক গুরুত্ব 1·05। জলে এটা ডোবে, অথচ সাধারণ বরফ, তোমরা জানো, জলে ভাসে।

কয়লা থেকে শৈত্য

উত্তাপ নয়, কয়লা থেকে শীতলতা আহরণ মোটেই আজগুবি ব্যাপার নয়। 'শুষ্ক বরফ' তৈরি করে এমন কারখানায় প্রতিদিন এটা সম্ভব করে তোলা হচ্ছে। এখানে বয়লার-ড্রামে কয়লা পোড়ানো হয়; যে ধোঁয়ার সৃষ্টি হয় তাকে বিশুদ্ধ করা হয়। তারপর এতে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকে তাকে ক্ষারধর্মী দ্রবণ (Alkaline solution)-এ আটকান হয়। পরে বিশুদ্ধ কার্বন ডাই-অক্সাইড উত্তাপ দিয়ে পৃথক করে ঠাণ্ডা করা হয় এবং 70 অ্যাটমস্ফীয়ার চাপে তরল করা হয়। এই তরল কার্বন ডাই-অক্সাইড-ই আইসক্রীম তৈরির জন্য বা শিল্পে ব্যবহারের জন্য পুরু দেওয়াল বিশিষ্ট চোঙে কারখানায় পাঠানো হয়। ভূমিকে জমাট বাঁধানোর জন্যও এর ব্যবহার আছে—মস্কো ভূ-গর্ভ রেলপথ তৈরীর কাজে যেমন একে ব্যবহার করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে বহু ক্ষেত্রে শুষ্ক বরফ হিসেবে পরিচিত এই কঠিন কার্বন ডাই-অক্সাইড আমাদের প্রয়োজন হয়।

তরল কার্বন ডাই-অক্সাইডকে নিম্নচাপে দ্রুত বাষ্পীভূত করে শুষ্ক বরফ পাওয়া যায়। বাইরের দিক থেকে, শুষ্ক বরফের চাঁই, জমাট বাঁধা বরফের মত

দেখায় এবং সাধারণভাবে এই শুষ্ক বরফ কঠিন জমাট জলের থেকে ভিন্ন। এই বরফ সাধারণ বরফের থেকে ভারি এবং জলে ডোবে। খুব নিম্নতাপ সত্ত্বেও—0°C থেকে 78°C-এর তলায় তুমি একে ঠাণ্ডা বোধ করবে না, কারণ হালকাভাবে ধারণ করার পর আমাদের উষ্ণ আঙুলের ডগায় লেগে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস তৈরী হবে যা ঠাণ্ডা থেকে আমাদের ত্বককে রক্ষা করবে। কেবল মাত্র খুব চেপে ধরলে, তোমার আঙুলগুলোর বরফ শীতল হবার ঝুঁকি থাকবে।

'শুষ্ক বরফ' নামটাও খুবই যুক্তিযুক্ত, কারণ এটা ওর ভৌত ধর্ম প্রকাশ করে। এটা কখনো ভিজে নয়, এবং যার সংস্পর্শে আসে তাকেও কখনো ভেজায় না। গরম হলে, এটা সঙ্গে সঙ্গে তরল অবস্থা উৎরে গ্যাসে পরিণত হয়, কারণ কেবল মাত্র এক অ্যাটমস্ফীয়ার বায়বীয় চাপ ছাড়া কার্বন ডাই-অক্সাইড 'তরল অবস্থায়' থাকতে পারে না।

শুষ্ক বরফের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও এর নিম্ন তাপমাত্রা একে অমূল্য শীতক রূপে ব্যবহারিক প্রয়োজনে লাগিয়েছে। এর সাহায্যে সংরক্ষিত বস্তুতে ছাতা পড়ে না বা রোগ-জীবাণু সৃষ্টি হয় না। কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসই এই সব সৃষ্টির কার্যে বাধা দেয়। আরশোলা-পোকামাকড় প্রভৃতিও এরকম আবহাওয়ায় বাঁচতে পারে না। পরিশেষে কার্বন ডাই-অক্সাইড আগুন নেভানোর কাজে নির্ভরযোগ্যভাবে কাজ করে। কয়েক টুকরো শুষ্ক বরফ জ্বলন্ত পেট্রোলে নিক্ষেপ করলে তা সঙ্গে সঙ্গে আগুনের শিখা নিভিয়ে দেবে। এ সমস্ত ধর্মই শুষ্ক বরফকে শিল্পে ও ঘরের কাজে জনপ্রিয় করে তুলেছে।

পরিচ্ছেদ ৮

চুম্বকত্ব ও তড়িৎ

সম্মোহনী পাথর

চীনারা কাব্য করে স্বাভাবিক চুম্বককে বলেছে 'লাভিং স্টোন' বা সম্মোহনী পাথর। চীনারা বলে মা যেমন ভাবে শিশুকে তাঁর বুকে টেনে নেয়, ঠিক সেইভাবে 'চুসী' বা 'লাভিং স্টোন' লোহাকে টানে। খুবই কৌতূহলের বিষয়, প্রাচীন পৃথিবীর অপর প্রান্তের অধিবাসী ফরাসীরাও চুম্বকের অনুরূপ আখ্যা দিয়েছেন। তারা চুম্বককে বলে 'অ্যায়মা'—যার অর্থ চুম্বক ও স্নেহাস্পদ—দুই-ই।

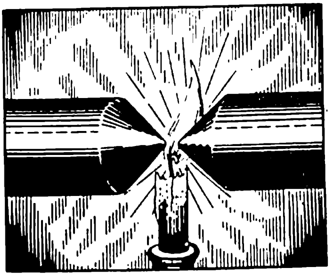
স্বাভাবিক চুম্বকের আকর্ষণী শক্তি কম, সুতরাং গ্রীকরা যে চুম্বককে বলে, 'হারকিউলিসের পাথর' তা বরং অতিরঞ্জিত করে বলা। যদি স্বাভাবিক চুম্বকের সাধারণ আকর্ষণী শক্তি প্রাচীন হেলেনেসকে মায়াবদ্ধ করে থাকে তাহলে আধুনিক চুম্বককে লৌহ-ইস্পাত কারখানায় ব্যবহৃত হতে দেখে অথবা বেশ কয়েক টন ভার উত্তোলনকারী চুম্বককে কর্মরত দেখে তারা কতই না বিস্মিত হতেন। যথার্থই, এগুলো স্বাভাবিক চুম্বক নয়, এগুলো হল তড়িৎ-চুম্বক। অন্যকথায়, তড়িতাবর্তনী জড়ানো লোহাকে তড়িৎ-প্রবাহের মাধ্যমে চুম্বকে পরিণত করা হয়, এই তড়িৎ-চুম্বক প্রস্তুত করার জন্য। সে যাই হোক, উভয় ক্ষেত্রেই প্রকাশ পায় এক এবং অভিন্ন রকমের আকর্ষণ চুম্বকত্ব।

কিন্তু চুম্বক কি শুধু লোহাকেই আকর্ষণ করে?—অন্য কিছুকে নয়? অত প্রচণ্ড শক্তিতে না হলেও আরও কিছু ধাতু আছে যাদেরকেও চুম্বক টানে। নিকেল, কোবাল্ট, ম্যাঙ্গানিজ, অ্যালুমিনিয়াম, সোনা, রুপা ও প্লাটিনাম হল এই রকম ধাতু। আবার অন্য কিছু অপচুম্বক বস্তু আছে যারা আরও বেশি উল্লেখযোগ্য। দস্তা, সীসা, সালফার ও বিস্‌মাথ হচ্ছে এই সব ধাতু। শক্তিশালী চুম্বকের দ্বারা এই ধাতুগুলি বিকর্ষিত হয়।

আবার চুম্বক তরল ও গ্যাসীয় পদার্থকেও আকর্ষিত বা বিকর্ষিত করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে হলে চুম্বককে খুবই শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, চুম্বক বিশুদ্ধ অক্সিজেনকে

আকর্ষণ করে। সাবানের বুদ্‌বুদকে অক্সিজেনে পূর্ণ করে যদি কোনো শক্তিশালী তড়িৎ-চুম্বকের দুই মেরুর কাছে রাখা হয়, তড়িৎ চুম্বকের অদৃশ্য চৌম্বক বল সাবানের বুদ্‌বুদকে লক্ষণীয়ভাবে কাঁপিয়ে তুলবে। শক্তিশালী চুম্বকের মেরুদ্বয়ের মাঝখানে যদি কোনো বাতির শিখা ধরা হয়, বাতির শিখাটি তার স্বাভাবিক আকার বদলাবে এবং স্পষ্টভাবে চুম্বকত্বে সাড়া দেবে।

চিত্র ৪৪



তড়িৎ-চুম্বকের দুই মেরুর মধ্যবর্তী বাতির শিখা।

চুম্বক কাঁটার সমস্যা

আমরা চিন্তা করতে অভ্যস্ত যে, চুম্বক কাঁটার একপ্রান্ত সব সময় উত্তর দিকে ও অপর প্রান্ত সব সময় দক্ষিণ দিকে মুখ করে থাকবে। সুতরাং নিম্নের প্রশ্ন বিদ্‌ঘুটে বলে মনে হবে: পৃথিবীর কোথায় চুম্বক কাঁটার উভয় প্রান্তই উত্তর-মুখো হবে? আমার পরবর্তী প্রশ্নটিও অনুরূপভাবেই বিদ্‌ঘুটে ঠেকবে: পৃথিবীর কোথায় চুম্বক কাঁটার উভয় প্রান্তই দক্ষিণ-মুখো হবে?

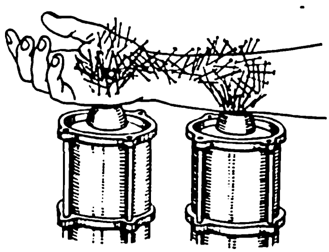
আমি হলফ করে বলতে পারি তোমরা উত্তর দেবে, আমাদের পৃথিবীতে এমন কোনো স্থান খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এমন স্থান অবশ্যই আছে। তোমাদের যদি স্মরণে থাকে যে, পৃথিবীর চুম্বকমেরুদ্বয় ওর ভৌগোলিক মেরুদ্বয়ের সঙ্গে মেশে না, তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে আমি কোন স্থানের কথা বলছি। ভৌগোলিক দক্ষিণ মেরুতে রাখলে চুম্বক কাঁটা কোন দিকে মুখ করে থাকবে? ওর একপ্রান্ত সন্নিকটস্থ চুম্বকমেরুর দিকে মুখ করে থাকবে এবং অপর প্রান্ত থাকবে বিপরীত চুম্বকমেরু-মুখো হয়ে। কিন্তু ভৌগোলিক দক্ষিণ মেরু থেকে যে দিকেই যাও না কেন তোমাকে সব সময়ই উত্তর দিকে যেতে হবে—প্রকৃতপক্ষে উত্তর দিক ছাড়া অন্য কোনো দিকে যাওয়ার উপায় নেই। ফলে সেখানে চুম্বক কাঁটার উভয় প্রান্তই উত্তর-মুখো হবে। অনুরূপে ভৌগোলিক উত্তর মেরুতে চুম্বক কাঁটার উভয় প্রান্তই দক্ষিণ-মুখো হবে।

চুম্বকীয় বলের রেখাবলী

ছবি (ফটো) থেকে তোলা 89 নং চিত্রে এক বিস্ময়কর ঘটনা চিত্রিত হয়েছে। তড়িৎ-চুম্বকের মেরুর উপর ধৃত হাতের উপর ব্রিস্‌ল্‌সের মত কত পেরেক জড়িয়ে আছে। হাতটা কিন্তু চুম্বকের আকর্ষণী বলের কোনো সাড়ই অনুভব করছে না। কিন্তু এই চুম্বকত্ব হাতের মধ্য দিয়ে অদৃশ্যভাবে চলে গিয়ে লোহার পেরেক-গুলোকে চুম্বকের নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য করছে। তারা নিয়মিতভাবে সারিবদ্ধ হয়ে চুম্বকীয় বলের দিক নির্দেশ করছে।

আমাদের যেহেতু চুম্বকীয় বলের অস্তিত্ব-বোধ করার মত কোনো অঙ্গ নেই, চুম্বক থেকে নির্গত এই বলকে আমরা কেবল আন্দাজ করতে পারি। (আমাদের

চিত্র 89



হাতের উপর চুম্বকীয় বল।

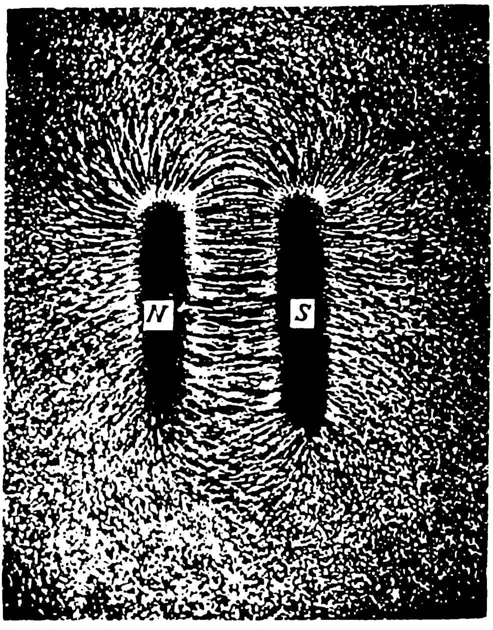
যদি এই চুম্বকত্ব বোধের অঙ্গ থাকত তাহলে, ভাবলে বিস্মিত হতে হয় আমরা প্রকৃতপক্ষে কেমন বোধ করতাম। ক্রেইডেল বাগ্‌দাচিংড়ির মধ্যে এমন এক চুম্বকীয়-বোধ সঞ্চারিত করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন ছোট বাগ্‌দাচিংড়িরা তাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের মধ্যে পাথরের নুড়ি ঢুকিয়ে রাখত যা তাদের বোধের কেশে ভারযুক্ত হয়ে তাদের দেহের ভারসাম্য রক্ষার অঙ্গের একটা উপাংশ হিসেবে কাজ করত। মানুষের কানেও অনুরূপ পাথরের নুড়ি সদৃশ 'অটোলিথ' আছে। মূল শ্রবণেন্দ্রিয়ের কাছে এগুলো অবস্থিত। লম্বালম্বিভাবে কাজ করে এরা অভিকর্ষবলের দিক নির্দেশ করে। ক্রেইডেল লক্ষ্য না করে পাথরের নুড়ির পরিবর্তে বাগ্‌দাচিংড়ির কর্ণদেশে লোহাচুড় পুরে দিয়েছিলেন! এরপর যখন একটা চুম্বক কাছে এনে ধরা হল, বাগ্‌দাচিংড়ি চুম্বকীয় বলের ও অভিকর্ষ-বলের লব্ধির লম্বালম্বিতলে নিজেকে স্থির করল।

"পরে এই পরীক্ষার কিছু রদবদল করে মানুষের উপর প্রয়োগ করা হল। কেলার খুব গুড়ো ছোট ছোট লোহাচুড় মানুষের কর্ণপটহে প্রবেশ করালেন। ফলে কান শব্দের মত চুম্বকীয় বলের দোলন অনুভব করল।" [অধ্যাপক ও.

উইনার]) পরোক্ষভাবে অবশ্য, চুম্বকীয় বলের বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোহাচুড়ের সাহায্যে বিষয়টা সবচেয়ে ভালোভাবে করা যায়।

মসৃণ একটুকরো কার্ডবোর্ড বা কাচের প্লেট নিয়ে তার উপর সরু পাতের আকারে লোহাচুড় ছড়িয়ে দেওয়া হল। তারপর কার্ডবোর্ড বা কাঁচের প্লেটটিকে উপরের লোহাচুড় সমেত একটা চুম্বক দণ্ডের উপর স্থাপন করা হল। এরপর আঙুল দিয়ে আস্তে আস্তে কার্ডবোর্ডটা নাড়ানো হল। চুম্বকীয় বল যেহেতু 'মুক্তভাবে' বা অনায়াসে কার্ডবোর্ড বা কাচের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করতে পারে, চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে লোহাচুড়গুলো চুম্বকত্ব লাভ করবে। এখন কার্ড-বোর্ডটিকে ঝাঁকিয়ে লোহাচুড়গুলোর স্থান পরিবর্তন করে দিলেও, চুম্বকীয় বল

চিত্র 90



চুম্বকের উপর ধৃত কার্ডবোর্ডের উপর লোহাচুড় যে অবস্থায় থাকে। ফটোগ্রাফ থেকে মুদ্রিত।

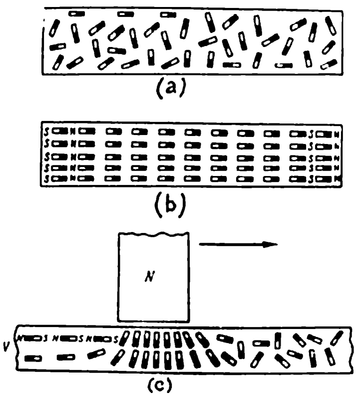
তাদের আবার নির্দিষ্ট অবস্থায় পুনর্বিন্যাস্ত করবে এবং তারা প্রতি বিশেষ বিন্দুতে চুম্বকের কাঁটার মত লম্বালম্বিভাবে অবস্থান করবে। সারিবদ্ধ হয়ে থেকে লৈখিক চিত্রের আকারে তারা অদৃশ্য চুম্বকীয় রেখাবলী প্রদর্শন করবে। 90 নং চিত্রে

বিষয়টি দেখানো হয়েছে। চুম্বকীয় বলরেখাগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বক্ররেখার সৃষ্টি করে—যেগুলো চুম্বকের এক মেরু থেকে এসে কখনো ছোট আকারে কখনো বড় আকারের চাপ সৃষ্টি করে দুই মেরুর মধ্যে পরস্পর সংযুক্ত হয়। লোহাচূড়গুলো পদার্থবিদের মনে মনে কল্পিত রেখাবলীকে নিজের চুম্বকীয় বলে সাড়া দিয়ে সন্নিবদ্ধ হয়ে দেখায়। প্রতিটি চুম্বকেই এই রকম বলরেখাবলী ঘিরে থাকে। মেরুদ্বয়ের কাছাকাছি এই রেখাবলী খুব স্পষ্ট ঘন সন্নিবিষ্ট হয়। মেরু থেকে দূরে তাদের দেখায় আবছা আবছা। এটা প্রমাণ করে মেরু অঞ্চল থেকে যত দূরে যাওয়া যায়, চুম্বকীয় আকর্ষণী বল ততই ক্ষীণ হয়ে আসে।

ইস্পাতকে কিভাবে চুম্বকে পরিণত করা হয় ?

এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে হলে আমাদের প্রথমে বুঝতে হবে, একটা চুম্বক ও একটা চুম্বক নয় এমন ইস্পাতদণ্ডের মধ্যে পার্থক্য কি ? ইস্পাতদণ্ডের প্রতিটি পরমাণুকে, তা সে চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হোক আর না হোক, আমরা ছোট চুম্বক হিসেবে কল্পনা করতে পারি। চুম্বকত্ব বিহীন অবস্থায় এই শিশু চুম্বকেরা থাকে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে, ফলে তাদের উত্তর ও দক্ষিণ মেরুগুলি তাদের বল পরস্পরকে

চিত্র 91



চুম্বকত্বহীন ইস্পাত খণ্ডে অণু চুম্বকগুলি যেভাবে থাকে (a) : চুম্বকে পরিণত হবার পর অণু-চুম্বকগুলি যেভাবে থাকে (b) : চুম্বকে পরিণত হবার পরও অণু-চুম্বকগুলির উপর চুম্বকের মেরুর প্রভাব (c)।

প্রশমিত করে দেয় (চিত্র 91*a*)। প্রকৃত চুম্বকে, বিপরীতপক্ষে, ছোট ছোট সবগুলি শিশু চুম্বক নিয়মিত আকারে সন্নিবদ্ধ হয় যেখানে সদৃশ মেরুগুলি একই দিকে থাকে (চিত্র 91*b*)।

এখন চুম্বকে পরিণত হলে ইস্পাতদণ্ডে কি ঘটে ? চুম্বকের আকর্ষণী বলগুলি ইস্পাতদণ্ডের চুম্বকীয় কণাগুলিকে তাদের উত্তর ও দক্ষিণ মেরু বরাবর একই

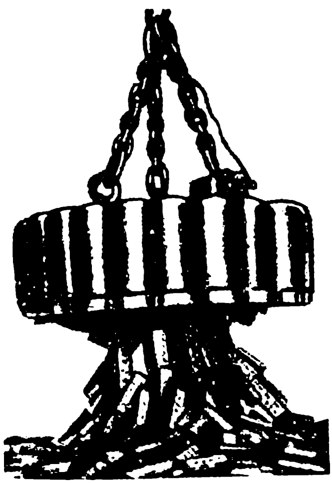
দিকে মুখ করিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে দেয়। চিত্র 91c এরই যথার্থ লৈখিক চিত্র। চুম্বকীয় এককগুলি প্রথমে তাদের দক্ষিণ মেরুগুলিকে নিয়ে চুম্বকের উত্তর মেরুর দিকে মুখ করে দোলে। তারপর, যখন চুম্বককে আরও দূরে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন ইস্পাতদণ্ডের কণাগুলি তাদের চলনপথ বরাবর অবস্থান করে। তাদের দক্ষিণ মেরুগুলি ভেতরের দিকে ফেরে।

এই থেকে ইস্পাতকে চুম্বক করার জন্য চুম্বককে কিভাবে ব্যবহার করা হয় তা বোঝা যায়। চুম্বকের এক মেরুর প্রান্ত ইস্পাতদণ্ডের এক প্রান্তে স্থাপন করতে হবে, তারপর চেপে ইস্পাতদণ্ডের অপর প্রান্ত বরাবর নিয়ে যেতে হবে। ইস্পাতকে চুম্বকে পরিণত করার এটাই সহজ ও প্রাচীনতম পদ্ধতি। কিন্তু এই পদ্ধতিতে ছোট এবং ক্ষীণবল সম্পন্ন চুম্বকই তৈরি করা যায়। তড়িৎ-প্রবাহের ধর্মের সাহায্যে আরও শক্তিশালী চুম্বক পাওয়া যায়।

দৈত্যাকার তড়িৎ-চুম্বক

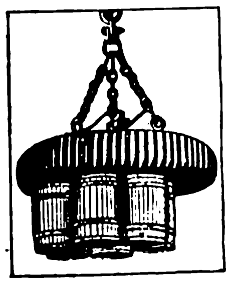
লৌহ-ইস্পাত কারখানায় তড়িৎ-চুম্বক ক্রেন কিভাবে বড় বড় ভারি বোঝা তুলছে, তা হয়তো তোমরা দেখে থাকবে। নিঃসন্দেহে তারা, কোনো কিছুর

চিত্র 92



তড়িৎ চুম্বকীয় ক্রেন লোহার পাত পরিবহণ করছে।

চিত্র 93



তড়িৎ-চুম্বকীয় ক্রেন পেরেকের ব্যারেল পরিবহণ করছে।

বিশেষ আশ্রয় না নিয়েই বড় বড় টন টন ওজনের লৌহপিণ্ড বা যন্ত্রপাতির নানা অংশ উত্তোলন করে বা পরিবহণ করে আমাদের অপরিমেয় কাজ করে চলেছে।

তারা খোলা লোহার পাত, তার, পেরেক, ধাতব অংশ এবং অন্যান্য পদার্থও বহন করতে পারে। এই সব বস্তু অন্য যে কোনো উপায়ে একস্থান থেকে অন্য-স্থানে স্থানান্তরিত করতে অনেক বেশি সময় ও শক্তির প্রয়োজন হত।

92 ও 93 নং চিত্র দুটিতে এই উত্তোলক চুম্বক কত কাজের তা প্রদর্শিত হয়েছে। স্তূপীকৃত লোহার পাত সংগ্রহ করা ও তোলা কত কষ্টসাধ্য। অথচ শক্তিশালী চুম্বকের ক্রেন একবারে এগুলো সংগ্রহ করে ও তুলে নেয় (চিত্র 92)। এরা শুধু যে শ্রমের লাঘব করে তাই নয়, কাজটাও করে অতি সহজে। 93 নং চিত্রে চৌম্বক-ক্রেন পেরেকের ব্যারেল, ছয় ছয়টি—একবারে কিভাবে তুলছে তা দেখানো হয়েছে। একটি লৌহ ও ইস্পাত কারখানায় চারটি চৌম্বক-ক্রেন, প্রত্যেকটি একবারে দশ দশটি রেল (লৌহবর্ত্ম) বহন করতে পারে যা করতে 200 জন শ্রমিকের প্রয়োজন হয়।

ক্রেনের সঙ্গে এই সব ভারী ভারী বোঝা সংযুক্ত করার প্রয়োজন হয় না, এ কথা আগেই বলেছি। এর কারণ যতক্ষণ তড়িৎ-চুম্বকের গাত্রের বর্তনীর মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ চলতে থাকে, ততক্ষণ ওর চুম্বকত্ব থাকে এবং ধার্য বস্তুকে আকৃষ্ট করে রাখার জন্য কিছুই অসংলগ্ন হয়ে পড়ে যায় না। কিন্তু যদি বিদ্যুৎ-প্রবাহের সংযোগ কোনো কারণে ছিন্ন হয়ে যায়, তবে গুরুতর দুর্ঘটনা অবশ্যম্ভাবী। প্রথম প্রথম তড়িৎ-চুম্বক ব্যবহারের সময় এ রকম দুর্ঘটনা ঘটেছিল। শিল্প বিষয়ক পত্রিকা থেকে জানা যায়, "আমেরিকার একটি কারখানায় একটা তড়িৎ-চুম্বক এক সময় ট্রেন থেকে লৌহ-পিণ্ড চুল্লীতে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময় একটা দুর্ঘটনায় নিয়াগারা জলপ্রপাতের তড়িৎ-স্টেশনের কাজ ব্যাহত হয় এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে তড়িৎ-চুম্বক ক্রেনের থেকে লৌহ-পিণ্ডের ভার ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং নিচে দণ্ডায়মান জনৈক শ্রমিকের দেহ একেবারে পিষ্ট হয়ে যায়। এই ধরনের দুর্ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে এবং বিদ্যুৎ ব্যয় যাতে বাঁচে সেইজন্য বিশেষ ধরনের গ্যাজেট (Gadget)-এর ব্যবস্থা করা হয়। যেই মাত্র উত্তোলক চুম্বক যে সমস্ত বস্তু পরিবহণ করা হবে তা আকৃষ্ট করে নেয় সেই মাত্র মস্ত ইস্পাত সাঁড়াশি দিয়ে নিচে থেকে ওদের ধরে রাখা হয় এবং যখন বোঝাটা এক স্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তরিত করা হয় তখন বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়।"

92 ও 93 নং চিত্রে যে তড়িৎ-চুম্বকগুলো প্রদর্শিত হয়েছে তাদের ব্যাস 1·5 মি.। এই চুম্বকগুলো ভারবাহী গাড়ির মত 16 টন পর্যন্ত ভার বহন করতে পারে। এই ধরনের একটা চুম্বক দৈনিক 600 টন পর্যন্ত মাল বহন করে নিয়ে যেতে পারে। এমন তড়িৎ-চুম্বকও আছে যা একটা মাল গাড়ির সমান 75 টন পর্যন্ত ভার একবারে উত্তোলন করতে পারে।

তোমরা হয়তো ভাবছ এইভাবে তো উত্তপ্ত লোহাকেও বহন করা যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে, নির্দিষ্ট তাপমাত্রা পর্যন্তই লোহা চুম্বকের দ্বারা আকৃষ্ট হয়। উত্তপ্ত লোহিত বর্ণের লোহা তার আকৃষ্ট হবার ধর্ম হারায়। আবার চুম্বককে 800° সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রা পর্যন্ত উত্তপ্ত করলে এর চুম্বকত্ব থাকে না।

লোহা, ইস্পাত বা লোহার পিণ্ড কোনো স্থানে রাখার জন্য বা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাবার জন্য তড়িৎ-চুম্বক এখন বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। কাজকে আরও সহজ, সরল ও গতিশীল করার জন্য শত শত কলাকৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে।

চুম্বকীয় কারসাজি

অনেক সময় সার্কাসের যাদুকরেরাও তড়িৎ-চুম্বকের সাহায্য নেয়? ভালো-ভাবেই কল্পনা করা যায় এই সব যাদু কিরকম ফলপ্রসূ হবে। 'তড়িৎ ও তার ব্যবহার' শীর্ষক বিখ্যাত গ্রন্থের প্রণেতা দারি আলজেরিয়ায় প্রদর্শিত এক ফরাসী যাদুকরের খেলার গল্প এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। যাদুবিদ্যাটি তড়িৎ সম্বন্ধে অজ্ঞ দর্শকদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। তাঁরা মনে করলেন যে, তাঁরা সত্যি সত্যিই কোনো অলৌকিক ঘটনা দেখছেন।

'মঞ্চে ছিল লোহার একটা বাক্স, উপরে একটা ধরার হাতল।'—যাদুকর গল্প বলতে শুরু করলেন। 'আমি একজন বলবান লোককে আহ্বান করলাম মঞ্চে উঠে আসতে। আমার ডাকে উঠে এলেন বেঁটে-খাটো, বেশ শক্ত-সবল একজন আরবের লোক। স্বাস্থ্যের শক্তি-সামর্থ্যে তাকে অঞ্চলের হারকিউলিস বলা যায়। বেশ আনন্দের সঙ্গে হাসতে হাসতে সে উঠে এলো, শক্তি পরীক্ষায় সগর্বে নামার উদ্দেশ্যে এবং আমার বিপরীত দিকে দাঁড়াল।'

—" 'তুমি কি খুবই শক্তিশালী?'—আমি জিজ্ঞাসা করলাম মানুষটির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করতে করতে।

" 'নিশ্চয়ই', লোকটি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল।

" 'তুমি কি নিশ্চিত যে, তুমি সব সময়ই খুব শক্তিশালী'?

" 'অবশ্যই,'—সগর্বে উত্তর করল লোকটি।

" 'তুমি ভুল করছ,' আমি জানালাম। 'এক মুহূর্তে আমি তোমার সমস্ত শক্তি হরণ করে নিতে পারি এবং তুমি শিশুর মতই দুর্বল হয়ে পড়বে।'

"—আরববাসী অবিশ্বাসের হাসি হাসল।

" 'এদিকে এসো', আমি বললাম, 'বাক্সটা তোলো দেখি।'

"আরব নিচু হল। বাক্সটা তুলে ধরল এবং তারপর প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল: " 'কি হল তো? এইটুকুই কি তোমার পরীক্ষা'?

" 'একটু অপেক্ষা কর,'—আমি বললাম। "তারপর খুব গম্ভীরভাব করে আমি খুব জোর গলায় নির্দেশ দিলাম ঃ

" 'এখন তুমি স্ত্রীলোকের চেয়েও দুর্বল। দেখি, বাক্সটা এবার তোলো তো।'

"আরবের লোকটি আমার যাদুর কলাকৌশলের প্রতি কোনো প্রকার ভ্রূক্ষেপই করল না। আবার নিচু হয়ে ঝুঁকে পড়ে সে বাক্সটা তোলার চেষ্টা করল। কিন্তু, এবার বাক্সটা প্রতিরোধ করল। লোকটি কিন্তু বেপরোয়া, প্রাণ-পণে বাক্সটা উপরে ওঠানোর চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। যেন মাটির সঙ্গে আটকে থাকল বাক্সটা। মস্ত একটা বোঝা তুলছে এমনভাবে সে তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে লাগল। কিন্তু তার সমস্ত চেষ্টাই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। পরিশ্রান্ত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে, লজ্জায় আরক্তিম হয়ে, সে এবার হাল ছেড়ে দিল। এতক্ষণে আমার যাদুবিদ্যায় তার বিশ্বাস জন্মাল।"

রহস্যটা আসলে ছিল খুবই সহজ। যে প্লাটফর্মের উপর লোহার বাক্সটা বসানো ছিল সেটা ছিল একটা শক্তিশালী তড়িৎ-চুম্বকের একটা মেরু।

যখন তড়িৎ-প্রবাহ ছিল না তখন লোহার বাক্সটা তোলা খুবই সহজসাধ্য ছিল। কিন্তু যেই মাত্র তারের কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ চলতে শুরু করল সেই মাত্র লোহার বাক্স আকৃষ্ট হল চুম্বকের সঙ্গে, তখন আর খুব বলিষ্ঠ তিনজন মানুষের পক্ষেও বাক্সটা তোলা সম্ভব হল না।

কৃষিকার্যে চুম্বকের ব্যবহার

চুম্বক কৃষিকার্যে যে প্রভূত কাজে আসে তা আরও কৌতূহল উদ্দীপক। চুম্বক কৃষককে আগাছার বীজ থেকে মূল গাছের বীজগুলোকে আলাদা করতে সাহায্য করে। আগাছার বীজে অনেক সময় শুড়ের মত আকর্ষ থাকে যা চলমান জন্তুদের গায়ের লোমের সঙ্গে আটকে গিয়ে মূলগাছের থেকে অনেক দূরে ছড়িয়ে পড়ে। কৃষক চুম্বকের সাহায্যে খুব উপকারী লবঙ্গ, আলফালফা প্রভৃতি গাছের বীজকে আগাছার বীজ থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে বেঁচে থাকার সংগ্রামের মুখে অভিযোজিত আগাছার এই বিশেষত্বকে কাজে লাগায়। খুব মিহি লোহাচুর ছড়িয়ে দেওয়া হয় মিশ্রিত বীজের মধ্যে। আগাছার বীজের শুড় থাকায়, লোহাচুর ওর গায় আটকে যায়। পরে শক্তিশালী তড়িৎ-চুম্বকের ক্ষেত্রে এলেই লোহাচুর-যুক্ত আগাছার বীজগুলো চুম্বকের আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে, চুম্বকের ক্ষেত্রে থেকে যায়, উপকারী গাছের বীজ আলাদা হয়ে যায়।

চুম্বকীয় উড়ন্ত চাকি

বইটির শুরুতে ঘটনাক্রমে আমি সিরানো ডি বারজিরাকের হাস্যোদ্দীপক গ্রন্থ "চন্দ্র ও সূর্য রাজ্যের ইতিহাস" (হিস্ট্রি অব লুনার অ্যান্ড সোলার স্টেট্স্)

সম্বন্ধে উল্লেখ করেছি। চুম্বকের আকর্ষণের উপর ভিত্তি করে তিনি একটা কৌতূহল-উদ্দীপক উড়ন্ত চাকির বর্ণনা করেছেন। তাঁর লেখা চরিত্রগুলোর মধ্যে একজন ঐ চাকিতে চড়ে চাঁদে পাড়ি দিত বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। গল্পটা এই রকম ঃ

"আমি একটা হালকা লোহার গাড়ি তৈরি করার আদেশ দিলাম। বেশ আরাম করে বসে, আমি একটা চুম্বকের বল উপরে ছুড়ে দিলাম। আমার লোহার গাড়ি তৎক্ষণাৎ উপরে উঠতে লাগল। উঠতে উঠতে যখনই আমি বলের নাগাল পেতে লাগলাম, আমি তখনই বলটাকে আরও উপরে ছুড়ে দিলাম। বলটাকে শুধু মাত্র উপরে ছুড়ে দেওয়া মাত্রই গাড়িটা উপরে উঠতে লাগল। বার বার বলটাকে উপরে ছুড়ে দেওয়ার ফলে, গাড়িটা আমায় এমন এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে তুলল যে, সেখান থেকে আমি চাঁদে নামতে লাগলাম। যেহেতু আমি, এই সময়, চুম্বক-বলকে জোর করে ধরে রাখলাম, গাড়িটাও আমায় সাপটে ধরে রাখল। নামার সময় আমার ঘাড় যাতে না ভাঙে, আমি বলটাকে উপরে আস্তে করে ছুড়ে দিলাম, যাতে চুম্বকের আকর্ষণের জন্য গাড়িটা ধীরে ধীরে নামে। চাঁদের উপরিভাগ থেকে যখন ছ-সাতশ' গজ দূরে, তখন আমি আমার নামার দিকের সঙ্গে সমকোণে উপরে বলটাকে ছুড়তে আরম্ভ করলাম, যতক্ষণ না গাড়িটা খুব কাছাকাছি এসে গেল। তারপর আমি গাড়ি থেকে নিচে চাঁদের বালিতে লাফ দিলাম।"

প্রত্যেকে, এমনকি, সিরানো ডি বারাদিবাস নিজেও নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন প্রকল্পটি সম্পূর্ণ অবাস্তব। কিন্তু কেন?—সবাই বোধহয় এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারবে না। লোহার গাড়িতে বসে একটা চুম্বককে উপরে ছোড়া যায় না—এটা কি সেই জন্য? না, গাড়িটি চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হবে না, সেই জন্য? না, অন্য কিছু কারণ এর পেছনে কাজ করে?

আমি বলব তুমি চুম্বককে উপরে ছুড়তে পার এবং তা এ রকম লোহার গাড়িকে আকৃষ্ট করবে যদি চুম্বকটা খুব শক্তিশালী হয়। তা সত্ত্বেও উড়ন্ত চাকি এক ইঞ্চিও উপরে উঠবে না।

নৌকা থেকে তীরের দিকে কখনো কি তোমরা একটা ভারী জিনিস নিক্ষেপ করে দেখেছ? এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যদি ভালো করে লক্ষ্য করে থাকো দেখবে নৌকাটাও তীর থেকে অনেক সরে গেছে। কারণ ভারী বস্তুটার উপর যখন তুমি ছোড়ার জন্য একদিকে বল প্রয়োগ করছ, তোমার পেশীসমূহ তোমার শরীর ও নৌকাটাকে পেছনে যেতে বাধ্য করছে। যা আমরা একাধিকবার উল্লেখ করেছি, এ ঘটনাও সেই সম্পূর্ণ একই নিয়ম, 'প্রত্যেক ক্রিয়ার একটা সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে,' অনুসারে ঘটছে। চুম্বকটা উপরে ছোড়ার সময়ও

সেই সার্বজনীন নিয়মের পুনরাবৃত্তি ঘটছে। গাড়ির মানুষটি যখন চুম্বক বলটিকে উপরে ছুড়ছে, গাড়িটিও ওকে আকর্ষণ করছে, যার জন্য ওকে খুব বেগ পেতে হবে, সে অবশ্যম্ভাবীভাবে গাড়িটিকে নিচে ঠেলবে। পারস্পরিক আকর্ষণের ফলে চুম্বক বল ও গাড়িটি তাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে। তাহলে বোঝা গেল যে, যদি লোহার গাড়িটি পালকের মতও হালকা হয়, তবুও এটা তার নির্দিষ্ট গড় অবস্থান থেকে উপর-নিচে দোদুল্যমান অবস্থায় থাকবে। গাড়িটি মোটেই উর্ধ্বগামী হবে না।

সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন সিরানো এই গ্রন্থ লেখেন, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নিয়মটি তখনও অজ্ঞাত ছিল। তাই সন্দেহ হয়, ফরাসী হাস্যরসিক লেখক তাঁর প্রকল্পটা কেন অবাস্তব তা স্পষ্ট করে কখনো বলতে পেরেছিলেন কি না।

চিত্র 94



বল সহ লোহার শৃঙ্খল খাড়া হয়ে আছে।

'মহম্মদের সমাধি'

একদিন, যখন একটা তড়িৎ-চুম্বকীয় ক্রেন কাজ করছিল, তখন জনৈক শ্রমিক লক্ষ্য করল যে, মেঝের সঙ্গে সংলগ্ন একটা ছোট শৃংখলের সঙ্গে সংযুক্ত একটা ভারী লোহার বল চুম্বক কর্তৃক আকৃষ্ট হচ্ছে। যেহেতু শৃংখলটি বলটিকে সরাসরি চুম্বকের সংস্পর্শে আসতে বাধা দিচ্ছিল, উভয়ের মধ্যে ব্যবধান ছিল প্রায় এক হাতের মত, শ্রমিকটি দেখল একটা অস্বাভাবিক দৃশ্য : বলটি ও শৃংখলটি খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে আছে। চুম্বকটি এত শক্তিশালী ছিল যে, শ্রমিকটি এটা বেয়ে উপরে আরোহণ করার সময়ও শৃংখলটি তার পূর্বের অবস্থায় থেকে গেল। (তাহলে বুঝে দেখ, তড়িৎ-চুম্বকটি কত শক্তিশালী ছিল। সাধারণত চুম্বকের মেরু ও আকৃষ্ট বস্তুর মধ্যে ব্যবধান যত বাড়বে, ততই চুম্বকের আকর্ষণ করার ক্ষমতা হ্রাস পাবে। একটা অশ্বক্ষুরাকৃতি চুম্বক, যা প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে 100 গ্রাম বোঝা ধারণ করতে পারে, তার

ক্ষমতার অর্ধেকই হারিয়ে ফেলে যখন এক সীট কাগজ আকৃষ্ট বস্তু ও এর মধ্যে গুঁজে দেওয়া হয়। এই জন্যই চুম্বকের প্রান্তদেশ কখনো রঙ করা হয় না, যদিও রঙের লেপন চুম্বকটিকে মরচে ধরে ক্ষয়প্রাপ্ত হবার হাত থেকে রক্ষা করে।) একজন ফটোগ্রাফার, যিনি হাতের কাছেই ছিলেন তিনি সুযোগটি ছাড়তে চাইলেন না, ছবিটি তুলে নিলেন। ছবিতে দেখানো হয়েছে একজন মানুষ বাতাসের মধ্যে ঝুলছে—অনেকটা প্রাচীন উপকথায় বর্ণিত 'মহম্মদের সমাধি' চিত্রের মত। ছবিটি 94 নং চিত্রে পুনর্মুদ্রিত করা হয়েছে।

এই সমাধি প্রসঙ্গে কয়েকটা কথা বলা প্রয়োজন। ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষেরা বিশ্বাস করেন যে, তাদের দেবদূতের মৃতদেহ নিয়ে ঐ সমাধি বাতাসের আসনে উপবেশন করে আছে। এটা কি সম্ভব? "কথিত আছে," ইউলার তাঁর 'লেটারস অন সান্ড্রি ফিজিক্যাল মেটিরিয়ালস'-এ লিখেছেন "মহম্মদের শবাধার চুম্বকের সাহায্যে বাতাসে ঝোলানো আছে। এটা অসম্ভব কিছু নয়, কারণ মানুষের তৈরী এমন চুম্বকও আছে যা, 100 পাউণ্ড ভার উত্তোলন করতে পারে।" (এটা লেখা হয়েছিল 1774 খ্রীষ্টাব্দে। তড়িৎ-চুম্বক ছিল তখনও মানুষের অজ্ঞাত।)

এই ব্যাখ্যা কিন্তু যুক্তিগ্রাহ্য নয়। যদি এরূপ কোনো প্রক্রিয়া (চুম্বকের আকর্ষণের) প্রযুক্ত হত, তা হলে সাম্যাবস্থা স্থায়ী হত মুহূর্তের জন্য মাত্র, কারণ সামান্য ধাক্কা, এমন কি বাতাসের সামান্য একটু প্রবাহ, এর ভারসাম্য নষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট হত এবং শবাধার নয় মাটিতে পড়ে যেত অথবা ছাদে গিয়ে ঠেকত। বাস্তব দিক থেকে, এটা অসম্ভব, কারণ ঝুলন্ত অচল অবস্থায় একে স্থির রাখা কঠিন, যদি না একটা শঙ্কু এর শীর্ষে অবস্থান করে—এই ক্ষেত্রে তত্ত্বগত-ভাবে এটা সম্ভব হতে পারে।

তবুও 'মহম্মদের সমাধি'র বিষয়টা চুম্বকের সাহায্যে অনুধাবন করা যেতে পারে যদি আমরা সমস্ত বিষয়টাকে পারস্পরিক আকর্ষণ বলের নিরিখে বিচার না করে পারস্পরিক বিকর্ষণ বলের নিরিখে বিচার করি। (পদার্থবিদ্যা নিয়ে যাঁরা পড়াশুনা করেন তাঁরাও অনেক সময় ভুলে যান যে, চুম্বক আকর্ষণও করে আবার বিকর্ষণও করে।) চুম্বকের সম-মেরু বিকর্ষণ করে। দুটি লোহার চুম্বক দণ্ড যদি এমনভাবে রাখা হয় যে, তাদের সম-মেরু পরস্পরের দিকে মুখ করে থাকে, তাহলে চুম্বক দণ্ড দুটি বিকর্ষণ করবে বা একে অন্যের কাছ থেকে সরে যাবে। যদি প্রয়োজনীয় ভারের চুম্বক নেওয়া যায়, তাহলে তা সহজেই অপর একটি চুম্বকের উপর স্থায়ী সাম্যাবস্থায় ঘুরতে থাকবে একে স্পর্শ না করে। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাদের কাচ বা ঐ জাতীয় অচুম্বক এমন বস্তু ব্যবহার করতে হবে, যা ভাসমান চুম্বকটিকে অনুভূমিক তলে দোলনের হাত থেকে রক্ষা করবে। এই সব শর্ত-

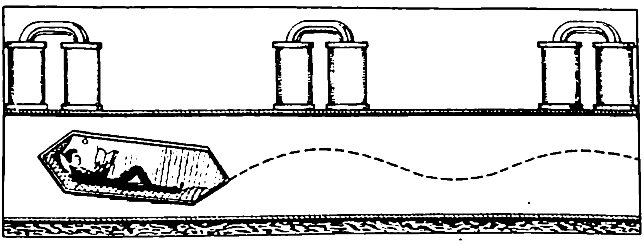
গুলো যদি ঠিকমত পালন করা হয়, আমরা পুরাণে বর্ণিত মহম্মদের সমাধি বাতাসের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় পেতে পারি।

পরিশেষে, চুম্বকের আকর্ষণী ক্ষমতাকে চলমান বস্তুর উপর প্রয়োগ করেও চুম্বকের আকর্ষণের ফলে আমরা তা লাভ করতে পারি। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়, সোভিয়েত পদার্থবিদ অধ্যাপক বি. পি. উইনবার্গ উদ্ভাবিত অসাধারণ তড়িৎ-চুম্বকীয় ঘর্ষণহীন রেলপথ (চিত্র 95) প্রকল্পটি এই নিয়মকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। আমার মনে হয় যে, বিষয়টি এমন শিক্ষণীয় যে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য যত্নবান হয়েছি।

তড়িৎ-চুম্বকীয় পরিবহণ

অধ্যাপক উইনবার্গ প্রকল্পিত রেলপথে কামরাগুলোর কোনো ভার নেই। তড়িৎ-চুম্বকীয় আকর্ষণের ফলে তাদের ভার সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে। তারা রেলপথে চলে না, জলে ভাসে না, বাতাসে ওড়ে না। তাদের দর্শনীয় কোনো মাধ্যম নেই। শক্তিশালী চুম্বকীয় বলের অদৃশ্য তারে তারা ঝোলে। তারা কোনো ঘর্ষণই অনুভব করে না। একবার চালিয়ে দিলে, তারা গতি-জাড্যের প্রভাবে চলতে থাকে। তাদের টানার জন্য কোনো ইঞ্জিন লাগে না।

চিত্র 95



অধ্যাপক উইনবার্গ প্রকল্পিত ঘর্ষণহীন রেলপথ।

পরিবহণ ব্যবস্থাটি এইভাবে কাজ করে। কামরাগুলোকে একটা তামার নলের মধ্যে রাখা হয়। তামার নলটিকে বাতাসের বাধা অপসারণ করার জন্য সম্পূর্ণরূপে বাতাস শূন্য করা হয়। যেহেতু কামরাগুলি নলের কোনো পার্শ্বকেই স্পর্শ করে না, তারা কোনো ঘর্ষণ-জনিত বাধা পায় না। তারা বায়ুশূন্য নলের মধ্যে ঝুলতে থাকে শক্তিশালী তড়িৎ-চুম্বকের আকর্ষণী বলে। এই চুম্বকগুলি উপরে নলের বাহির বরাবর নির্দিষ্ট অন্তর অন্তর রাখা হয়। এরা লৌহ-নির্মিত কামরাগুলিকে টিউবের 'ছাদ' বা 'ভূমি' স্পর্শ না করে

নলের মধ্য দিয়ে তাদের পথে চালনা করতে পারে। তড়িৎ-চুম্বকগুলি নিচে চলমান কামরাগুলিকে আকর্ষণ করে। কিন্তু মাথায় ধাক্কা খাওয়ার আগেই এটা অভিকর্ষ বলে নেমে আসে। পরের তড়িৎ-চুম্বক আবার তাকে আকর্ষণী বলে তুলে নেয়, যাতে এটা ভূমি স্পর্শ করতে না পারে। এইভাবে মসৃণ পথে কামরাগুলি ঘর্ষণ ও ধাক্কা সামলে চলাচল করে। মহাশূন্যে গ্রহের মত এই কামরাগুলি শূন্য পথে যাতায়াত করে।

কামরাগুলো জেপিলাইন (Zeppeline) আকারের চোঙের মত, দৈর্ঘ্য 2·5 মি. এবং লম্বায় প্রায় 70 সে.মি.। তারাও বাষ্পহীন, যেহেতু তারা বায়ু-শূন্য পথে চলাচল করে এবং বাতাস পুনরুদ্ধারের জন্য বাইরের সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় সাবমেরিনের মত ব্যবস্থা আছে। কামরাগুলো কামানের গোলার মত অভিনব-ভাবে বেরিয়ে আসে, পার্থক্য কেবল এই যে, এক্ষেত্রের 'কামান' হল তড়িৎ-চুম্বকীয় কামান—যা তড়িৎ দ্বারা শক্তিশালী সোলিনয়েড (Solenoid), যে লোহার বস্তুকে খুবই দ্রুত টানে—এই ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই টান তড়িৎ-কুণ্ডলী যত বড় হয় এবং তড়িৎ-প্রবাহ যত প্রবল হয় ততই বাড়ে। এই বলই কামরা-গুলোকে বাইরে টেনে আনে এবং ঘর্ষণ-জনিত কোনো বল নলের মধ্যে কাজ না করায় কামরাগুলি গতি-জাড্যের বলে একই গতিতে চলতে থাকে যতক্ষণ না সোলিনয়েড দ্বারা গন্তব্য স্থলে এসে থামে।

প্রকল্পটি সম্বন্ধে লেখক যে বর্ণনা দিয়েছেন তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া হল ঃ

'1911-13 পর্যন্ত টমস্ক ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির পদার্থ বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে পরীক্ষা চালানোর সময় আমি 32 সে.মি. ব্যাসের একটা তামার নল ব্যবহার করি, যার উপরে ছিল একটা তড়িৎ-চুম্বক এবং নিচে মাধ্যমের উপর রক্ষিত 10 কেজি-র একটা গাড়ি। গাড়িটা ছিল সামনে-পিছনে চাকা সম্বলিত একটা লোহার নল। একে থামানো হতো বালির বস্তা দিয়ে ঠাসা কোনো বোর্ডে একটা ঢেঁকির (nose-cone) সাহায্যে ঠেলে। স্থান নিয়ন্ত্রিত থাকায় এটা ঘণ্টায় 6 কি.মি.-এর বেশি গতিতে চলতে পারে না। এর আরও কারণ নলটি 6·5 মি. ব্যাসের বৃত্তাকৃতিবিশিষ্ট। ছাড়ার মুখে যদিও 3 মাইল দীর্ঘ সোলিনয়েড রয়েছে, আমার দৃঢ় ধারণা, কোনো অতিরিক্ত শক্তি ব্যয় না করেই ঘণ্টায় ৪00 থেকে 1000 কি.মি. গতি লাভ করা যাবে এবং রাখা সম্ভব হবে, যেহেতু মেঝের বা ছাদের কোনো ঘর্ষণ-জনিত বল অতিক্রম করতে হবে না।

'যদি এই পরিবহণ ব্যবস্থায়, বিশেষ করে তামার নলের, খরচ হবে একটু বেশি, ইঞ্জিন ড্রাইভার, কণ্ডাকটর ইত্যাদি বাবদ বা প্রারম্ভিক গতি অব্যাহত রাখার জন্য কোনো খরচই হবে না। প্রতি কিলোমিটারে খরচ এক কোপেকের কয়েক সহস্রাংশ

বা কয়েক শতাংশের বেশি হবে না। দুটি নল বিশিষ্ট এরকম পরিবহণ ব্যবস্থা প্রতিদিন 15,000 যাত্রী বা 10,000 টন মাল এক দিকে নিয়ে যেতে পারবে।

মঙ্গল গ্রহবাসীদের সঙ্গে পৃথিবীর অধিবাসীদের যুদ্ধ

রোমের পণ্ডিত প্লিনি, তাঁর সময় খুব প্রচলিত, ভারতের কোনো এক স্থানের, এক চুম্বকীয় পাহাড়ের গল্প বলেছেন। পাহাড়টি নাকি অস্বাভাবিক বলে সমস্ত লোহার বস্তুকে টানত। জনৈক হতভাগ্য নাবিক, যার জাহাজ ওর গা ঘেঁষে যাচ্ছিল, একেবারে ভরাডুবি হল, কারণ তার জাহাজের সমস্ত লোহার পেরেক খুলে গেল ঐ চুম্বকের আকর্ষণে এবং জাহাজটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল। পরে এই কাহিনীকে আশ্রয় করে আরব্য রজনীর একটি গল্প তৈরী হয়েছে।

এটা কিন্তু গল্প বই অন্য কিছু নয়। চুম্বক পাহাড় বা পাহাড় যার মধ্যে ম্যাগনেটাইট (লোহার চুম্বক ধর্ম বিশিষ্ট আকরিক) বেশি, পৃথিবীতে তার সন্ধান মেলে। উরালের বিখ্যাত চুম্বক পাহাড় এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, যেখানে এখন বিখ্যাত ম্যাগনিটোগরস্ক ব্লাস্ট ফার্নেস দাঁড়িয়ে। অবশ্য, এই সব পাহাড়ের আকর্ষণী শক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ। প্লিনির বর্ণনানুযায়ী কোনো বস্তু পৃথিবীতে কোনো দিন ছিল না। আজ যদি আধুনিক জাহাজের কোনো লোহার বা ইস্পাতের অংশ না থাকে তা এই চুম্বক-পাথরের অস্তিত্বের ভয়ে নয়, বরং পার্থিব চুম্বকত্বের পরিচয় আরও ভালোভাবে জানার জন্য।

বিজ্ঞান-নির্ভর কল্প কাহিনীর লেখক কুর্ট লাস্‌উইজ প্লিনির পৌরাণিক কাহিনীকে তাঁর 'দি টু প্ল্যানেট্‌স্‌' উপন্যাসের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন। গল্পে মস্ত এক অস্ত্রের উল্লেখ আছে যা মঙ্গল গ্রহের আক্রমণকারীরা মর্ত্যবাসীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন। এই চুম্বক বা তড়িৎ-চুম্বক অস্ত্রের সাহায্যে বিনা যুদ্ধে মঙ্গল গ্রহের শত্রুরা পৃথিবীর সৈন্য-সামন্তদের নিরস্ত্র করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যুদ্ধের বিবরণ নিম্নরূপ:

"অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত অশ্বারোহী বাহিনী দ্রুত বেগে অগ্রবর্তী হল। মনে হল তাঁদের আত্মত্যাগের অভিযান প্রবল শত্রুকে [মঙ্গল গ্রহের আক্রমণকারী—ইয়া. পি.] পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য করেছে। এই সময় শত্রুপক্ষের জঙ্গী বিমানগুলোর মধ্যে একটা সোরগোল পড়ে গেল। তারা আকাশে আরও ঊর্ধ্বে উঠতে শুরু করল, যেন বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে।

"ঠিক এই সময়, অবশ্য মাঠের উপর দৃশ্যমান কালো যবনিকাটা নেমে এল। যবনিকাটি টেবিলের ঢাকার মত খুলে গেল। যবনিকাটার চারপাশ বিমান দিয়ে যেন হেম করা। অদ্ভুত যন্ত্রটার নিচে যেই মাত্র অশ্বারোহীরা এসে দাঁড়াল, যন্ত্রটা প্রচণ্ড ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সক্রিয় হয়ে উঠল। ভয়ার্ত চীৎকারে বাতাস ভরে গেল।

ঘোড়াগুলো এবং তাদের আরোহীরা পড়ে গেল। তরবারি, পাইক, এক কথায় যাবতীয় লৌহ নির্মিত অস্ত্র-শস্ত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঝনঝনিয়ে উঠে অদ্ভুত যন্ত্রটার গায়ে জড়িয়ে যেতে লাগল।

"যন্ত্রটা তারপর একটু ঘুরতে লাগল এবং লোহার ছোটখাটো জিনিসগুলো মাঠে ছড়িয়ে দিল। দু দু'বার যন্ত্রটা মাঠের উপর ঘুরে গেল। মাঠের সমস্ত বড় বড় অস্ত্র-শস্ত্রগুলো যেন খুঁটে খুঁটে তুলে নিতে এসেছে। কোনো অশ্বারোহী সৈন্যই তার তরবারি, পাইক, অন্যান্য অস্ত্র সামলাতে বা নিজের অধিকারে রাখতে পারল না।

"যন্ত্রটা মঙ্গল গ্রহের নয়া আবিষ্কার। এটা দুর্দমনীয় শক্তিতে সমস্ত ইস্পাত ও লৌহ নির্মিত জিনিস আকর্ষণ করত। শত্রু পক্ষের কোনো ক্ষতি না করে মঙ্গল গ্রহের আক্রমণকারীরা তাদের এই উড়ন্ত চুম্বকের সাহায্যে মর্ত্যবাসী শত্রু-পক্ষের সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র লুণ্ঠন করে নিল।

'শূন্যের এই চুম্বক সারি সারি পদাতিক সৈন্যদের অভিমুখে ভেসে গেল। বৃথাই সৈন্যরা তাদের বন্দুক ধরে রাখতে চেষ্টা করলেন। কোনো অজেয় শক্তি তাদের মুঠি থেকে ওগুলো কেড়ে নিল। যারা ওগুলো হারাতে চান নি তারা নিজেরাই বাতাসে উড্ডীন হলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রথম সারির সৈন্য দলকে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করে দেওয়া হল। তারপর যন্ত্রটা ধাবমান হল নগর অভিমুখে পলায়মান সৈন্যদলের উপর। তাদেরও একই পরিণতি ঘটল।

"গোলন্দাজ সৈন্যরাও ছাড়া পেল না।"

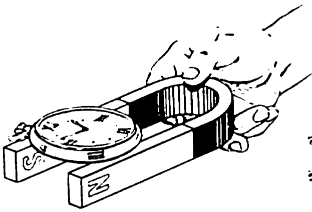
ঘড়ি ও চুম্বকত্ব

চুম্বকের আকর্ষণী শক্তি প্রবেশ করতে পারে না এমন কোনো পর্দার কি সন্ধান পাওয়া যায় না?—এ প্রশ্ন কি তোমাদের মনে জাগে না! উত্তর, অবশ্যই এমন পর্দা আছে। মঙ্গল গ্রহের আক্রমণকারীদের বিস্ময়কর আক্রমণ মর্ত্যবাসীরা সহজেই প্রতিহত করতে পারত, যদি গোড়া থেকে প্রকৃত সাবধানতা অবলম্বন করতে পারত।

শুনতে অদ্ভুত লাগলেও কথাটা সত্যি, যে পদার্থটি সহজেই চুম্বকে পরিণত হতে পারে, সেই পদার্থটিরই আবার চুম্বকত্ব প্রতিহত করার ক্ষমতা আছে। একটি লোহার আংটির অভ্যন্তরে রক্ষিত একটি চুম্বক কাঁটা আংটির বাইরের চুম্বক দ্বারা বিক্ষিপ্ত হবে না। লোহার আধার (Iron case) ইস্পাতের ক্রিয়াবিধি (Steel mechanism)-কে চুম্বকত্ব থেকে রক্ষা করে। যদি একটা সোনার-ঘড়িকে শক্তি-শালী অশ্বক্ষুরাকৃতি চুম্বকের মেরুতে রাখা হয়, তাহলে এর ইস্পাতের অংশগুলো এবং প্রথমত, এর সূক্ষ্ম হেয়ার স্প্রীং চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হবে, [অবশ্য যদি না হেয়ার

স্প্রীংটি ইনভার (Invar) নামে পরিচিত বিশেষ শঙ্কর ধাতু (Alloy), যা লৌহ ও নিকেল থাকা সত্ত্বেও চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হবে না, দ্বারা নির্মিত না হয়], এবং ঘড়ি ঠিক সময় দেবে না। আর একবার চুম্বকের প্রভাবে ঘড়ির অংশ বিকল হয়ে

চিত্র 96



ঘড়ির ইস্পাতের কলকব্জাকে চুম্বকত্ব-প্রাপ্ত হবার হাত থেকে কে রক্ষা করে ?

গেলে, চুম্বক সরিয়ে নিলেও এর ক্ষতি সহজে মেরামত করা যাবে না। ইস্পাতের ক্রিয়াবিধি চুম্বক হয়েই থাকবে এবং এর আমূল গুণগত পরিবর্তন প্রয়োজন হবে। সুতরাং সোনার ঘড়ি নিয়ে এই পরীক্ষা করতে যেও না। আর্থিক ব্যয় হবে সেই জন্য প্রচুর।

কিন্তু বেশ সাহসের সঙ্গেই এই পরীক্ষাটা এমন ঘড়ি নিয়ে করতে পার যার ক্রিয়াবিধি লোহা বা ইস্পাতের কেস-এ রয়েছে। এর কারণ, এই দুটি ধাতু চুম্বক বলের দ্বারা প্রভাবিত হবে না ; এমন কি খুব শক্তিশালী ডায়নামোর আবর্তনীর কাছে রাখলেও ঘড়ি ঠিক সময়ই দিয়ে যাবে। এই সুলভ লৌহ-কেসের ঘড়িই ইঞ্জিনীয়র বা টেকনিসিয়ানদের পক্ষে আদর্শ স্থানীয়।

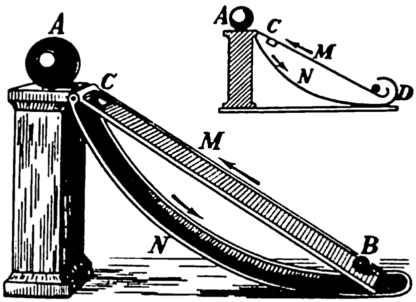
চুম্বকীয় নিরবচ্ছিন্ন গতি-সম্পন্ন যন্ত্র

'নিরবচ্ছিন্ন গতি-সম্পন্ন' যন্ত্র আবিষ্কারের প্রচেষ্টার পশ্চাতে চুম্বক ও তার শক্তির ভূমিকা কোনো অংশে কম নয়। ত্রি-তারকা চিহ্ন বিশিষ্ট 'নিরবচ্ছিন্ন গতি'-সম্পন্ন যন্ত্র আবিষ্কারকেরা সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন চুম্বককে এই কাজে ব্যবহার করার জন্য। এখানে এমনই একটি প্রকল্পের বিবরণ দেওয়া হল (চেস্টারের বিশপ ইংরেজ জন উইল্‌কিনস্‌ সপ্তদশ শতাব্দীতে এমন এক যন্ত্রের বর্ণনা দিয়েছেন)।

একটি শক্তিশালী চুম্বক *A* একটা স্তম্ভের মাথায় বসানো হয়েছে (চিত্র 97), যে স্তম্ভের সঙ্গে নততলে সংলগ্ন হয়ে আছে খাঁজ কাটা কাঠামো *M* এবং *N* ; *M*, *N*-এর উপরে আছে। উপরের *M* কাঠামোর মাথার কাছে একটা ছোট গর্ত আছে *C*, আর নিম্নের *N* কাঠামোটি বক্র। আবিষ্কারক অনুমান করেছিলেন সমস্ত ব্যবস্থাটা এইভাবে কাজ করবে ঃ একটা ছোট লোহার বল *B* উপরের কাঠামোয় স্থাপন করা হবে। চুম্বক *A* দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে, এটা উপরের দিকে

গড়াবে। গর্তে পৌঁছে এটা গর্ত দিয়ে *N* কাঠামোয় নেমে আসবে, যার গা বেয়ে নিচে গড়াবে, গতি-জাড্যের ফলে *D*-র বক্রপথে চলবে, আবার উপরের কাঠামোয় *M*-এ যাবে, আবার চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে উপরে যাবে, গর্ত দিয়ে গলে নিচেরটায় আসবে, আবার ও বক্ররেখা ধরে উঠবে এবং পর্যায়ক্রমে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে অনন্ত বার। আবিষ্কারকের ধারণা এটা 'নিরবচ্ছিন্ন-গতি' সৃষ্টি করবে।

চিত্র 97



"নিরবচ্ছিন্ন গতি" সম্পন্ন যন্ত্র।

আবিষ্কারকের ভুল কোথায়? খুব সহজেই তার ধারণার অবাস্তবতা ধরা পড়ে। তিনি কি করে চিন্তা করলেন যে, *N* কাঠামোয় নেমে এসে ছোট বলটির প্রচুর গতি-জাড্য থাকবে *D* বক্ররেখা ধরে আবার উপরে ওঠার? এরকমটি ঘটত যদি ছোট বলটি কেবলমাত্র অভিকর্ষ দ্বারা প্রভাবান্বিত হত। আমাদের কিন্তু আর একটি দ্বিতীয় বলও আছে, চুম্বকীয় আকর্ষণের বল, যা এত শক্তিশালী যে, ওটাও লোহার বলটিকে *B* অবস্থান থেকে *C* অবস্থানে আসতে বাধ্য করবে। ফলে, আমাদের ছোট বলটি *N* কাঠামোয় অবতরণের সময় গতি ত্বরান্বিত করতে পারবে না। পক্ষান্তরে, সে খুব ধীরে ধীরে অবতরণ করবে এবং এমন কি যদি এই মন্দীভূত গতিতে সে নিচে নামেও, এর গতি-জাড্য এমন হবে না যে বক্র-রেখায় আবার উর্ধ্বগামী হবে।

একটু আধটু অদল বদল করে ঐ প্রকল্প বারংবার তুলে ধরা হয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, একজন ঐ উদ্ভাবনের জন্য 'পেটেন্ট'-ও লাভ করেন। এটা ঘটে জার্মানীতে 1878 খ্রীষ্টাব্দে, শক্তির নিত্যতা সূত্র ('The law of conservation of energy) প্রকাশিত হবার তিরিশ বছর পরে। আবিষ্কারক চুম্বকীয় 'নিরবচ্ছিন্ন গতি-সম্পন্ন' যন্ত্রটির মূলে যে অযৌক্তিক নীতি রয়েছে তা এমন দক্ষতার সঙ্গে আঁচ করেছিলেন যে, তিনি পেটেন্ট কর্তৃপক্ষকে বোকা বানিয়েছিলেন, যদিও বিধি অনুসারে প্রাকৃতিক নিয়ম-বিরুদ্ধ কোনো নীতির উপর ভিত্তি করে

গড়ে তোলা কোনো আবিষ্কারকে পেটেন্ট দেওয়া হয় না। পরে অবশ্য প্রথমবারের মত প্রদত্ত এই ধরনের পেটেন্ট-এর অহংকারী মালিকের মোহমুক্তি ঘটেছিল, যেহেতু তিনি দু'বছরের মধ্যে উপযুক্ত পেটেন্ট শুল্ক জমা দেননি। এখন যে কোনো লোকই এর 'আবিষ্কারক' হতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয় না কখনো কারুর তা প্রয়োজন হবে।

যাদুঘরের সমস্যা

যাদুঘরের বিশেষজ্ঞদের অনেক সময় প্রাচীন পুঁথি-পত্রের পাঠোদ্ধার করতে হয়। সেই সব পুঁথি-পত্রের অবস্থা অনেক সময় এমন জরাজীর্ণ থাকে যে, পৃষ্ঠাগুলো পৃথক করার জন্য প্রভূত যত্ন নিতে হয়। সাফল্যের সঙ্গে কিভাবে এ কাজ করা যাবে সেটাই সমস্যা।

রাশিয়ার 'দি ইউ.এস.এস.আর. অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস'-এর একটি বিশেষ পুঁথি-পত্র সংরক্ষণ পরীক্ষাগার আছে যা এই ধরনের সমস্যা নিয়ে কাজ করে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে তড়িৎ-এর সাহায্য নেওয়া হয়। পাণ্ডুলিপির উপর তড়িৎ-শক্তি প্রদান করা হয়।

এই সমস্ত কাগজগুলো সমমেরু (Unipolar) বিশিষ্ট তড়িৎ-আধান (Charge) লাভ করে এবং ছিন্ন না হয়ে ভালোভাবে পৃথক হয়ে আসে—যেহেতু সম-তড়িৎ আধান (Charge) পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। এর পর অভিজ্ঞ দুটি হাত পৃষ্ঠাগুলোকে পৃথক করে নেয় এবং তুলে রাখে।

আর একটি কৃত্রিম 'নিরবচ্ছিন্ন গতি-সম্পন্ন' যন্ত্র

বৈদ্যুতিক মোটরের সঙ্গে ডায়নামো যুক্ত করে দেওয়ার ধারণা তাঁদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, যাঁরা নিরবচ্ছিন্ন গতির সমস্যাটা সমাধান করতে চেয়েছিলেন। প্রতি বছর প্রায় 6টা করে এই ধরনের প্রকল্প সম্বন্ধে উপদেশের জন্য আমার কাছে পাঠানো হত—সমস্যাটা শেষ পর্যন্ত এসে দাঁড়াত কিভাবে বৈদ্যুতিক মোটর থেকে একটা বেল্ট ডায়নামোর সঙ্গে যুক্ত করা যায় এবং ডায়নামোটি কিভাবে তড়িৎ-আবর্তনীর সাহায্যে মোটরের সঙ্গে যুক্ত করা যায়। ধারণা হল এই রকম: ডায়নামোটাকে প্রথমে চালিত করলে, যে তড়িৎ এ সৃষ্টি করবে তা বৈদ্যুতিক মোটরটিকে চালাবে, যেটা আবার তার পক্ষ থেকে ডায়নামোটিকে চলমান রাখবে। সুতরাং, আবিষ্কারকদের ধারণা মত, দুটি যন্ত্রই পরস্পরকে চলমান রাখবে, এবং একেবারে ক্ষয়প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত থামবে না।

বিষয়টা খুবই লোভনীয়, তাই না? কিন্তু যাঁরাই এই প্রকল্প নিয়ে কাজ করেছেন তাঁরাই লক্ষ্য করেছেন যে, আশানুরূপভাবে এটা কাজ করে না।

দুটো যন্ত্রেরই যদি কর্মক্ষমতা 100%-ও হয় তবুও না—একমাত্র যদি ঘর্ষণ বল পুরোপুরি না থাকে তবে তারা নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করবে। যন্ত্রের এই সমন্বয় বা ইঞ্জিনীয়ারের ভাষায় সমাবেশ প্রকৃত পক্ষে একটিই যন্ত্র যা ধারণানুসারে স্বয়ংক্রিয় থাকবে অবশ্যই, ঘর্ষণের অভাবে এটা ক্রমাগত চলবে, ঠিক অন্য কিছুর মত, কিন্তু এটা কোনো ব্যবহারিক প্রয়োজনে আসবে না, কারণ যন্ত্রটিকে কোনো কাজ করতে দিলে যন্ত্রটি তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে যাবে।

ওটা আমাদের 'নিরবচ্ছিন্ন গতি' দেবে, কিন্তু 'নিরবচ্ছিন্ন গতি-সম্পন্ন যন্ত্র' দেবে না। এ যাবৎ যা বলা হয়েছে তা প্রযোজ্য হবে, যদি ঘর্ষণ না থাকে, কিন্তু যেহেতু ঘর্ষণ থাকবেই, যন্ত্রটি একেবারেই কাজ করবে না।

আমার ভাবতে বিস্ময় লাগে, কেন এই 'নিরবচ্ছিন্ন গতি' নিয়ে ক্ষ্যাপারা কেবল দুটো পুলিকে বেল্ট দ্বারা সংযুক্ত করার এবং তাদের একটিকে ঘোরানোর কথা ভাবলেন না। কারণ উপরিউক্ত সমন্বয়ের ক্ষেত্রে যে সব যুক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে তার দ্বারা 'বিচার' করলে আমরা কি আশা করতে পারি না যে, প্রথম পুলি তাহলে দ্বিতীয় পুলিকে ঘোরাবে আবার দ্বিতীয় পুলি পক্ষান্তরে প্রথমটিকে ঘোরাবে? তাই বা কেন, এমন কি দ্বিতীয় পুলিকে বাদ দিয়েও দিতে পারতাম। এটাই কি যথেষ্ট নয় যে, একটি পুলির ডান অর্ধেক ঘোরালে যা ওর বাম অর্ধেক ঘোরাবে এবং এই বাম অর্ধেক আবার অনুরূপভাবে ডান অর্ধেককে ঘোরাবে?

এটা এতদূর অযৌক্তিক যে, আমার সন্দেহ হয় তারা কখনো কোনো 'নিরবচ্ছিন্ন গতি-সম্পন্ন যন্ত্র' আবিষ্কারককে কোনো চমক দেবে কি না, যদিও সে একই ভ্রমে ভুগছে।

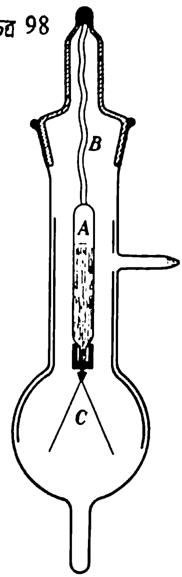
একটি 'প্রায় নিরবচ্ছিন্ন গতি'-সম্পন্ন যন্ত্র

গণিতবিদ, আমার মনে হয়, 'প্রায়-নিরবচ্ছিন্ন গতির' ধারণাটি সম্বন্ধে অবজ্ঞা প্রকাশ করবেন। এটা হয় একেবারে নিরবচ্ছিন্ন অথবা একেবারেই তা নয়। 'প্রায়-নিরবচ্ছিন্ন গতি' প্রকৃতপক্ষে নিরবচ্ছিন্ন গতি নয়। কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে এটাকে অন্যভাবেও দেখা যায়। আমার বিশ্বাস যদি কোনো 'প্রায় নিরবচ্ছিন্ন গতি'-সম্পন্ন যন্ত্র অন্তত এক হাজার বছর চলে তাতেই অনেকে সন্তুষ্ট হবে। মানুষের জীবনের পরিসর খুব অল্প এবং এক হাজার বছরকে অনন্তকাল হিসেবে কল্পনা করা যেতে পারে। যদি তা করা সম্ভব হয়, আমার মনে হয়, বাস্তব দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ 'নিরবচ্ছিন্ন গতি'-সম্পন্ন যন্ত্রের সমস্যাটার সমাধান হয়ে গেছে বলে মনে করবে।

এটা করা যেতে পারে; এক হাজার বছর গতি-সম্পন্ন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে রাজি হলে যে কোনো ব্যক্তিই এ রকম একটা যন্ত্রের

অধিকারী হতে পারে। কোনো 'পেটেন্ট'-এর জন্য গ্রহণ করা হয় না এবং এটা গোপনীয় কিছু নয়। সাধারণভাবে 'রেডিয়াম ঘড়ি' বলে কথিত এই যন্ত্রটি 1903 খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক স্ট্রেট আবিষ্কার করেন। এটা বেশ সহজ সাধারণ যন্ত্র (চিত্র 98)। যন্ত্রটিতে একটা ছোট কাচের নল A থাকে, যাতে এক গ্রামের কয়েক সহস্র ভাগের এক ভাগ 'রেডিয়াম সল্ট' কোয়ার্জ সুতো B দিয়ে ঝোলানো অবস্থায় থাকে (কোয়ার্জ তড়িৎ পরিবহণ করে না)। সমস্ত ব্যবস্থাটা একটা বায়ুশূন্য বন্ধ কাচের জারের মধ্যে রাখা হয়। কাচের নলের এক প্রান্ত তড়িৎ-বীক্ষণ যন্ত্রের (Electroscope) মত দুটো সূক্ষ্ম সরু সোনার পাতার তার দ্বারা যুক্ত। রেডিয়াম, তোমরা হয়ত জানো, তিন ধরনের রশ্মি বিকিরণ করে,—যথাক্রমে আল্‌ফা, বিটা ও গামা রশ্মি। আমাদের ক্ষেত্রে বিটা রশ্মি কাজটা করে। বিটা রশ্মি কাচের মধ্য দিয়ে অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে এবং ঋণাত্মক তড়িৎ-আধান যুক্ত কণিকা বা ইলেকট্রনের প্রবাহ ছড়ায়। বিচ্ছিন্ন ইলেকট্রন কণিকা বা তড়িতাণু ঋণাত্মক তড়িৎ-আধান বহন করে নিয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে নলের রেডিয়ামে ধনাত্মক আধান সৃষ্টি করে। এই ধনাত্মক তড়িৎ-আধান তারপর সোনার তারে ধনাত্মক তড়িৎ-আধান সৃষ্টি করে। এই ধনাত্মক আধান তখন সোনার পাতার সূক্ষ্ম তারে যায় এবং পরস্পর বিকর্ষণের জন্য তার দুটোর বিক্ষেপ ঘটে। তারা জারের দেওয়াল স্পর্শ করে। এরা আবার যথাযথ ভাবে সংলগ্ন তড়িৎবাহী টিনের পাতে তাদের আধান ছেড়ে দেয়, সোনার সরু তার আবার যথাস্থানে এসে একত্রিত হয়। প্রতিটি নতুন ইলেকট্রন আধানের সঙ্গে পেন্‌ডুলামের সময়ের সঙ্গে তাল রেখে রেখে প্রতি দু মিনিট বা তিন মিনিট অন্তর এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটে। এই জন্যই যন্ত্রটির ওরকম নামকরণ হয়েছে। যতদিন না রেডিয়াম একেবারে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এরকম চলতে থাকে; এটা অবশ্য 'নিরবচ্ছিন্ন গতি' যন্ত্র নয়, বরং কেবল একটা 'গিফট মোশন' ('Gift-motion') যন্ত্র।

চিত্র 98



প্রায় 1,600 বছরের মত চলতে পারে এরকম "নিরবচ্ছিন্ন দম-খাওয়া" একটি রেডিয়াম ঘড়ি।

কিন্তু রেডিয়াম কতদিন রশ্মি বিকিরণ করতে পারে? বিজ্ঞানীরা দেখেছেন রেডিয়ামের অর্ধেক জীবন 6000 বছরের। ফলে, একটি রেডিয়াম ঘড়ি না থেমে অন্ততঃ এক হাজার বছর চলবে। কেবল ক্রমহ্রাসমান তড়িৎ-আধানের জন্য দোলনাঙ্ক কমে আসবে। স্বাধীন রাষ্ট্র

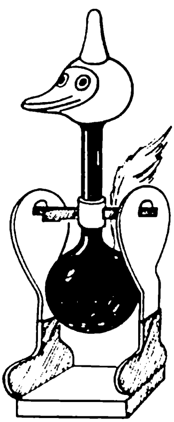
হিসেবে রাশিয়ার যখন জন্ম হল তখন যদি এই ধরনের একটা রেডিয়াম ঘড়ি চালু করা হত, তাহলে আজও সেটা চলত।

ব্যবহারিক কাজে এই 'গিফ্ট মোশন' যন্ত্র কি ব্যবহার করা যায়? দুর্ভাগ্যক্রমে, না। এর ক্ষমতা, অথবা প্রতি সেকেন্ডে এ যেটুকু কাজ করে তা এতই কম যে, এটা কোনো যান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই কার্যকরী করতে পারবে না। ভালো ও আশাপ্রদ ফল লাভ করার জন্য আমাদের অনেক বেশি রেডিয়াম প্রয়োজন হবে। যেহেতু রেডিয়াম অত্যন্ত বিরল ও অত্যন্ত মূল্যবান মৌল (Element), এ রকম একটা 'গিফ্ট মোশন' যন্ত্র ধ্বংসকারী হবে।

অতি লোভী পাখী

একটা চীন দেশীয় খেলনা আছে যা অনন্ত বিস্ময় ও আনন্দের উৎস। এটা সেই 'অতি লোভী পাখী' নামক খেলনা। একটা পানীয় জলের পাত্রের কাছে এটাকে বসালে, পাখীটি তার ঠোঁট জলে ডোবাবে এবং এটাকে পূর্ণ করে নিয়ে পূর্বের সোজা অবস্থায় ফিরে যাবে। কিছুক্ষণ পরে, এটা আবার ধীরে ধীরে ঠোঁট-টাকে জলে ডোবানোর জন্য ঝুঁকবে, আবার জল পান করবে এবং আগের

চিত্র 99



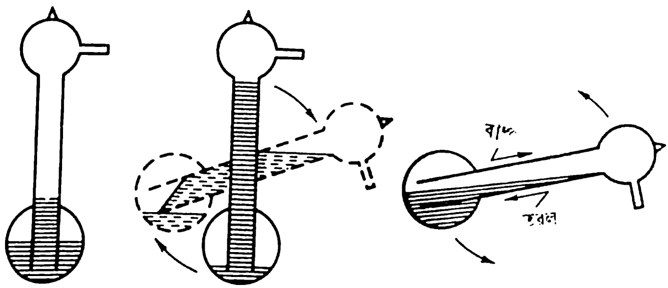
চির অতৃপ্ত খেলনা পাখি।

অবস্থায় ফিরে যাবে। এটাও একটা বিশেষ ধরনের 'গিফ্ট মোশন' যন্ত্র এবং অনেক বেশি দক্ষতার সঙ্গে উদ্ভাবিত। 99 নং চিত্রটি দেখ। পাখীটার দেহ কাচের নলের তৈরী, উপরের দিকটা ছোট মস্তকাকৃতির গোলকে পরিণত হয়েছে।

নলটির নিচের দিক ডোবানো রয়েছে বায়ুশূন্য অপেক্ষাকৃত বড় আকারের একটা আধারে। নলের খোলা-নিচের-মুখের একটু উপর পর্যন্ত আধারটি ইথারে পূর্ণ।

পাখীটাকে জল পান করাতে হলে এর মাথাটা অবশ্যই জলে ভেজাতে হবে। কিছুক্ষণের জন্য আমরা একে সোজা অবস্থায় দেখি, কারণ ইথার পূর্ণ নিচের আধারটি তখনো মাথাটি অপেক্ষা ভারী। তারপর আমরা দেখি ইথার ধীরে ধীরে উপরে উঠছে (চিত্র 100)। শেষ পর্যন্ত পাখীটার উপরের অংশই ভারী হবে যা পাখীটাকে ঝুঁকতে বাধ্য করবে এবং জলের পাত্রে ঠোঁটটাকে ডোবাতে বাধ্য করবে। যখন পাখীটি আবার অনুভূমিক অবস্থায় দুলবে, নলের খোলা নিম্নাংশ নিচের আধারের ইথারের তলের একটু উপরে এসে দাঁড়াবে। ফলে নলের ইথার নিচের আধারে চলে যাবে এবং পাখীটি আবার নিজের প্রাথমিক সোজা অবস্থায় ফিরে আসবে। এটাই ব্যবস্থাটার যান্ত্রিক দিক। আবার যখন ইথার উপরে ওঠে এবং ফিরে আসে, ভারকেন্দ্র (Centre of gravity) সরে যায়।

চিত্র 100 চিত্র অতৃপ্ত খেলনা-পাখির গুপ্ত রহস্য।



কিন্তু ইথারকে উপরে ওঠায় কি? ইথার সহজেই ঘরের তাপমাত্রায় বাষ্পীভূত হয়, কিন্তু সংপৃক্ত ইথারের বাষ্প যে চাপ দেয় তার খুব হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, যখন তাপমাত্রা বাড়ে-কমে।

যখন পাখীটি সোজা অবস্থায় থাকে, ইথার বাষ্পের দুটি স্পষ্ট পৃথক পৃথক অঞ্চল থাকে। উপরের মাথার নলের ইথার বাষ্প ও নিচের লেজের দিকের আধারের ইথার বাষ্প।

এখন পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার তুলনায় মাথার দিকটার তাপমাত্রা কমানোর বিশেষ ধর্ম আছে। এটা করা যাবে মাথাটাকে ছিদ্র যুক্ত (Porous) কোনো

পদার্থ দ্বারা তৈরি করে, যা সহজেই জলীয় বাষ্প শোষণ করতে পারবে এবং তীব্রভাবে তা বাষ্পায়ন (Evaporation) ঘটাবে।

সপ্তম অধ্যায়ে আমি উল্লেখ করেছি যে, প্রবল বাষ্পায়ন তাপমাত্রা কমায়। যেহেতু লেজের দিকের আধারের তুলনায় মাথার দিকের নলের তাপমাত্রা কম, মাথার দিকে নলের মধ্যের সংপৃক্ত বাষ্পের চাপ কমে আসবে। ফলে লেজের দিকের আধারের ইথার বাষ্পের অতিরিক্ত চাপে ইথার বাষ্প নল বেয়ে উপরে ওঠে। ভারকেন্দ্র সরে যায় এবং পাখীটি অনুভূমিক অবস্থায় যায়। তারপর দুটি সম্পূর্ণ মুক্ত প্রক্রিয়া ঘটে। প্রথমত, পাখীটি তার ঠোঁট ভেজায় এবং এর ফলে এর তুলোর নির্মিত মাথা জল শোষণ করে। দ্বিতীয়ত, মাথার নলের সংপৃক্ত-বাষ্প লেজের আধারের বাষ্পের সঙ্গে মেশে। চাপ সমতায় আসে (বাষ্পের চাপ, পারিপার্শ্বিক বাতাসের তাপে, সামান্য বাড়ে), এবং ইথার অভিকর্ষের জন্য লেজের আধারে প্রবাহিত হয়ে যায়। ফলে পাখীটি আবার পূর্বের খাঁড়া অবস্থায় ফিরে আসে।

যতক্ষণ তুলোর মাথা ভিজে থাকে ততক্ষণ এই ওঠা-নামা চলতে থাকে, কেবল পারিপার্শ্বিক বাতাসের আর্দ্রতা যদি খুব বেশি না হয়।

এই দুইটি কারক (Factor) সাধারণ বাষ্পায়ন নিশ্চিত করবে এবং পরিণামে মাথার নলের তাপমাত্রা আপেক্ষিকভাবে কমিয়ে আনবে। এইভাবে পারিপার্শ্বিক বাতাসের প্রদত্ত উষ্ণতা পাখীটিকে সব সময় ওঠা-নামা করাবে।

পৃথিবীর বয়স কত ?

তেজস্ক্রিয় মৌলের ক্ষয় যে সূত্রানুসারে পরিচালিত হয় তার পাঠ ও পর্যালোচনা বিজ্ঞানীদের হাতে পৃথিবীর বয়স নির্ধারণের বিশ্বাসযোগ্য উপায় এনে দিয়েছে।

তেজস্ক্রিয়াজনিত ক্ষয় (Radio active decay) বলতে আমরা কি বুঝি : এক শ্রেণীর পরমাণু থেকে অপর এক শ্রেণীর পরমাণুতে স্বতঃস্ফূর্ত রূপান্তরকেই আমরা তেজস্ক্রিয় ক্ষয় বলে অভিহিত করি। কোনো বাহ্যিক কারণানুসারে এই প্রক্রিয়া ঘটে না। খুবই কৌতুহলের বিষয় যে, তাপমাত্রা বা চাপের হ্রাস-বৃদ্ধি ইত্যাদি এই প্রক্রিয়ার বেগের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করে না। (লক্ষ লক্ষ হাজার গুণ তাপমাত্রা যদি কোনো প্রভাব বিস্তার করে)। কোনো কোনো খনিজ পদার্থে বিদ্যমান ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম বা অ্যাক্টিনিয়াম কয়েক শ্রেণীর তেজস্ক্রিয় পদার্থের বংশধর। এই প্রত্যেক শ্রেণীই তেজস্ক্রিয় মৌলের স্বতঃস্ফূর্ত রূপান্তরের ক্রমপরিণতি। এই তিন মৌলের সব কটির ক্ষেত্রেই স্বতঃস্ফূর্ত রূপান্তরের ফলে পরিণত হয় সীসা। সাধারণ সীসার থেকে, সত্যই, এই সীসার প্রত্যেক ক্ষেত্রেই 'পারমাণবিক ভর' আলাদা। একটি সাধারণ সীসার পরমাণু

একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর চেয়ে 207 গুণ ভারী। কিন্তু যে পরমাণু দিয়ে ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম বা অ্যাক্টিনিয়াম মৌল শ্রেণী শেষ হচ্ছে তাদের পারমাণবিক ভর যথাক্রমে 206, 208 এবং 207 গুণ অধিকতর ভারী। অতএব নিশ্চয়ই এদের পার্থক্য নিরূপণ করা যায়।

ক্ষীয়মাণ পরমাণুর আলফা রশ্মি নির্গমনের ফলেই এই স্বতঃস্ফূর্ত রূপান্তর ঘটে। এই আলফা রশ্মি হল হালকা নিষ্ক্রীয় হিলিয়াম গ্যাসের এক গুচ্ছ তড়িৎ-আধান কণা বা পরমাণু। যেহেতু এই সকল তড়িৎ-আধান কণাগুলির গতিবেগ প্রচন্ড, তারা যখন মুক্ত হয় তখন তারা তাদের ধনাত্মক আধান হারায় এবং সাধারণ হিলিয়াম কণা রূপে খনিজের উপর জমা হয়। এর দ্বারাই আমরা বুঝতে পারি কেন সকল তেজস্ক্রিয় খনিজে আমরা হিলিয়ামের সন্ধান পাই।

কিন্তু, হিলিয়ামের পরিমাণ দেখে খনিজের বয়স গণনা আমাদের সত্য থেকে বহু দূরে নিয়ে যেতে পারে, যেহেতু যে কোনো হালকা গ্যাসের মত হিলিয়ামেরও বাষ্পায়ন ঘটে।

কিন্তু খনিজে যে পরিমাণ সীসা জমা হয়েছে তা পরীক্ষা করে কি অধিকতর নির্ভুল বয়স গণনা করা সম্ভব হয় না? 1940 খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ব্রিটিশ ভূ-তত্ত্ববিদ হোমস বিভিন্ন খনিজে সীসার সমস্থানিকের (Isotopes) পরিমাণগত মান নির্ণয় করে সিদ্ধান্তে আসেন যে, পৃথিবীর বয়স 350 কোটি বছর। প্রকৃত পক্ষে তিনি পৃথিবীর বয়স হিসাব করেন নি, করেছেন পৃথিবীর ভূ-ত্বকের বয়স এবং আরও সিদ্ধান্ত করেন প্রাচীন ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন উত্তপ্ত জমাট গ্যাস থেকেই পৃথিবীর জন্ম।

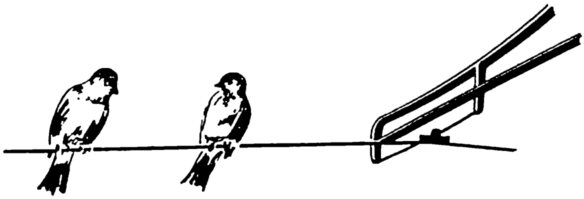
1951-52 খ্রীষ্টাব্দে অ্যাকাডেমিসিয়ান এ. পি. ভিনোগ্রাডোভ সমস্ত প্রাপ্ত তথ্যাবলী পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত করেন যে, কেবলমাত্র সীসার তথ্যের ভিত্তিতে পৃথিবীর ভূ-ত্বকের বয়স হিসাব করা অসম্ভব। এটুকুই বলা যায় যে, এর বয়স 500 কোটি বছরের বেশি নয়। আবার এমন খনিজও পাওয়া গেছে যার বয়স হিসাব করে দেখা গেছে 300 কোটি বছর। সমপরিমাণ দুটি ইউরেনিয়াম সমস্থানিক (Isotopes) (যাদের পারমাণবিক ভর যথাক্রমে 235 এবং 238)-এর ক্ষয়ের বেগ সংক্রান্ত তথ্য ধরে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর বয়স হিসাব করেছেন 500 কোটি থেকে 700 কোটির মধ্যে।

সুতরাং আমরা অনুমান করতে পারি যে, পৃথিবীর বয়স প্রায় 600 কোটি বছর। এই হিসাবটা মোটামুটি নির্ভুল হিসাবে ধরা যেতে পারে, যেহেতু সম্পূর্ণ ভিন্ন অন্য একটি উপায়েই এই অঙ্কে আসা গেছে। স্বভাবতই মানুষের ইতিহাসের তুলনায়, কেবলমাত্র জীবনকালের তুলনায়, এই 600 কোটি বছর কত কত বড়!

বৈদ্যুতিক তারের উপর পাখী

বিদ্যুৎবাহী উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মাথার উপরের তার বা ট্রামের উপরের তার স্পর্শ করা কত বিপজ্জনক তোমরা জানো। তোমরা জানো কত লোক বা বড় জন্তু-জানোয়ার এক রকম বিদ্যুৎবাহী ছিন্ন তারে বিদ্যুৎ-স্পৃষ্ট হয়েছে। তা হলে পাখীরা কি করে এরকম বিদ্যুৎবাহী তারের উপর স্বচ্ছন্দে এসে বসে (চিত্র 101) ?

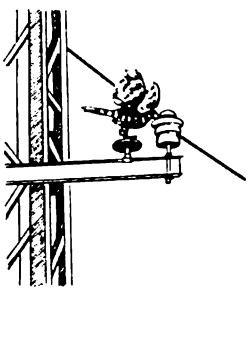
চিত্র 101



পাখিরা বৈদ্যুতিক তারের উপর নিরাপদে বসে থাকে। কেন?

পরস্পর বিরোধী এই বিষয়টা বুঝতে হলে নিম্নলিখিত ঘটনা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা প্রয়োজন। তারে উপবিষ্ট পাখীর দেহটাকে তড়িৎ-বর্তনীর একটা শাখা হিসাবে ভাবতে হবে, যার রোধ (Resistance) তড়িৎ-বর্তনীর অপর শাখা, স্বভাবতই যা পাখীর দুই থাবার মধ্যেকার সংক্ষিপ্ত পরিসর, তার রোধের চেয়ে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি।

চিত্র 102



একটি নিঃসঙ্গ পাখি উচ্চ ভোল্টেজ ট্রান্সমিশন লাইনের অবলম্বনে বসে।

সুতরাং পাখীর দেহের মধ্য দিয়ে যে তড়িৎ-প্রবাহ চলে তার তীব্রতা নগণ্য এবং ফলে ক্ষতিকর নয়। কিন্তু যেই মাত্র পাখীটি তড়িতের দণ্ডটি পাখা দিয়ে, লেজ দিয়ে বা ঠোঁট দিয়ে স্পর্শ করে অথবা ভূমির সঙ্গে কোনো প্রকারে সংযোগ

স্থাপন করে, সে তৎক্ষণাৎ বিদ্যুৎ-স্পৃষ্ট হয়। তোমরা যে নিশ্চয়ই এটা লক্ষ্য করেছ এতে কোনো সন্দেহ নেই।

উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বৈদ্যুতিক তারের মাধ্যমের উপর বসে তড়িৎ-প্রবাহ চালু থাকার সময় তার ঠোকরানো পাখিদের অভ্যাস। যেহেতু মাধ্যমটি ভূমি থেকে তড়িৎ-অন্তরিত (Insulated) করা হয় নি, পাখি যে মুহূর্তে তার স্পর্শ করে সেই মুহূর্তে বিদ্যুৎ-স্পৃষ্ট হয়।

এ ব্যাপারটা এত বেশি ঘটে যে, জার্মানীরা একদা বিশেষ পক্ষী সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। উচ্চ বিদ্যুৎবাহী লাইনের মাধ্যমের সঙ্গে বিদ্যুৎ-অপরিবাহী বা বিদ্যুৎ-রোধী বসার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এই রকম ব্যবস্থায় পাখীরা বিদ্যুৎবাহী তার ঠোকরালেও আর বিদ্যুৎ-স্পৃষ্ট হয় না (চিত্র 102)। কখনো কখনো আবার পাখীদের বসতে বাধা দেবার জন্য তড়িৎবাহী তার ঘিরে রাখা হয়।

বিদ্যুতের আলোয়

বর্ষার দিনে বজ্রের আলো যখন চমকায় তখন ব্যস্ত রাস্তার পারাপার করার পথ (Crossings) কখনো কি লক্ষ্য করেছ? খুব অদ্ভুত লাগলেও, বিদ্যুৎ চমকানোর সময় সব কিছু, যা এর এক মুহূর্ত আগে প্রাণবন্ত ছিল, তা নিশ্চল মনে হবে; গাড়িগুলো মনে হবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে এবং তুমি এদের চাকার স্পোকগুলো স্পষ্ট দেখতে পারবে।

এর কারণ হল সময়ের অতি ক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশের জন্য বিদ্যুৎ চমকায়। যে কোনো বৈদ্যুতিক স্ফুরণের মত মেঘের বিদ্যুৎ স্বতঃস্ফূর্ত—এতই স্বতঃস্ফূর্ত যে, আমাদের প্রচলিত প্রক্রিয়ায় সময়ের পরিমাপ সম্ভব হয় না। যাই হোক, বিজ্ঞানীরা পরোক্ষভাবে হিসাব করে দেখেছেন যে, বিদ্যুৎ-চমক এক সেকেণ্ডের সহস্র ভাগের এক ভাগেরও কম সময় স্থায়ী হয়।* এইরূপ অত্যন্ত ক্ষুদ্র সময়ান্তরে কিছুই লক্ষণীয়ভাবে তেমন নড়ে না। তাই বিদ্যুৎ-চমকের সময় যে কোনো ব্যস্ত রাস্তা অচল মনে হবে, এতে আর আশ্চর্যের কিছু নেই। বস্তুত এক সেকেণ্ডের সহস্র ভাগের এক ভাগ সময়ের ব্যবধানে যা স্থায়ী হয় আমরা কেবলমাত্র তাই দেখি, এই সময়ান্তরে গাড়ির চাকা এক মিলিমিটারেরও এক নগণ্য অংশ মাত্র আবর্তন করে—যা আমাদের চোখে ধরা দেয় না।

---

* অবশ্য বিদ্যুৎ চমকানোর এমন ঘটনাও আছে যা সেকেণ্ডের কয়েক দশমাংশ পর্যন্ত 'প্রায়' স্থায়ী হয়। এবং বিদ্যুৎ কয়েকটি পর পর চমকের শ্রেণী বিন্যাসে চমকে ওঠে, প্রতিটি বজ্র প্রথমটির তৈরী সংযোজক পথ (Corridor) ধরে 'প্রায়' দেড় সেকেণ্ড সময় যায়।—স.

বিদ্যুতের মূল্য কত ?

সুপ্রাচীন কালে যখন বিদ্যুৎকে 'স্বর্গীয় জীব' হিসেবে চিন্তা করা হত, তখন এমন প্রশ্ন করলে লোকে বলত, ঈশ্বরের নিন্দা করা হচ্ছে। কিন্তু আজকে বিদ্যুৎকে যখন পণ্য হিসেবে গণ্য করা হয় তখন অন্যান্য পণ্যের মত বিদ্যুৎকে পরিমাপ করা ও মূল্যায়ন করার প্রশ্নটি নিরর্থক বা অবান্তর বলে মনে হবে না। এ ব্যাপারে আমাদের সমস্যা হল বিদ্যুৎ মোক্ষণের সময় কতটা বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যয়িত হয় তার হিসাব করা এবং অন্তত পক্ষে বিদ্যুতের মূল্যের হার অনুযায়ী তার মূল্য নিরূপণ করা।

বিদ্যুৎ-মোক্ষণের বিভব প্রায় 5 কোটি ভোল্ট, বিদ্যুৎ-প্রবাহের সর্বোচ্চ তীব্রতা 200,000 অ্যাম্পীয়ার (এটা নির্ণয় করা হয় বিদ্যুৎ কোনো বিদ্যুৎ-পরিবাহীকে পৃষ্ট করার সময় তার বর্তনীর মধ্য দিয়ে যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ প্রেরণ করে তা একটা ইস্পাতের দণ্ডকে কতখানি চুম্বকত্ব দেয় তার পরিমাপ দিয়ে।) ওয়াটেজ নির্ণয় করা হয় ভোল্টের সংখ্যাকে অ্যামপীয়ারের সংখ্যা দিয়ে গুণ করে। কিন্তু এই হিসাব করার সময় আমাদের এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি রাখা দরকার যে, এই মোক্ষণের সময় বিভব শূন্যে নেমে আসে। সুতরাং আমাদের গড় বিভব নিতে হবে, বা অন্য কথায়, প্রাথমিক ভোল্টেজের অর্ধেক ভোল্টেজ নিতে হবে। এর থেকেই আমরা পাই মোক্ষণ-ওয়াটেজ $= \frac{50,000,000 \times 200,000}{2}$

$= 5,000,000,000,000$ ওয়াট বা 500 কোটি কিলোওয়াট।

এতগুলো শূন্যের সারি দেখে আমাদের বিশ্বাস জন্মাবে যে, তাহলে বিদ্যুৎ এর খরচ নির্ণয় করতে গিয়ে অনুরূপ জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অংক আসবে। কিন্তু কিলোওয়াট ঘণ্টা (Kilowatt hours), যার উপর বিদ্যুৎ খরচের হার নির্ভর করে, তা নির্ণয় করার জন্য সময়ের দিকটাও হিসাবে ধরতে হবে। আমাদের বিদ্যুৎ-মোক্ষণ এক সেকেণ্ডের সহস্রভাগের এক ভাগ স্থায়ী হয়। এই সময়ান্তরে $\frac{5,000,000,000}{3,600 \times 1,000}$ বা প্রায় 1,400 কিলোওয়াট আওয়ার খরচ হয়। প্রতি কিলোওয়াট আওয়ারে খরচের হার 4 কোপেক। সুতরাং বিদ্যুৎ-মোক্ষণের জন্য খরচ হবে $1,400 \times 4 = 5,600$ কোপেক বা 56 রুবল।

কি আশ্চর্যের কথা! বিদ্যুৎ, যার শক্তি, ভারী কামানের গোলা দাগার সময় যে শক্তির উদ্গীরণ হয় তার চেয়ে শত গুণ বেশি, তার খরচ মাত্র 56 রুবল।

উৎসাহের সঙ্গে লক্ষ্য করার বিষয় যে, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং কৃত্রিম উপায়ে বিদ্যুৎ-মোক্ষণের কত কাছে চলে এসেছে। পরীক্ষাগারে বিজ্ঞানীরা এক

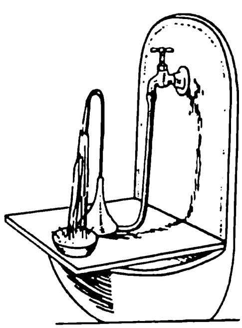
কোটি ভোল্টের বিদ্যুৎ-মোক্ষণ করে দেখেছেন এবং উৎপাদন করেছেন 15 মিটার দৈর্ঘ্যের স্ফুলিংগ।

ঘরে বজ্র-বিদ্যুৎপূর্ণ ঝড়

বাড়ীতে ছোট-খাটো একটা ঝরণা তৈরী করা খুবই সহজ। রবারের একটা নল নিয়ে তার এক মুখ একটা জলের পাত্রে চেয়ারের উপর রাখ অথবা একটা জলের কলের মুখে লাগাও। যদি ঝরণাটাকে জল ছিটানোর উপযোগী করে তুলতে চাও, নলের অপর দিকের মুখটা খুবই সরু করতে হবে। খুব সহজেই সেটা করার উপায় হল সীস-হীন ফাঁপা একটা পেনসিলের বোঁটা ওর সঙ্গে যুক্ত করা। সহজতর করার জন্য পেনসিলের অগ্রভাগটিকে (103 চিত্রে যেমন দেখানো হয়েছে) একটা উল্টানো ফানেলের প্রান্তে রাখ।

ঝরণাটাকে, ঘরের সীলিং-এর দিকে স্প্রে-টা যাতে হয়, উপরের দিকে মুখ করে অর্ধ মিটার উচ্চ পর্যন্ত কাজ করতে দাও। তারপর এক টুকরো ইতিমধ্যে কাপড়ে ঘষা একটা মোমবাতি বা ইবোনাইটের চিরুণী সামনে আনো। ছড়ানো-ছিটানো ঝরণার জলধারা তৎক্ষণাৎ একটা জলের স্তম্ভে পরিণত হবে। ওটাকে একটা প্লেটের উপর পড়তে দিলে মনে হবে ঘরের মধ্যে বজ্র-বিদ্যুৎ সহ ঝড়-বৃষ্টির শব্দ হচ্ছে। 'প্রশ্নাতীতভাবে', পদার্থবিদ বয়সী এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "এই কারণেই বজ্র-বিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টির সময় বৃষ্টির ফোঁটাগুলো অত বড় হয়।" মোমবাতি বা চিরুণী সরিয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গে ঝরণার জলধারা আবার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাবে এবং বিচ্ছিন্ন জলধারার টিপটিপ শব্দ শোনা যাবে।

চিত্র 103



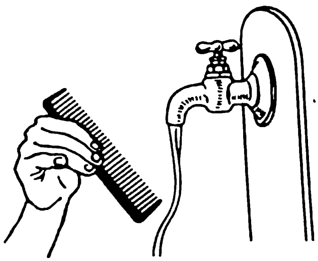
ছোট আকারে বজ্র-বিদ্যুৎপূর্ণ ঝড়।

ঘরের মধ্যে এটা একটা যাদুর খেলা হিসেবে দেখানো যেতে পারে এবং যারা প্রথম থেকে জানে না তাদের কাছে মোমবাতিটা মনে হবে যাদুকাঠি।

জলের ফোঁটা তড়িৎ-আবিষ্ট হবার ফলেই এমনটি ঘটছে। মোমবাতির কাছাকাছি ফোঁটাগুলো পাচ্ছে ধনাত্মক তড়িৎ-আধান আর দূরের ফোঁটাগুলো ঋণাত্মক তড়িৎ-আধান; পারস্পরিক আকর্ষণই ফোঁটাগুলোকে একত্রিত করে দিয়েছে।

জলধারার উপর তড়িতের প্রভাব সনাক্ত করার আরও সহজতর উপায় আছে। মাথার চুলের উপর বেশ কয়েকবার চিরুণী চালিয়ে ওটাকে কলের জলের-ধারার সামনে নিয়ে ধরো। জলের ধারা জমাট হয়ে পড়ার সময় দর্শনীয়ভাবে বেঁকে যাবে (চিত্র 104)। আগের দৃষ্টান্তের চেয়ে এটা অবশ্য ব্যাখ্যা করা একটু কঠিন; তড়িৎ-মোক্ষণের ফলে উপরিভাগের চাপের (Surface tension) পরিবর্তনের সঙ্গে এটা জড়িত।

চিত্র 104



কলের জলের ধারা বেঁকে যাচ্ছে যখন তড়িতাহত চিরুণী ওর সামনে আনা হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যাক যে, ঘর্ষণের সময় তড়িৎ-মোক্ষণ যেমন সহজে জমা হয় তা পুলির (Pulley) সঙ্গে বেল্টের ঘর্ষণের ফলে বেল্টগুলোর তড়িতাহত হবার ঘটনা প্রমাণ করে। এইভাবে যে তড়িৎ-স্ফুলিংগ ঘটে তা অনেক সময় আগুন ধরায়। এ থেকে রক্ষা করার জন্য বেল্টগুলোর উপর পাতলা রুপোর পাত মুড়ে দেওয়া হয়। এটা বেল্টগুলোকে তড়িৎ-পরিবাহী করে তোলে, ফলে তড়িৎ-মোক্ষণ জমা হতে পারে না।

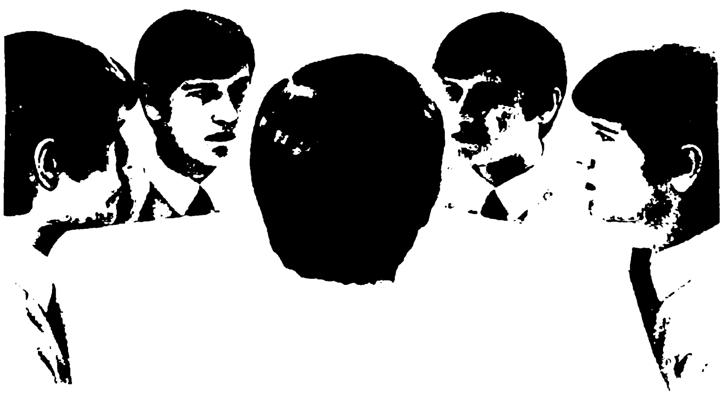
পরিচ্ছেদ ৭

আলোকের প্রতিফলন এবং প্রতিসরণ, দৃষ্টি

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে একই মুখের ছবি (কুইনটাপ্‌ল্‌ ফটো)

105 নং চিত্র তোমাদের সামনে একটা ছবির কিউরিও উপস্থিত করছে—একই মানুষের ছবি এখানে পাঁচটি বিভিন্ন ভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। সাধারণ ছবির

চিত্র 105 পাঁচরকম ভাবে একই মুখের ছবি।



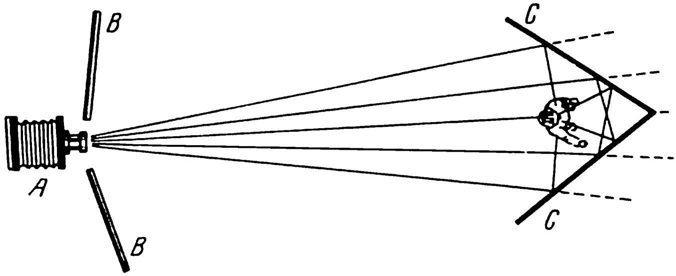
চেয়ে এই ধরনের ছবি নিঃসন্দেহে অনেক উন্নত ধরনের, কারণ এইসব ছবি কোন মানুষের পূর্ণতর চিত্র তুলে ধরে। মাথার বিশেষ বৈশিষ্ট্য যাতে পাওয়া যায় তার জন্য ফটোগ্রাফার কত রকম ভাবেই না চেষ্টা করেন। বহুমুখী এই ধরনের ছবি কয়েকটি চিত্র তুলে ধরে যাতে তার মধ্য থেকে সবচেয়ে ভালোটি বাছাই করে নেওয়া যায়।

এখন দেখা যাক কিভাবে এই ফটো তোলা যায়? আয়নার সাহায্যে কাজটা করা হয় (চিত্র 106)। যার ছবি তোলা হবে তার পেছন দিক থাকে

ক্যামেরা A-র দিকে। সামনে দুটো চ্যাপ্টা (Flat) আয়না পরস্পর 360°-র এক-পঞ্চমাংশ কোণ করে অর্থাৎ 72° কোন করে বসানো থাকে। এই দুটি আয়না বিভিন্নভাবে ক্যামেরার দিকে চারটি প্রতিফলন দেবে। এই প্রতিফলনগুলোর এবং যার ছবি তোলা হবে তার—ছবি তোলা হয়। স্বভাবতই ফ্রেমহীন আয়না ছবিতে ধরা পড়ে না। ক্যামেরার প্রতিফলন বন্ধ করার জন্য এটাকে দুটি BB পর্দা (Sereen) দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এমনভাবে রাখা হয় যে, ক্যামেরার অ্যাপারচারটা শুধু খোলা থাকে।

কিভাবে অনেকগুলো ছবি একসঙ্গে তোলা যায়। যার ছবি তোলা হবে সে CC আয়নার দুটোর মধ্যে বসে।

চিত্র 106



কতগুলো প্রতিফলন হবে তা নির্ভর করে আয়না দুটোর মধ্যবর্তী কোণের ওপর ; কোণ যত সূক্ষ্ম হবে, প্রতিফলন তত বেশি হবে। যদি কোণের পরিমাপ 90° হয়, অর্থাৎ 360 ঃ 4, আমরা 4টি প্রতিফলন পাই। যদি কোণ হয় 60°, অর্থাৎ 360 ঃ 6, প্রতিফলন হবে 6টি। 45° হলে অর্থাৎ 360 ঃ 8, আমরা পাই 8টি প্রতিফলন। এইভাবে কোণের পরিমাপ নানা রকম নিয়ে আমরা প্রতিবিম্বের সংখ্যা বাড়াতে কমাতে পারি। কিন্তু প্রতিফলনের সংখ্যা যত বাড়বে, প্রতিবিম্ব তত নিষ্প্রভ হবে। এই কারণেই ফটোগ্রাফার মোটামুটি পাঁচটি প্রতিফলনের মধ্যে ছবি তোলা সীমাবদ্ধ রাখেন।

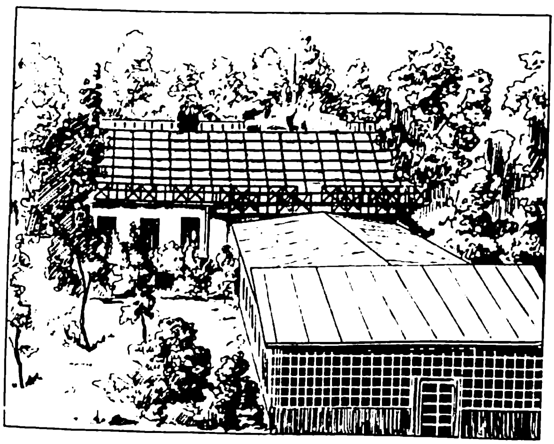
সৌরশক্তিতে সক্রিয় মোটর ও হিটার

বয়লারকে উত্তপ্ত করার জন্য সৌরশক্তিকে কাজে লাগানোর ধারণাটা সত্যিই অভিনব। একটি সহজ পরিমাপ ঃ বিজ্ঞানী জানেন, বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগের যে সমস্ত তল সূর্যরশ্মির সঙ্গে সমকোণে রয়েছে তার প্রতি বর্গ সেণ্টিমিটার প্রতি মিনিটে কত তাপশক্তি পায়। যেহেতু আপাতদৃষ্টি থেকে এটা ধ্রুবক, একে সাধারণভাবে 'সৌরস্থিরাংক' (Solar constant) ধরা হয়। এর মান পূর্ণসংখ্যায় প্রতি বর্গ সেণ্টিমিটার প্রতি মিনিটে দুই ক্যালরির সমান। সূর্য এই যে তাপ

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে নিয়মিতভাবে আমাদের পাঠাচ্ছে, তার সবটাই পৃথিবীর কাছে পৌঁছায় না। প্রায় অর্ধ ক্যালরি বায়ুমণ্ডলে শোষিত হয়ে যায়। আমরা নিশ্চিতভাবে ধরে নিতে পরি সূর্যরশ্মির সঙ্গে সমকোণে স্থাপিত ভূ-ভাগের প্রতি বর্গ সেণ্টিমিটার মোটামুটিভাবে প্রতি মিনিটে 1·4 ক্যালরি উত্তাপ পায়। বর্গ-মিটারে, তাহলে দাঁড়ায় এই উত্তাপ প্রতি মিনিটে 14,000 ক্যালরি বা 14 বড় ক্যালরি বা সেকেণ্ডে প্রায় $\frac{1}{4}$ বড় ক্যালরি। যেহেতু এক বড় ক্যালরি 427 কে.জি.-এম. যান্ত্রিক কাজ দেয়, মাটির উপর এক বর্গমিটারে সমকোণে পতিত সূর্যরশ্মি প্রতি সেকেণ্ডে 100 কে.জি.এম.-এর বেশি শক্তি দেয় বা অন্য কথায় $1\frac{1}{3}$-র বেশি ক্ষমতা উৎপন্ন করে।

সূর্যরশ্মি যখন লম্বভাবে পড়ে এবং সমস্ত সৌরশক্তিই যখন যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়—সেই সর্বোচ্চ অবস্থায় এই পরিমাণ কার্য সৌরশক্তি করতে পারে। অবশ্য, এই চরম মানে পৌঁছতে হলে আমাদের আরও অনেকটা পথ যেতে হবে। এ পর্যন্ত যে কার্যক্ষমতা পাওয়া গেছে, তা কার্যত 5-6%-এর বেশি নয়। সর্বোচ্চ ক্ষমতা—15%, দেখা গেছে অধ্যাপক চার্লস অ্যাবটের সৌরশক্তি-চালিত মোটরে।

চিত্র 107



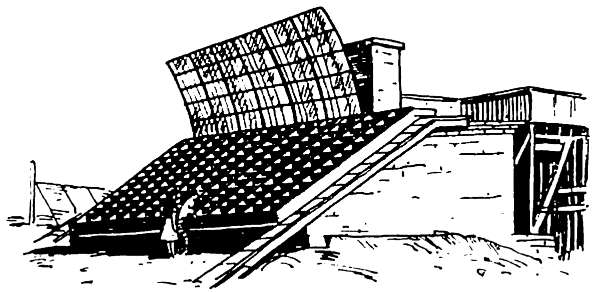
সৌরশক্তি-চালিত টার্কমেনিয়ার জল গরম করার ইউনিট।

যান্ত্রিক কাজের জন্য নয়, উত্তপ্ত করার জন্য সৌরশক্তিকে ব্যবহার করা অনেক বেশি সহজ। রাশিয়ায় এদিকে যথেষ্ট নজর দেওয়া হয়েছে। সমরকন্দে একটি

বিশেষ সৌরকেন্দ্র আছে যা এই নিয়ে ব্যাপক গবেষণায় রত। স্নানাগার, ওয়াটার-হিটার সমেত বহুবিধ সৌরশক্তি সম্বলিত কলাকৌশল প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এদের নিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। সৌরশক্তিসম্পন্ন ওয়াটার হিটার-এর কার্যক্ষমতা প্রায় 47%, যদিও সর্বোচ্চ ক্ষমতা পাওয়া গেছে 61%। টার্কমেনিয়ায় আর একটা যে অনুরূপ প্রণালী উদ্ভাবন করা হয়েছে তা হল সৌর রেফ্রিজারেটর, যার শীতল করার ব্যাটারির তাপমাত্রা 0° সেণ্টিগ্রেডের নিচে 2-3° সেণ্টিগ্রেড, যখন বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা ছায়ায় 0°-র উপরে 42° সেণ্টিগ্রেড। এটাই এই ধরনের প্রথম অর্থকরী সৌর রেফ্রিজারেটর।

গন্ধক, যার গলনাংক 120°C, সৌরশক্তির সাহায্যে তা গলানোর পরীক্ষা সুন্দর ফল দিয়েছে। বিশুদ্ধ জল পাবার জন্য ক্যাসপিয়ান ও আরাল সাগরের সৌরশোধন প্রণালী, সেণ্ট্রাল এশিয়ান পাম্পের পরিবর্তে সৌরশক্তিসম্পন্ন পাম্প, ফল ও মাছ শুষ্ক করার জন্য সান-ড্রায়ারস, সোলার-কিচেন রেঞ্জ ইত্যাদিও সৌরশক্তিকে কাজে লাগানোর অন্যান্য প্রচেষ্টা হিসেবে উল্লেখ করা যায়। সৌরশক্তিকে কাজে লাগানো হচ্ছে কত দিকে আরও কতভাবে। সৌরশক্তি, নিঃসন্দেহে, মধ্য এশিয়া, ককেসাস, ক্রিমিয়া, ভল্গা উপদ্বীপ ও দক্ষিণ ইউক্রেইনের অর্থনীতিতে আগামী দিনে বহু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে।

চিত্র 10৪



সৌরশক্তি-চালিত টার্কমেনিয়ার চিমগর।

অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার টুপি

উপকথায় এক যাদু-টুপির কথা আছে যা পারলে পরিধানকারী হারিয়ে যায়। এই টুপির অলৌকিক ক্ষমতা বিখ্যাত রুশ কবি পুশাকিন তাঁর 'রুশলান ও লুডমিলা' কাব্যে বর্ণনা করেছেন ঃ

এটা কুমারীর মনে হল উদয়—
যা স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে প্রায়ই হয়—
যাদুকরের টুপি পরীক্ষা করতে গিয়ে
লুডমিলা দেখেন বাঁকিয়ে-চুরিয়ে,
সোজা করে, কাৎ করে, কত রকমভাবে
ইচ্ছে যাদুকরের টুপি পরতে যাবে।
পেছনের দিকটা যেই সামনে ধরা—
কি যে হল! ভেবে হল আত্মহারা।
লুডমিলা তৎক্ষণাৎ হারিয়ে যায়,
কিন্তু পরেই সেটা ঠিক করে, হায়!
লুডমিলা ফিরে আসে। পুনরায় পরে
আবার সে হারিয়ে যায় নতুন করে।
হায়! হায়! আমার বৃদ্ধ যাদুকর
শত শত কৃতজ্ঞতা তোমার পর।
এত দিনে আমি আমার মুক্তি পেলাম।
সুখে ও স্বস্তিতে রয়ে গেলাম।

বন্দিনী লুডমিলা অদৃশ্য হওয়ার টুপিটি ব্যবহার করেন নিজের নিরাপত্তার জন্য। রক্তচক্ষু পাহারাদারদের নাগাল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যই তিনি মাঝে মাঝে হারিয়ে যেতেন। কেবল তাঁর কাজ দেখেই তারা তার উপস্থিতি টের পেত।

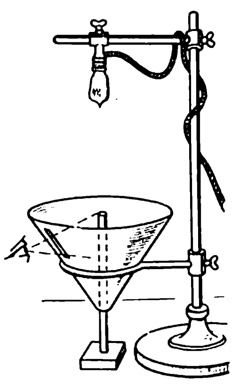
প্রাচীন লোকসাহিত্যের অনেক উপাখ্যানই আজ প্রতিদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞান বহু অসাধ্য সাধন করেছে। আজ আমরা পাহাড় ফাটাচ্ছি, বৈদ্যুতিক আলো-কে ফাঁদে ফেলেছি, 'উড়ন্ত কার্পেটে' ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমরা কি 'হারিয়ে যাওয়ার টুপি'টি আবিষ্কার করতে পারি না, অথবা নিজেদের সম্পূর্ণ অদৃশ্য করার কি কোনো উপায় উদ্ভাবন করতে পারি না? এ বিষয়টা এবার আলোচনা করা যাক।

অদৃশ্য মানুষ

এইচ. জি. ওয়েলস তাঁর 'দি ইনভিজিবল্ ম্যান' শীর্ষক কল্পবিজ্ঞানমূলক গ্রন্থে আমাদের বিশ্বাস করাতে চেয়েছেন যে, আমাদের নিজেদের অদৃশ্য করে দেওয়া যথেষ্ট সম্ভব। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র, যাকে লেখক পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পদার্থবিদ বলে অভিহিত করেছেন, তিনি এমন এক উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন যার দ্বারা মানুষকে অদৃশ্য করা যায়। নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে তিনি তাঁর এক পরিচিত চিকিৎসকের কাছে তার প্রক্রিয়াটির বর্ণনা দিয়েছেন।

"...কোনো বস্তু দেখা যাবে কি না তা নির্ভর করে আলোক দৃশ্যমান বস্তুর ক্রিয়ার উপর...। তোমাদের জানা আছে কোনো বস্তু হয় আলোক শোষণ করে, কিংবা তা প্রতিফলিত করে বা প্রতিসরিত করে বা এই সবগুলোই করে। যদি বস্তুটি আলোকের প্রতিফলন বা প্রতিসরণ না করে বা আলোক শোষণ না করে, বস্তুটি দৃশ্যমান হবে না। উদাহরণ স্বরূপ, তোমরা অনেক সময় অস্বচ্ছ লাল বাক্স দেখ, এর কারণ লাল বাক্সটি কিছু আলো শুষে নেয়, অবশিষ্ট আলোক প্রতিফলিত করে, আলোকের সমস্ত লাল অংশ প্রতিফলিত হয়ে তোমার কাছে ফিরে আসে। আলোকের কোনো বিশেষ অংশ যদি এ শোষণ না করত, সমস্ত প্রতিফলিত করে দিত, তাহলে বাক্সটা দেখাত ঝক্‌ঝকে সাদা বাক্স। রজত শুভ্র! হীরা সাধারণত উপরিভাগ থেকে বেশি আলোক শোষণও করে না আবার বেশি বেশি আলোক প্রতিফলিতও করে না, কেবল এখানে-সেখানে যেখানে তলগুলো অনুকূল সেই সব স্থানে আলোক প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত হয়, ফলে তোমরা ঝকমকে আলোকের প্রতিফলন ও ঈষৎ অস্বচ্ছতার উজ্জ্বল মূর্তি পাও। যেন আলোকের এক ধরনের কঙ্কাল। কাচের টুকরো ঠিক অতখানি উজ্জ্বল হবে না, হীরার মত অত স্পষ্ট দৃশ্যমানও হবে না, কারণ কাচে আলোকের কম প্রতিফলন ও প্রতিসরণ ঘটবে।...তুমি যদি কাচের একটা পাত জলে ডোবাও, কিংবা আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য, যদি জলের চেয়েও ঘনতর তরল পদার্থে ডোবাও, তাহলে কাচের পাতটি সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যাবে। এর কারণ জল থেকে কাচে যে আলোক পৌঁছায় তা কেবল সামান্যই প্রতিসরিত বা প্রতিফলিত হবে বা কোনো প্রকারে প্রভাবিত হবে। কয়লার পাতলা ধোঁয়া বা বাতাসের হাইড্রোজেনের মতই এটা প্রায় অদৃশ্য থেকে যাবে। এবং প্রায় একই কারণে!

চিত্র 109



অদৃশ্য কাচের দণ্ড।

" 'হ্যাঁ, কেম্প বলল। 'ওটা তো সহজ ব্যাপার। আজকালকার যে কোনো স্কুলের ছেলেও এ সব জানে।'

" 'এবং আর একটা বিষয়ও যে কোনো স্কুলের ছেলে জানে। কেম্প, যদি একটা কাচের পাত ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলা হয়, ওগুলো যখন বাতাসে থাকে অনেক বেশি দৃশ্যমান হয়; তারপর এটা অস্বচ্ছ সাদা চূর্ণ পদার্থে পরিণত হয়। এর কারণ চূর্ণ করার ফলে প্রতিফলন ও প্রতিসরণের তল বৃদ্ধি

পায়। কাচের পাতে দুটো মাত্র তল ছিল, চূর্ণ হবার পর আলোক প্রতি কাচের দানার মধ্য দিয়ে যাবার সময় প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত হয়, এবং আলোকের অতি অল্পই কাচের চূর্ণের ভেতর দিয়ে যায়। কিন্তু এই সাদা চূর্ণ কাচ জলে রাখলে তা তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়। চূর্ণ কাচ এবং জলের প্রতিসরাঙ্ক প্রায় সমান, অর্থাৎ একটির থেকে অপরটিতে যাবার সময় আলোকের খুব অল্পই প্রতিফলণ বা প্রতিসরণ ঘটে।

" 'প্রায় সমপ্রতিসরাঙ্ক বিশিষ্ট কোনো তরল পদার্থে রাখলে কাচ অদৃশ্য হয়। একটা স্বচ্ছ পদার্থ অদৃশ্য হয়ে যায় যখন তাকে প্রায় সমান কোনো প্রতিসরাঙ্কের মাধ্যমে রাখা হয়। একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে যে, কাচের চূর্ণ বাতাসে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে, যদি ওর প্রতিসরাঙ্ক বাতাসের প্রতিসরাঙ্কের সমান করা হয়। কারণ তখন কাচ থেকে বাতাসে যাবার সময় আলোকের কোনো প্রতিসরণ বা প্রতিফলন ঘটবে না।'

" 'ঠিকই তো', কেম্প বলল। 'কিন্তু মানুষ তো আর চূর্ণ কাচ নয়।'

" 'না', গ্রিফিন বলল। 'সে অনেক বেশি স্বচ্ছ।'

" 'কি বাজে বকছ' !

" 'এটা জনৈক ডাক্তারের কাছ থেকে জানা গেছে। একজন সেটা ভুলে যায় কি করে! তুমি কি এই দশ বছরে পদার্থবিদ্যা সব ভুলে গেলে না কি? সব স্বচ্ছ পদার্থের কথা একবার ভাবো তো, যাদের আপাতদৃষ্টিতে সে রকম মনে হয় না! উদাহরণত, কাগজ স্বচ্ছ তন্তু দিয়ে তৈরী, কিন্তু চূর্ণ কাচ যে কারণে সাদা এবং অস্বচ্ছ, কাগজও সেই একই কারণেই সাদা ও অস্বচ্ছ। কাগজটা তৈলাক্ত

---

* সম্পূর্ণ স্বচ্ছ কোন বস্তুকে আমরা একেবারে অদৃশ্য করে তুলতে পারি যদি আমরা এর চারিধারে সব দিক থেকে এমন দেওয়াল দিয়ে ঘিরে রাখি যা প্রকৃতপক্ষে সুষমভাবে আলোকের বিচ্ছুরণ ঘটাবে। ক্ষুদ্র কোন পার্শ্বছিদ্র দিয়ে বস্তুটির সকল বিন্দু থেকে একই রকম আলোক আমাদের চোখে এসে পৌছবে এবং যেহেতু এর উপস্থিতি অস্বীকার করার মত কোনো ঝকমকে আলো বা ছায়া থাকবে না, মনে হবে বস্তুটির কোনো অস্তিত্ব নেই। এইভাবে তোমরা এটা করতে পার: অর্ধ মিটার ব্যাসের সাদা কার্ডবোডের একটা ফ্যানেল তৈরী কর এবং 109 চিত্রে যেমন দেখানো হয়েছে, ওটাকে 25 W বাল্বের থেকে কিছু দূরে রাখ। তারপর নিচে থেকে ফানেলের সরু মুখ দিয়ে একেবারে উলম্বভাবে একটা কাচের দণ্ড প্রবেশ করাও একেবারে খাড়াভাবে দণ্ডটা প্রবেশ করানো দরকার, কারণ এই উলম্ব অবস্থা থেকে সামান্যতম বিচ্যুতি দণ্ডটিকে কালো সরু ছায়ারূপে প্রতীয়মান করাবে অথবা ছায়াচ্ছন্ন আলোকের কিরণরূপে প্রতীয়মান করাবে, যার রূপান্তর ঘটবে যেইমাত্র তুমি দণ্ডটি একটু ঘোরাবে। বার বার পরীক্ষার সাহায্যে আলোকটি দণ্ডের উপর সুষম ভাবে ফেল। তখন 1 সে.মি ব্যাসের চেয়ে বেশি নয় এমন পার্শ্বছিদ্র দিয়ে দেখলে, দণ্ডটি অদৃশ্য মনে হবে। কাচের বস্তুটি সম্পূর্ণ অদৃশ্য মনে হবে, যদিও এর প্রতিসৃতি (Refractivity) বাতাসের প্রতিসৃতি থেকে অনেক পৃথক। পল কাটা কাচকে অদৃশ্য করার আর একটা উপায় হল ওটাকে উজ্জ্বল রঙের লেপন দেওয়া কোনো বাক্সে রাখা।

কর। তৈলাক্ত কাগজের কণাগুলোর মধ্যেকার ফাঁক-ফোকরগুলো তেলে পূর্ণ কর, যাতে কাগজের উপরিতল ছাড়া প্রতিফলন বা প্রতিসরণ ঘটে না, এবং কাগজ কাচের মতই স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। কেম্প—শুধু কি কাগজ, তুলার তন্তু, লিনেন তন্তু, পশম তন্তু, কাঠের তন্তু এবং হাড়, মাংস, চুল, নখ এবং স্নায়ু, প্রকৃতপক্ষে মানুষের সমস্ত কাঠামো, কেবল রক্তের লাল ও চুলের ঘন কালো রঙ ছাড়া, স্বচ্ছ, বর্ণহীন কোষরাজি দ্বারা তৈরী—সুতরাং আমরা সহজেই একে অপরের দৃশ্যমান হই…"।

এই বিষয়টি কেশহীন অ্যালবিনো জন্তুর (যাদের কোষরাজি সম্পূর্ণ বর্ণহীন) কোষে প্রভূত স্বচ্ছতা আরও বেশি নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে। জনৈক প্রাণিবিদ ডেট্স্কোয়ে সেলোর কাছে ১৯০৪ সালের গ্রীষ্মকালে একটা অ্যালবিনো ব্যাঙ দৈবক্রমে তুলে পরীক্ষা করে নিম্নলিখিত বর্ণনা দেন ঃ

"পাতলা ত্বক এবং পেশীর কোষরাজি খুব স্বচ্ছ এবং কেউ ইচ্ছে করলে, কঙ্কাল ও আন্তর্যন্ত্র, এর মধ্য দিয়ে দেখতে পারে। উদরের মধ্য দিয়ে বিশেষ করে হৃদযন্ত্রের পেশীর কুঞ্চন এবং অন্ত্রের নড়াচড়া ভালোভাবে দেখা যায়।"

ওয়েলস্-এর নায়ক কেমন করে মানবযন্ত্রের কোষরাজির, এমন কি এর রঞ্জক (Pigment) এর স্বচ্ছতা আনা যায় তা আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি তাঁর আবিষ্কারটি নিজের দেহের উপর প্রয়োগ করে সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হওয়ার বিস্ময়কর ফল পান। এবার দেখা যাক অদৃশ্য মানুষটির ভাগ্যে এরপর কি ঘটেছিল।

অদৃশ্যতার বল

অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও যুক্তির সাহায্যে ওয়েল্স্ দেখান যে, একজন অদৃশ্য মানুষ এইভাবে অসীম শক্তির অধিকারী হন। সে অগোচরে সকল স্থানে প্রবেশ করতে পারে এবং বিনা শাস্তিতে সকল কিছু চুরি করতে পারে। প্রতারণাপূর্ণ হলেও অদৃশ্যতার শক্তিকে ধন্যবাদ, তিনি বেশ সাফল্যের সঙ্গে সশস্ত্র জনতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারেন। দৃশ্যমান সকলকে জোরে প্রহার করার ভয় দেখিয়ে অদৃশ্য মানুষ সমস্ত শহরের লোককে পদানত করতে পেরেছিল। নিজে অদৃশ্য ও অপ্রতিহত থাকায়, অদৃশ্য মানুষ সকলকে, তাদের সকল প্রকার সাবধানতা অবলম্বন সত্ত্বেও পরাজিত করতে পারে। অদৃশ্য মানুষ এইভাবে তার নিজের শহরের ভীত মানুষদের সামনে নিম্নলিখিত আইন প্রণয়ন করতে পারে ঃ

"পোর্ট বারডোক আর এখন রাণীর অধীনে নেই, পুলিশের কর্নেলকে ও অন্যান্য সকলকে জানিয়ে দাও; ওটা এখন আমার অধীনে। নতুন যুগের এক বছরের এটা একটা দিন—অদৃশ্য মানুষের যুগ। আমি প্রথম অদৃশ্য মানুষ। শুরুতে শাসন খুব সহজ সরল প্রকৃতিরই হবে। প্রথম দিনে, উদাহরণ

হিসেবে, কেম্প নামক মানুষটির প্রাণদণ্ড হবে। আজ তার মৃত্যু শুরু হচ্ছে। সে ঘর-বন্দী হয়ে থাকতে পারে, নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারে, নিজের চারিদিকে প্রহরী নিযুক্ত করতে পারে, অস্ত্র ধারণ করতে পারে—কিন্তু মৃত্যু, অদৃশ্য মৃত্যু, আসছে। সে সাবধান হোক—এটা আমাদের লোকজনের মনেও দাগ কাটবে···মৃত্যু আরম্ভ হচ্ছে। আমার জনগণ, তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করো না, তাহলে মৃত্যু তোমাদের কপালেও নাচছে।"

শুরুতে অদৃশ্য মানুষই জয়লাভ করল। কেবলমাত্র অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত শহরের লোক তাদের অদৃশ্য শত্রুর হাত থেকে উদ্ধার পেল, যে তাদের সর্বময় কর্তা হবার স্বপ্ন দেখেছিল।

স্বচ্ছতার প্রস্তুতি

কল্পবিজ্ঞানের এই কাহিনী যে জড়-বিজ্ঞান ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে তা কি ঠিক? প্রশ্নাতীতভাবেই সম্মত। স্বচ্ছ কোনো মাধ্যমে প্রতিটি স্বচ্ছ বস্তুই অদৃশ্য হবে যদি তাদের প্রতিসরাঙ্কের অন্তর 0·05 অপেক্ষা কম হয়। এইচ. জি. ওয়েল্‌স্‌-এর 'দি ইনভিসিবল্‌ ম্যান' প্রকাশিত হবার দশ বছর পরে জার্মান শারীরবিদ অধ্যাপক ডাব্লু. স্পালটেহোল্‌জ লেখকের ধারণাটাকে বাস্তবে রূপ দেন। অবশ্য তিনি জীবন্ত প্রাণীর তা করেন নি, করেছেন মৃত কতকগুলো প্রাণীর উপর। এই রকম যন্ত্রের স্বচ্ছ প্রস্তুতি, এমন কি সম্পূর্ণ জন্তুর দেহের স্বচ্ছ-করণ আজ বহু যাদুঘরে দেখা যাবে। অধ্যাপক স্পালটেহোল্‌জের সৃষ্ট 1911 খ্রীষ্টাব্দের এই স্বচ্ছ-করণ পদ্ধতি সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

পরীক্ষা করে নেওয়ার পর—ধুয়ে, ব্লিচিং করে—প্রস্তুত নমুনাটিকে মিথাইল স্যালিসাইলেট দ্রবণে শোষণ করানো হয়। মিথাইল স্যালিসাইলেট উচ্চ প্রতিসরাঙ্ক সম্পন্ন বর্ণহীন তরল। ইঁদুর, মাছ প্রভৃতির নমুনা এবং মানব দেহের নানা যন্ত্র এইভাবে প্রস্তুত করে একই তরলে জারের মধ্যে রাখা হয়। অবশ্য, পূর্ণ স্বচ্ছ করার ইচ্ছা করা হয় না, কারণ তাতে নমুনাগুলো একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং ফলে শারীরবিদের কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়বে। আমরা অবশ্য প্রয়োজনবোধে নমুনাগুলোকে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ করেও তুলতে পারি।

স্বভাবতই এটা ওয়েল্‌স্‌-এর সজীব মানুষ এত স্বচ্ছ যে, একেবারে অদৃশ্য,—এ স্বপ্ন থেকে বহু দূরে। প্রথমত, এর কারণ, তা করতে হলে, মানুষের দেহের যন্ত্রগুলোর কাজকর্ম অক্ষুণ্ণ রেখেই জীবন্ত কোষগুলোকে এই স্বচ্ছ তরলে ডোবানোর প্রক্রিয়া আয়ত্ত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, অধ্যাপক স্পাল্‌টেহোলজের আয়োজনটা স্বচ্ছ কিন্তু অদৃশ্য নয়। তারা অদৃশ্য হয় তখনই যখন অনুরূপ প্রতিসৃতির তরলে নিমজ্জিত করা হয়। বাতাসে তারা অদৃশ্য হবে যদি তাদের

প্রতিসরাঙ্ক বাতাসের প্রতিসরাঙ্কের সমান হয়—কিন্তু এখন পর্যন্ত তা আমরা আয়ত্ত করতে পারি নি।

কল্পনা করা যাক যে, সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সেই প্রক্রিয়া একদিন আয়ত্ত করবে এবং ব্রিটিশ ঔপন্যাসিকের স্বপ্নকে অনুধাবন করতে পারবে। এইচ. জি. ওয়েল্‌সের চিন্তাশক্তি ছিল এত সুবিন্যস্ত যে তাঁকে এবং তাঁর ধারণা—অদৃশ্য মানুষ প্রকৃতপক্ষে সবচেয়ে শক্তিধর মানুষ হবে—বিশ্বাস না করে উপায় নেই। কিন্তু মোটেই তা নয়। 'দি ইনভিজিবল্ ম্যান'-এর চতুর লেখক একটা বিষয় এড়িয়ে গেছেন।

অদৃশ্য মানুষ কি দেখতে পাই ?

ওয়েল্‌স্-এর যাদু-কলমের সম্মোহনী বর্ণনাগুলো আমাদের কখনই ধরে রাখতে পারত না, যদি তিনি একবার লেখার আগে নিজেকে এ প্রশ্নটা করতেন ঃ অদৃশ্য মানুষ কি নিজে দেখতে পায় ? এটাই তাঁর সমস্ত পরিকল্পনাটিকে একেবারে উল্টে দেয়, কারণ অদৃশ্য মানুষ তো অবশ্যই…অন্ধ।

অদৃশ্য মানুষকে দেখা যাবে না কেন ? কারণ, তার শরীরের সমস্ত অংশ, এমন কি চোখ পর্যন্ত, স্বচ্ছ করে তোলা হয়েছে এবং যার প্রতিসরাঙ্ক বাতাসের প্রতিসরাঙ্কের সমান করা হয়েছে।

চক্ষুর কার্য একটু স্মরণ করা যাক। এর স্ফটিকাকার লেন্স, রস ও অন্যান্য অংশ আলোকের প্রতিসরণ ঘটায় যাতে পারিপার্শ্বিক বস্তুর ছবি অক্ষিপটে ফুটে ওঠে। কিন্তু চোখের ও বাতাসের প্রতিসৃতি যখন সমান হয়, প্রতিসরণের মূল কারণই তখন অপসৃত হয়। একই মাধ্যম থেকে সমান প্রতিসৃতির অপর এক মাধ্যমে যখন আলোক রশ্মি যায়, তখন তার দিকের পরিবর্তন ঘটে না এবং ফলে এর রশ্মিরাজি এক বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হতে পারে না। আলোক অদৃশ্য মানুষের চোখের মধ্য দিয়ে চলে যাবে বিনা বাধায়। কোনো রঞ্জক না থাকায়, এর রশ্মিরাজি মন্দীভূত বা প্রতিসরিত কিছুই হবে না। জন্তু-জানোয়ারদের মধ্যে সাড়া জাগানোর জন্য আলোকের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ নয় এমন কিছু পরিবর্তন আনা প্রয়োজন হয় ; অথবা, অন্য কথায়, চোখে আলোক রশ্মিকে কিছু কাজ করতে হয়। ফলে আলোক রশ্মির কিছু অংশকে গতি কমাতে হবে। সম্পূর্ণ স্বচ্ছ চোখ রশ্মিকে প্রতিহত করতে পারবে না, তা না হলে এটা স্বচ্ছ হতে পারবে না। চক্ষুষ্মান সকল প্রাণী আত্মরক্ষার জন্য যে স্বচ্ছতার মুখোশ নেয় তাদেরও চোখ আছে যা সম্পূর্ণ স্বচ্ছ নয়, অবশ্য আদৌ যদি তাদের চোখ থেকে থাকে। "ঠিক উপরিভাগের নিচে", বিখ্যাত সমুদ্র পর্যবেক্ষক মুরে লিখছেন, "অধিকাংশ জন্তুরই দেহ স্বচ্ছ ও বর্ণহীন গুণ-টানা জাল থেকে তুললে তাদের পৃথক করা

যায় একমাত্র তাদের ছোট কালো চোখ দিয়ে, তাদের রক্তে হিমোগ্লোবিন না থাকার এবং তাদের সমস্ত দেহ সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হওয়ায় এগুলোর কোনো মানসিক প্রতিবিম্ব তৈরী হয় না।"

সংক্ষেপে, অদৃশ্য মানুষ কিছুই দেখে না। তার সমস্ত সুযোগ-সুবিধা সত্ত্বেও সে কোনো সুফল ভোগ করতে পারবে না। এই ভীষণ শক্তির দাবিদার অন্ধকারেই হাতড়ে মরবে ভিক্ষা চেয়ে চেয়ে, কিন্তু হায়! সে ভিক্ষা তাকে কেউই দিতে পারবে না, যেহেতু প্রাপক অদৃশ্য থেকে যাবে। সমস্ত জীবজগতে সবচেয়ে বেশি শক্তিধর হওয়ার বদলে আমরা দেখব আমাদের সামনে এক অসহায়, পঙ্গুকে দুঃখময় অস্তিত্বে যার জীবন অতিবাহিত হচ্ছে। (এটা খুবই স্বাভাবিক যে, ওয়েল্‌স্ ইচ্ছে করেই এ বিষয়টা এড়িয়ে গেছেন। তার কল্পবিজ্ঞানমূলক উপন্যাসে, তিনি প্রায়ই প্রভূত বাস্তবসম্মত বর্ণনার মাধ্যমে মূলে ত্রুটিটিকে অস্পষ্ট করে রাখেন। তিনি নিজেই তাঁর উপন্যাসের আমেরিকার এক সংস্করণে সরাসরি স্বীকার করেছেন যে, যেইমাত্র এই কৌশলটা খাটানো যাবে, আর সব কিছুই সাধারণ এবং প্রাণবন্ত হয়ে উঠল বলে মনে হবে। তখন, তিনি লিখলেন, পাঠক যুক্তি-শক্তির নয়, সৃষ্ট কল্পনারই খুঁট ধরে থাকবে।)

অন্য কথায় আমরা যদি অদৃশ্য হওয়ার টুপিটি চাই, ওয়েল্‌স্‌কে অনুকরণ করতে গেলে আমরা ব্যর্থ হব। আমাদের চেষ্টা ফলপ্রসূ হলেও আমাদের কাছে তা দুঃখই বহন করে আনবে।

রক্ষণাত্মক রঙ

অদৃশ্যতার টুপি লাভ করার আর একটা উপায় আছে। সেটা হল বস্তুটিকে এমনভাবে রঙ করতে হবে যাতে তারা দৃষ্টিগ্রাহ্য না হয়। প্রকৃতির রাজ্যে এমন অসংখ্য উদাহরণ আছে। এই সহজ উপায়ের সাহায্যে প্রকৃতি প্রাণীকে তাদের শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করে এবং তাদের কঠিন জীবন সংগ্রামে সাহায্য করে।

সেনাবিভাগ যাকে ছদ্মবেশে শত্রুকে প্রতারণা করার কৌশল (Camouflage) বলে, ডারউইনের সময় থেকে প্রাণিবিদেরা তাকেই বলে আসছেন পরিহাস অর্থে অনুকরণ (Mimicry)। আমরা নিত্য এরকম হাজার হাজার ঘটনা চোখের সামনে দেখছি যা ফাউনা দিয়েছেন। মরুভূমির অধিকাংশ প্রাণীরই বালির মত হলুদ বর্ণের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়—সিংহ, পাখী, টিকটিকি, গিরগিটি, মাকড়সা বা পোকার। মরু অঞ্চলের অধিবাসীদের, অপর পক্ষে, সে ভাল্লুকই হোক আর পাখীই হোক, রঙ সাদা, নিজেদের বরফের পটভূমির সঙ্গে মিলিয়ে রাখার জন্য। প্রজাপতি, শুঁয়োপোকা নিখুঁতভাবে গাছের ছালের রঙের সঙ্গে নিজেদের মিশিয়ে রাখে—যেন শিকারের মুখোশ।

প্রত্যেক পোকা-মাকড় সংগ্রহকারী জানে—স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক ছদ্মবেশের জন্য এদের সংগ্রহ করা কত কঠিন। সবুজ পশ্চাদভূমি বা পটভূমির মধ্যে তুমি চেষ্টা করেও সহজে একটা সবুজ ফড়িংকে ধরতে পারবে না, যদিও ফড়িংটা হয়তো তোমার পায়ের কাছেই ঘুর ঘুর করছে।

জলের প্রাণীদের বেলায়ও এ কথা সত্য। বাদামী রঙের সামুদ্রিক জলজ উদ্ভিদের মধ্যে বসবাসকারী সামুদ্রিক জন্তুদের সকলেরই আত্মরক্ষার জন্য বাদামী রঙ। লাল সামুদ্রিক উদ্ভিদের মধ্যে, অন্যতম আত্মরক্ষার রঙটি লাল। মাছের রূপালী আঁশ ওদের উপরের পাখী বা সমুদ্রের তলদেশের শিকারী প্রাণীদের হাত থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। 'পূর্ণ প্রতিফলন'-এর জন্য জলের উপর থেকে এবং জলের নিচে থেকে তো বটেই, জলের উপরিভাগ আয়নার মত ঝকঝকে এবং মাছের রূপালী আঁশ এই ঝকঝকে ধাতব পটভূমির সঙ্গে ভালোভাবে মিশে যায়। আবার জেলিফিস এবং অন্যান্য স্বচ্ছ সামুদ্রিক প্রাণী যেমন, পোকা, মাছ বা শামুক শ্রেণীর প্রাণী আত্মরক্ষার রঙ হিসেবে বর্ণহীন-তাকেই বেছে নিয়েছে, যে বর্ণহীনতা পরিপার্শ্বস্থ বর্ণহীন এবং স্বচ্ছ জগতে তাদের অদৃশ্য করে তোলে।

মানুষ আত্মগোপন করার জন্য যে সমস্ত কৌশল এ পর্যন্ত আয়ত্ত করেছে, প্রকৃতির দেওয়া কৌশল তার চেয়ে অনেক উন্নততর। প্রকৃতির পরিবেশের রঙের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রাণী নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য রঙ পরিবর্তন করে। রূপালী-শুভ্র বর্ণের বেজি যারা শুভ্র বরফের অন্তরালে আত্ম-গোপন করে থাকে, তারা শিকারী প্রাণীর হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারত না যদি না বরফগলার সঙ্গে সঙ্গে রঙ পরিবর্তন করে নিতে পারত। প্রতি বসন্তে এই সাদা জন্তুরা বরফহীন পটভূমির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়ানোর জন্য ঝকঝকে বাদামী রঙ ধারণ করে; আবার শীতের আগমনে সাদা হয়ে যায়।

শত্রুকে প্রতারণা করার ছদ্মবেশ (Camouflage)

প্রকৃতির উদ্ভাবনী কলাকৌশল মানুষকে ক্যামোফ্লেজ-এর শিল্প সম্বন্ধে দু-একটি শিক্ষা দিয়েছে। শিক্ষা দিয়েছে শত্রুর চোখে ধুলো দেবার জন্য কি রকম ভাবে রঙের মিশ্রণ ঘটাতে হয় বা প্রতারণামূলক রঙ ব্যবহার করতে হয়। প্রাচীন কালের সাজসজ্জা যুদ্ধের দৃশ্যাবলীকে বর্ণাঢ্য করে তুলত। আজ তাকে প্রত্যাখ্যান করে রূপান্তরিত করা হয়েছে আমাদের পরিচিত খাকী পোশাকে। যুদ্ধ জাহাজের ধূসর বর্ণও সাগরে রক্ষণাত্মক কৌশল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, যা জাহাজকে সাগরে চোখের আড়ালে থাকতে সাহায্য করে।

সেনাবিভাগে শত্রুপক্ষকে প্রতারণা করার জন্য গাছের শাখা, নানা রঙ, ধোঁয়া এবং অন্যান্য কৌশল ব্যবহার করা হয়। এই সব প্রক্রিয়ার সাহায্যে বন্দুক,

দুর্গ, ট্যাঙ্ক এবং জাহাজ লুকিয়ে রাখা হয়। ঘাসের চাদরের মধ্যে বিশেষ ধরনের জালের মধ্যে তাঁবুগুলোকে আড়াল করে রাখা হয়। রণবাহিনী ধারণ করে বিশেষ ধরনের মুখোশ।

যুদ্ধের বিমানগুলিরও অনুরূপভাবে নানা বর্ণের প্রতারণামূলক ছদ্মবেশ দেওয়া হয়। মাটির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য এবং উপরের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিকে আড়াল করার জন্য উপরটা বাদামী, ঘন সবুজ বা বেগুনী বর্ণের করা হয়। বিমানের গহ্বর বা পেটের অংশগুলো করা হয় ফিকে নীল, সাদা বা গোলাপী বর্ণের যাতে মাথার উপরের আকাশের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায় এবং কার্যত মাটির দর্শকদের কাছে অদৃশ্য থাকে। 750 মিটার ভূমি থেকে উর্ধ্বে এইভাবে ছদ্মবেশধারী প্রায় দেখা যায় না আর 3,000 মিটার উর্ধ্বে তারা প্রায় অদৃশ্যই হয়ে পড়ে। রাত্রের বোমারু বিমানদের কালো রঙ করে দেওয়া হয়।

যে কোনো অবস্থায় একটি আদর্শ রক্ষণাত্মক ব্যবস্থা হল দর্পণ-সদৃশ তলের উদ্ভাবন যা পরিবেশকে প্রতিফলিত করতে পারে। তাহলে বস্তুটি নিজে আড়াল হয়ে যায় এবং দূরে থেকে একে সনাক্ত করা মুশকিল হয়ে পড়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানরা তাদের জেপলিন বিমানগুলোকে শত্রুপক্ষের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রাখার জন্য এই কৌশল গ্রহণ করেছিল। তাদের ঝকঝকে অ্যালুমিনিয়াম মোড়কে ঢাকা দেহগুলো আকাশ ও মেঘরাজি প্রতিফলিত করে, ফলে যন্ত্রের শব্দ বেইমানি না করলে তাদের সনাক্ত করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

সুতরাং 'অদৃশ্যতা'-র রূপকথার উপকথা প্রকৃতির বুকে এবং যুদ্ধবিদ্যায় বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

জলনিমগ্ন চোখ

মনে করা যাক, জলে ডুবে উপরের দিকে চোখ খুলে তুমি যতক্ষণ খুশি থাকতে পার। তাহলে তুমি কি কিছু দেখতে পাবে? মনে করতে পার, জল যেহেতু স্বচ্ছ, বাতাসে তুমি যেমন দেখতে পাও, জলেও তেমন দেখার কোনো অসুবিধেই হবে না।

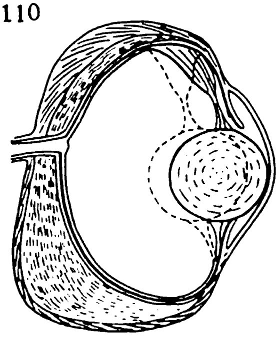
কিন্তু 'অদৃশ্য মানুষের' অন্ধতার কথা একবার স্মরণ কর। তুমি দেখতে পাবে না কারণ, অদৃশ্য মানুষটি বাতাসে যে কারণে দেখতে পায় নি, তুমিও প্রায় সেই একই কারণেই দেখতে পাবে না। সে দেখতে পায় নি কারণ, বাতাসের ও তার চোখের প্রতিসরাঙ্ক এক ছিল। বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য কয়েকটি গাণিতিক অঙ্ক দেওয়া যাক। জলের প্রতিসরাঙ্ক 1·34 আর চোখের স্বচ্ছ বিভিন্ন মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক হল: 1·34 চোখের ভিট্রিয়াস রস ও কর্ণিয়ার ; 1·43 স্ফটিকাকার লেন্সের এবং 1·34 চোখের জলীয় রসের। তাহলে দেখতে পাচ্ছ লেন্সের

প্রতিসৃতি জলের প্রতিসৃতির থেকে মাত্র একের-দশ গুণ বড়। আর চোখের অন্যান্য উপাদানের প্রতিসরাঙ্কগুলো জলের প্রতিসরাঙ্কের সমান। সেই কারণে জলের মধ্যে আলোক রশ্মি অক্ষিপটের (রেটিনার) অনেক পশ্চাতে প্রতিফলিত হয়। ফলে অক্ষিপটের প্রতিবিম্ব বা ছায়া হয় অত্যন্ত অস্পষ্ট। কেবল স্বল্প দৃষ্টি সম্পন্ন (সর্ট সাইটেড) মানুষই জলে প্রায় সাধারণভাবে দেখতে পায়।

জলের তলা থেকে বস্তুরাজি কি রকম দেখাবে তার স্পষ্ট ছবি যদি পেতে চাও তাহলে উভাবতল (Biconcave) লেন্সের চশমা ব্যবহার কর। বিশদ আকারে আলোকের বিচ্ছুরণ ঘটায় বলে এই ধরনের লেন্স সেই সকল রশ্মি-রাজিকেই ফোকাস করবে যা চোখ অক্ষিপটের পরপারে প্রতিসরিত করে এবং এইভাবে অত্যন্ত ঝাপসা প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে।

কিন্তু উচ্চ প্রতিসরাঙ্ক বিশিষ্ট চশমা কি জলে-নিমগ্ন-মানুষ ব্যবহার করতে পারে না। সাধারণ লেন্স বিশেষ কাজে আসবে না, কারণ সাধারণ কাচের প্রতিসরাঙ্ক 1·5—জলের প্রতিসরাঙ্ক (1·34) থেকে মাত্র একটু বেশি এবং জলের মধ্যে তাদের প্রতিসরণের ক্ষমতা অত্যন্ত কম। এর জন্য অত্যন্ত উচ্চ প্রতিসরাঙ্ক বিশিষ্ট বিশেষ কাচ প্রয়োজন। (তথাকথিত ভারী ফ্লিন্ট কাচের প্রতিসরাঙ্ক প্রায় 2)। এই ধরনের চশমা পরে জলের মধ্যে তুমি মোটামুটি ভালোভাবেই দেখতে পারবে (ডুবুরীদের জন্য বিশেষ গগলস্ এই প্রসঙ্গে আরও পড়)।

চিত্র 110



মাছের চোখের প্রস্থচ্ছেদ। স্ফটিকের মত লেন্স গোলাকার এবং উপযোজন বা দেখার সময় এর আকারের পরিবর্তন হয় না। এর পরিবর্তে, এর অবস্থান বদলায় যেমন বিন্দু দিয়ে প্রদর্শিত রেখা দ্বারা সূচিত হয়েছে।

এখন তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, মাছের চোখের স্ফটিকাকার লেন্স কেন পরিপূর্ণ অবতল (Concave) আকারের। প্রকৃতপক্ষে ওটা গোলকাকারের (Spherical) জীবজন্তুদের চোখের মধ্যে মাছের চোখের প্রতিসরাঙ্ক সবচেয়ে

বেশি। এমনটি না হলে, উচ্চ প্রতিসারক স্বচ্ছ পরিবেশের অধিবাসী হিসাবে মাছের চোখের প্রয়োজনই থাকত না।

ডুবুরীরা কিভাবে দেখে

অনেকে হয়তো প্রশ্ন করে বসবে, জলে নিমগ্ন হবার সাজসজ্জা পরিহিত ডুবুরীরা জলের নিচে কিভাবে দেখে? আমাদের চোখ তো জলে প্রায় কিছুই প্রতিসৃত করে না। প্রকৃতপক্ষে ডুবুরীর মাথার হেলমেট সব সময় উত্তাল নয়, চ্যাপ্টা কাচ দ্বারা সজ্জিত থাকে। তাহলে জুল ভার্নের 'নটিলাস'-এর পরিব্রাজকেরা পোর্টহোল দিয়ে কিভাবে জলের তলার দৃশ্যাবলীর প্রশংসা করলেন?

উত্তরটা খুবই সহজ। ডাইভিং স্যুট এবং হেলমেট ছাড়া আমরা যদি জলের তলায় ডুবি, জল সরাসরি আমাদের চোখের সংস্পর্শে আসে। ডুবুরির হেলমেট থাকলে (অথবা নটিলাসের মধ্যে) বাতাসের (এবং কাচের) একটা পর্দা দ্বারা চোখ জল থেকে পৃথক থাকে যা বাস্তবিক পক্ষে বস্তুর রূপান্তর ঘটায়। জলে প্রবেশ করে এবং কাচের মধ্য দিয়ে যাবার সময়, আলোক রশ্মি চোখে প্রবেশ করার আগে প্রথমে বাতাসের মধ্য দিয়ে যায়। আলোক-বিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জলের মধ্য থেকে যে আলোক রশ্মিরাজি কোনাকুনিভাবে চ্যাপ্টা সমান্তরাল কাচে এসে পড়ে, তা কাচের ভেতর দিয়ে যাবার সময় কোনো দিক পরিবর্তন করে না। কিন্তু যেই মাত্র বাতাস থেকে চোখে এসে পড়ে, তৎক্ষণাৎ সেই আলোক রশ্মি স্বাভাবিকভাবে প্রতিহত হয়। এক্ষেত্রে চোখ সাধারণ অবস্থায় যেমন কাজ করে তেমনি কাজ করে। এর সুন্দর একটা দৃষ্টান্ত হল মাছের পাত্রের মাছ দেখতে আমাদের কোনো কষ্ট হয় না।

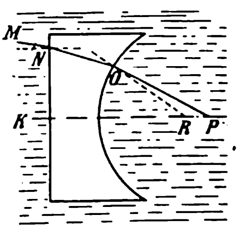
জলের নিচে লেন্স

জলের মধ্যে লেন্স ডুবিয়ে তার মধ্য দিয়ে জলে নিমজ্জিত বস্তু কখনো দেখেছ কি? খুবই বিস্ময়ের কথা, জলের মধ্যে বিবর্ধক কাচ (Magnifying glass) আদৌ বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব তৈরি করে না। যদি এই একই পরীক্ষা একটা উভাবতল (Biconcave) লেন্স নিয়ে কর, তাহলেও দেখবে এর প্রতিবিম্ব ক্ষুদ্রতর করার শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। আরও, যদি জল ভিন্ন কাচের চেয়ে বৃহত্তর প্রতিসরাঙ্ক বিশিষ্ট অন্য কোনো তরল পদার্থ ব্যবহার করা হয়, উভোত্তল (Biconvex) লেন্স বস্তুর প্রতিবিম্ব ছোট করবে, অপরপক্ষে উভাবতল (Biconcave) লেন্স বস্তুর প্রতিবিম্ব বিবর্ধিত করবে।

বিষয়টা বুঝতে হলে আলোকের প্রতিসরণের সূত্র আবার মনে করতে হবে। একটি বিবর্ধক কাচ বস্তুকে বিবর্ধিত করে দেখায়, তার কারণ পারিপার্শ্বিক

বাতাসের চেয়ে বিবর্ধক লেন্স আলোক অনেক বেশি প্রতিসৃত করে। কিন্তু, যেহেতু লেন্স ও জলের প্রতিসৃতির মধ্যে পার্থক্য খুব কম, আলোক রশ্মি, জল থেকে লেন্সে আসার সময় খুব বেশি বেঁকে যায় না। উভোত্তল হোক আর উভাবতল হোক, এই হল লেন্সের ক্ষমতার ব্যাখ্যা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, মোনোব্রোমো ন্যাপথেলিন-এর প্রতিসরাঙ্ক কাচের চেয়ে বেশি এবং সেই কারণেই এর মধ্যে উত্তল লেন্সে প্রতিবিম্ব ছোট হয়, আর অপরপক্ষে অবতল লেন্সে প্রতিবিম্ব বিবর্ধিত হয়। ফাঁপা অথবা বায়ুপূর্ণ লেন্সও জলের নিচে একই ভাবে কাজ করে। অবতল (Concave) লেন্স বিবর্ধিত করে অপরপক্ষে উত্তল (Convex) লেন্স প্রতিবিম্ব ছোট করে দেখায়। ডাইভিং গগল্স্ এই ধরনের বায়ুপূর্ণ লেন্স দিয়ে প্রস্তুত (চিত্র 111)।

চিত্র 111



ডুবুরির গগলস ফাঁপা লেন্সের, যার একদিক চ্যাপ্টা আর অপরদিক অবতল বিশিষ্ট। যখন এটা প্রতিসরিত করে আলোক রশ্মি MN, MNOP পথ অনুসরণ করে লেন্সের মধ্যে আপতন পথ থেকে বেঁকে গিয়ে এবং লেন্সের বাইরে আবার ওদিকে ঘুরে (অর্থাৎ OR পথে) বেরিয়ে আসে। এই কারণে লেন্সটি সংগ্রাহক কাচ হিসেবে কাজ করে।

অনভিজ্ঞ স্নানার্থী

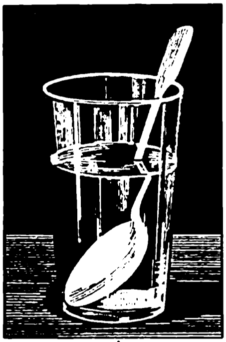
প্রতিসরণের সূত্রের একটি উল্লেখযোগ্য ফল সম্বন্ধে শুধুমাত্র অবজ্ঞার জন্য এই রকম লোক প্রায়ই ভীষণ বিপদে পড়ে। তারা জানে না যে, প্রতিসরণ জলের মধ্যেকার সকল বস্তুকেই আপাত দৃষ্টিতে তাদের প্রকৃত অবস্থান থেকে উঁচুতে তুলে ধরে। আমাদের চোখে আলোকের প্রতিসরণের ফলে পুষ্করিণী বা নদীর তলদেশ প্রায় এক-তৃতীয়াংশ উপরে উঠে আসে। অনেক সময় এই ভ্রম স্নানার্থীদের কাছে ঘোর বিপদের কারণ হয়। শিশুদের এবং খাটো মানুষদের এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকা বিশেষ প্রয়োজন, কারণ অন্যথায় গভীরতা সম্বন্ধে অজ্ঞতা সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে। আলোক-বিজ্ঞানের যে নিয়ম চায়ের গ্লাসের চামচের বিকৃত প্রতিবিম্ব উপস্থাপিত করে সেই নিয়মই পুষ্করিণীর তলদেশকে আপাত দৃষ্টিতে উপরে তুলে ধরে।

নিম্নলিখিতভাবে আলোকের প্রতিসরণের উপমা দেওয়া যায়। টেবিলে রক্ষিত একটি বাটির সামনে তোমার বন্ধুকে এমনভাবে বসাও যে, সে যেন বাটির

14-0407

তলদেশ দেখতে না পায়। বাটির মধ্যে একটা মুদ্রা রাখ, যা বাটির গা দিয়ে তার দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায়। তাকে ঝুঁকে দেখতে মানা কর এবং পাত্রে

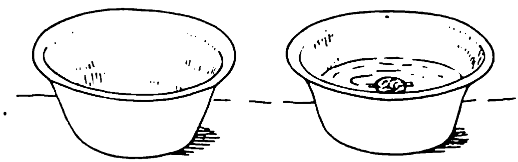
চিত্র 112



জলের মধ্যে চামচের বিকৃত প্রতিবিম্ব।

জল ঢালো। সে বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করবে যে, পাত্রের মধ্যের মুদ্রাটি উঠে এলো তার দৃষ্টির সীমানায়। এবার একটা পিচকিরি (Syringe) নিয়ে পাত্রের জল বার করে দাও, মুদ্রাটি আবার দৃষ্টির আড়ালে চলে যাবে (চিত্র 113)।

চিত্র 113



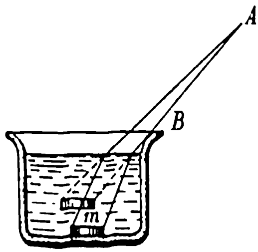
বাটির মধ্যে মুদ্রার পরীক্ষা।

নিচের 114 নং চিত্রে এটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দর্শকদের চোখে জলের উপরে A বিন্দুতে, m মুদ্রাটিকে মনে হচ্ছে উপরে রয়েছে। রশ্মিগুলি তির্যক ভাবে পড়ছে, এবং জল থেকে বাতাসের মাধ্যমের মধ্য দিয়ে চোখে এসে পড়ছে। চোখের কাছে মনে হয়, রেখাগুলি যে বরাবর গেছে সেখানে, অর্থাৎ এর প্রকৃত অবস্থানের উপরে আছে। রশ্মিগুলি যত বেঁকে আসবে, মুদ্রাটি আপাত দৃষ্টিতে ততই উপরে উঠে আসবে। এই কারণেই নৌকা থেকে পুষ্করিণীর সমতল তলদেশ নৌকার ঠিক নিচেই খুব গভীর মনে হয় এবং পুষ্করিণীর দূরবর্তী অংশ উত্থিত মনে হয় অর্থাৎ সমতলটিকে অবতল মনে হয়।

বিপরীত পক্ষে, জলের তলদেশ থেকে যদি উপরের কোনো আড়াআড়ি সেতুর দিকে চাওয়া যায়, সেতুটিকে উত্তল দেখাবে (115 নং চিত্র, পরে এই ছবি কি

ভাবে নেওয়া হল বলা যাবে)। এ ক্ষেত্রে আলোক রশ্মি কম প্রতিসৃতি সম্পন্ন বাতাস থেকে উচ্চ প্রতিসৃতি সম্পন্ন জলে গমন করে অর্থাৎ লঘুতর মাধ্যম

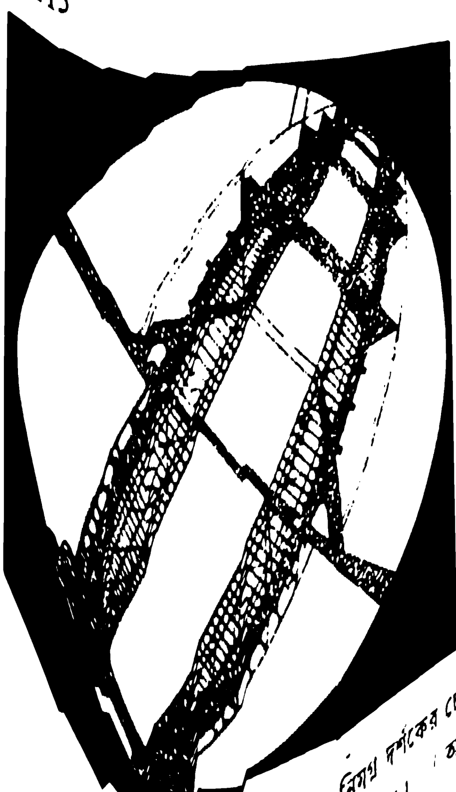
চিত্র 114



113 নং চিত্রে প্রদর্শিত পরীক্ষায় মুদ্রাটি উপরে দেখায় কেন।

থেকে ঘনতর মাধ্যমে প্রবেশ করে। সেইজন্য এক্ষেত্রে ফল হয় জল থেকে বাতাসে আলোক রশ্মি গেলে যা হয় তার বিপরীত। একই কারণে, মাছের পাত্রের মধ্য

চিত্র 115



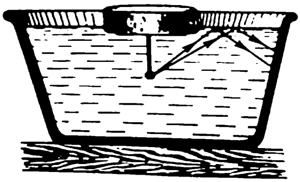
নিমগ্ন দর্শকের চোখে নদীর উপরের রেলের সেতু
উডের তোলা ছবি

থেকে মাছ সরলরেখায় দণ্ডায়মান মানুষদের দেখে বক্ররেখায় দণ্ডায়মান; বক্ররেখার স্ফীতকায় দিকটি যেন তার মুখোমুখি হয়ে আছে।

অদৃশ্য পিন

চ্যাপ্টা গোলাকার একটি কর্কে একটা আলপিন আটকাও। পিনটাকে তলার দিকে রেখে কর্কটিকে পাত্রের জলে ভাসাও। মাথাটিকে যতই বাঁকাও না কেন, পিনটি দৃষ্টিপথে আসবে না, যদিও যথেষ্ট লম্বা হওয়ায় পিনটিকে লুকিয়ে রাখা কর্কটির পক্ষে সম্ভব নয়, অবশ্য কর্কটিও যদি খুব বড় না হয়। এর কারণ কি? আলপিন থেকে আলোক রশ্মি আমাদের চোখে পেঁছচ্ছে না কেন? পদার্থবিদদের ভাষায় এর কারণ দর্শকের চোখ দুটি 'অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন' (Total internal reflection)-এর অভিজ্ঞতা লাভ করছে।

চিত্র 116

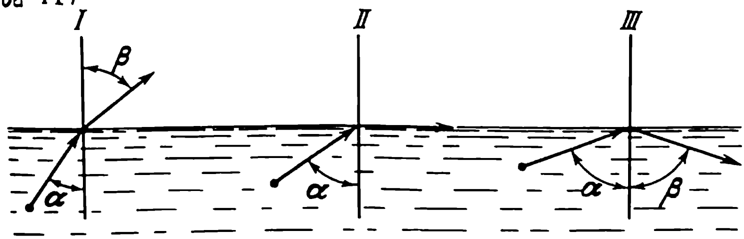


অদৃশ্য পিন।

117 নং চিত্রে দেখানো হয়েছে, আলোক রশ্মি জল থেকে বাতাসে কিভাবে যায় অথবা সাধারণভাবে উচ্চতর প্রতিসৃতির মাধ্যমে থেকে নিম্নতর প্রতিসৃতির মাধ্যমে যায় এবং কিভাবে ফিরে আসে। বাতাস থেকে জলে গমন করার সময়, আলোক রশ্মি অভিলম্বের দিকে বেঁকে যায়, অর্থাৎ প্রতিসৃতির রশ্মি অভিলম্বের দিকে সরে আসে। বাতাস থেকে জলে প্রবেশ করার সময় আলোক রশ্মি আপতন বিন্দুতে অভিলম্বের দিকে সরে আসার জন্য বেঁকে যায়। ধরা যাক, কোনো আলোক রশ্মি জল থেকে আপতন তলের সঙ্গে অভিলম্বের সঙ্গে β কোণে স্থাপিত জলতলে এসে পড়ে। তখন আলোক রশ্মি বেঁকে যাবে জলের মধ্যে অভিলম্ব বরাবর α কোণের চেয়ে, যে α কোণ β কোণ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। কিন্তু অভিলম্বের সঙ্গে প্রায় সমকোণে অবস্থিত আপতন রশ্মি জলের উপরিভাগের সমতলে যখন আসে তখন কি ঘটে? এটা সমকোণ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর কোণে জলে প্রবেশ করবে। প্রায় 48·5° কোণে। যদি এই কোণের পরিমাপ 48·5°-র বেশি হয় তাহলে এই রশ্মি জলে প্রবেশ করবে না। এর কারণ তখন উক্ত কোণ জলের সাপেক্ষে 'সংকট' (Critical) কোণে পরিণত হবে। প্রতিসরণের নিয়মের সম্পূর্ণ আশাতীত এবং অত্যন্ত বিস্ময়কর পরিণতি

সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভের জন্য এই সহজ সম্পর্কগুলো অনুধাবন করা প্রয়োজন। এইগুলি নিম্ন আলোচনা করা হল।

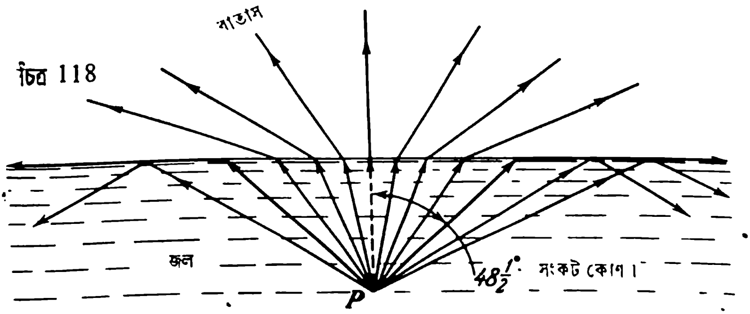
চিত্র 117



আলোকের প্রতিসরণের বিভিন্ন উদাহরণ—যখন আলোক রশ্মি জল থেকে বাতাসে প্রবেশ করে। II ক্ষেত্রে আলোক রশ্মি অভিলম্বের সঙ্গে সংকট কোণে পতিত হয় জলের পৃষ্ঠদেশের সঙ্গে অবস্থানের জন্য বেরিয়ে আসে। III ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীন পূর্ণ প্রতিফলন দেখানো হয়েছে।

আমরা এইমাত্র দেখলাম আলোক রশ্মিরাজি বিভিন্ন কোণে জলের পৃষ্ঠদেশে এসে আঘাত করার সময় জলের নিচে অনেকটা শংকুর আকারে সঙ্কুচিত হয় $48{\cdot}5^\circ + 48{\cdot}5^\circ = 97^\circ$ কোণের মধ্যে। এবার দেখা যাক, রশ্মি যখন উল্টোপথে যায়, তখন কি ঘটে—অর্থাৎ যখন জল থেকে বাতাসে প্রবেশ করে (চিত্র 118)।

চিত্র 118

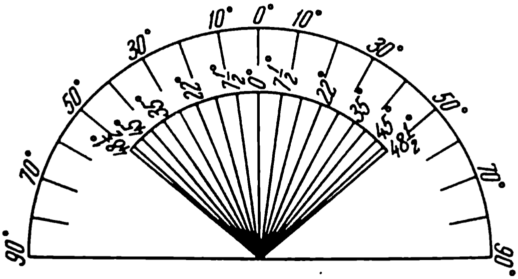


P বিন্দু থেকে আগত আলোক রশ্মি সংকট কোণ (48·5 জলের ক্ষেত্রে) অপেক্ষা অভিলম্বের সঙ্গে বৃহত্তর কোণে আপতিত হলে জল থেকে বেরিয়ে আসে না, জলের অভ্যন্তরে অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন সৃষ্টি করে।

আলোক বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে আলোকের রশ্মি একই পথ অনুসরণ করবে। সমস্ত রশ্মিগুচ্ছ উল্লিখিত 97° শংকুতে সন্নিবেশিত হয়ে জলের উপরিভাগে 180° অর্ধবৃত্তে ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন কোণে প্রবেশ করবে।

তাহলে উপরিউক্ত 97° শংকু পথের বাইরে জলের তলার রশ্মি কোথায় যাবে ? ঐ রশ্মি প্রবেশই করবে না। এটা আয়নার উপরিভাগ থেকে আলোক রশ্মি প্রতিফলিত হবার মত জলতল থেকে প্রতিফলিত হবে।

চিত্র 119



জলে নিমগ্ন দর্শকের কাছে বাইরের স্থলভাগের 180 বৃত্তচাপ 97 বৃত্তচাপের মধ্যে সংকুচিত হবে—এই সংকোচন বৃত্তচাপের অংশ 0 থেকে যত দূরে হবে তত বৃদ্ধি পাবে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, প্রতিটি জলের অভ্যন্তরের রশ্মি জলের পৃষ্ঠদেশকে যা 'সংকট কোণ' অপেক্ষা বৃহত্তর কোণে অর্থাৎ 48·5° কোণ অপেক্ষা বৃহত্তর কোণে এসে আঘাত করে, তা প্রতিসরিত না হয়ে প্রতিফলিত হবে। পদার্থবিদ একে 'অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন' ('Total internal reflection') আখ্যা দিয়েছেন। (পূর্ণ কারণ সমস্ত আপতিত রশ্মি প্রতিফলিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, সবচেয়ে ভালো দর্পণও, দৃষ্টান্তস্বরূপ মসৃণ ম্যাগনেসিয়াম বা রূপার দর্পণ, আপতিত রশ্মিগুচ্ছের অবশিষ্ট অংশ শোষণ করে নিয়ে কেবল অংশ মাত্র প্রতিফলিত করে। এখানে জল আদর্শ দর্পণের প্রতিভূ।)

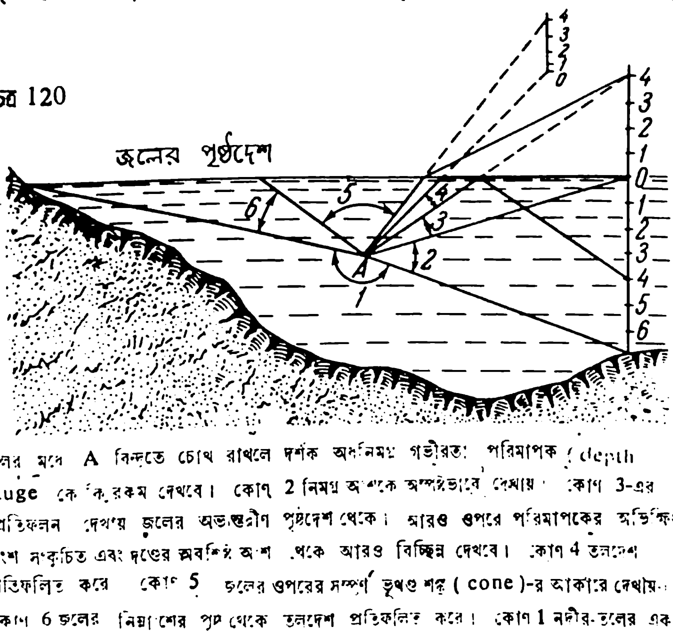
'পদার্থবিদের মাছ' বা সম্ভবত 'মাছের পদার্থবিদ'-এর পক্ষে আলোক বিজ্ঞানের 'অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন'-এর তত্ত্বই প্রধান শাখা হবে, কারণ তাদের জলের অভ্যন্তরের দৃষ্টির জন্য এটাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জলের মধ্যের এই দৃষ্টির সঙ্গে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, মাছের আঁশের রূপালী রঙও বিশেষভাবে জড়িত। প্রাণিবিদদের মতে উপরের জলের সিলিং (Ceiling)-এর সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য এই অভিযোজন। আমরা জানি যে 'অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন'-এর জন্য উপরের জলের পৃষ্ঠদেশ দর্পণের মত। এই দর্পণের পাশে রূপালী আঁশ ছোট ছোট উপরতলার মাছেদের তাদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বড় নিচুতলার শিকারী প্রাণীদের হাত থেকে রক্ষা করে।

জলের নিচ থেকে দেখা

আমি নিশ্চিত যে জলের নিচে থেকে উঁকি মেরে দেখলে এই পৃথিবীটা কি অদ্ভুতই না দেখায়—সে সম্বন্ধে অনেকেরই খুব অল্প ধারণা আছে। পৃথিবীর চেহারা এমনই বিকৃত আকার নেবে যে, এই চিরপরিচিত পৃথিবীকে চেনাই যাবে না।

নিজেকে মনে কর জলের তলা থেকে পৃথিবী পর্যবেক্ষণ রত। মেঘগুলো অবশ্য আগের মতই দেখাবে যেহেতু লম্বালম্বি পতিত রশ্মিগুচ্ছ প্রতিসরণ ঘটায় না। কিন্তু রশ্মিগুচ্ছ যে সমস্ত বস্তু থেকে জলের উপরিভাগে সূক্ষ্মকোণে এসে পড়বে তাদের সকলেরই চেহারা বদলে যাবে। তাদের অনেক ছোট দেখাবে আর এই ক্ষুদ্রাকার আরও প্রকট হবে যত আপতন কোণের পরিমাপ ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হবে। এবং এতে বিস্ময়ের কিছু নেই, যেহেতু জলের উপরে সমস্ত কিছুই 180° বক্রচাপে থাকবে, তারা প্রত্যেকেই নিজেকে সংকুচিত করে জলের নিচে 97° শঙ্কুর

চিত্র 120



জলের মধ্যে A বিন্দুতে চোখ রাখলে দর্শক অর্ধনিমগ্ন গভীরতা পরিমাপক (depth gauge)কে কি রকম দেখবে। কোণ 2 নিমগ্ন অংশকে অস্পষ্টভাবে দেখায়। কোণ 3-এর প্রতিফলন দেখায় জলের অভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠদেশ থেকে। আরও ওপরে পরিমাপকের অভিক্ষিপ্ত অংশ সংকুচিত এবং দণ্ডের অবশিষ্ট অংশ থেকে আরও বিচ্ছিন্ন দেখাবে। কোণ 4 তলদেশ প্রতিফলিত করে। কোণ 5 জলের ওপরের সম্পূর্ণ ভূখণ্ড শঙ্কু (cone)-র আকারে দেখায়। কোণ 6 জলের নিম্নাংশের পৃষ্ঠ থেকে তলদেশ প্রতিফলিত করে। কোণ 1 নদীর-তলের একটু অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব দেয়।

মধ্যে থাকবে—প্রায় অর্ধেক—এবং ফলে তাদের প্রতিবিম্ব বিকৃত হতে বাধ্য। জলে এসে পতিত এই রশ্মি যদি 10° কোণ করে তবে যে সমস্ত বস্তু থেকে এ রকম রশ্মি এসে পড়ছে তাদের চেনাই যাবে না।

কিন্তু জলে নিমগ্ন দর্শকের চোখে সবচেয়ে যা বিস্ময়ের কারণ হবে তা হল, জলের উপরিভাগের চেহারাটাই। চ্যাপ্টা না হয়ে ওকে মনে হবে শঙ্কুর মত।

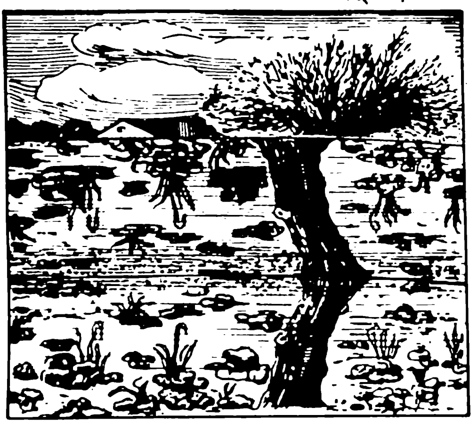
মনে হবে এক মস্ত শিলার উপর তুমি রয়েছ, যার পার্শ্বদেশ পরস্পরের সঙ্গে সমকোণের একটু বেশি, প্রায় 97° কোণ করে রয়েছে। শীর্ষে রামধনুর সুবর্কটি রঙের আকর্ষণীয় ডোরা তোমার চোখে পড়বে। এর কারণ বিভিন্ন প্রতিসরাংক—সাদা সূর্যালোকের বিভিন্ন রঙের বিভিন্ন 'সংকট' কোণের ফলে যার সৃষ্টি।

আর এই রামধনুর সীমানা পেরিয়ে তুমি কি দেখবে—রঙের সমস্ত ডোরার অন্তর্ধান? ঝকঝকে জলের উপরিভাগ যার মধ্যে, যেমন দর্পণের ক্ষেত্রে হয়, জলের নিচের সব কিছুই প্রতিবিম্বিত হয়ে ফিরে আসবে।

ঘটনা ক্রমে কোনো কিছু যার অর্ধেক জলে অর্ধেক বাইরে তা জলে নিমগ্ন দর্শকের চোখে আরও বিস্ময়কর দৃশ্য উপস্থাপিত করবে।

মনে কর নদীর উপরে জলের গভীরতার একটা পরিমাপক সংলগ্ন আছে (চিত্র 120)। জলের নিচের দর্শক A বিন্দুতে কি দেখবে? দৃশ্যমান 360°-র সমস্ত জায়গাটিকে বিভিন্ন খণ্ডে ভাগ করে নিয়ে আলাদা আলাদাভাবে দেখা যাক। আলোক যথেষ্ট থাকলে 1 চিহ্নিত কোণের মধ্যে দেখা যাবে জলের তল। 2 নং কোণের মধ্যে জলে নিমগ্ন গভীরতা পরিমাপকের অবিকৃত চেহারা পাওয়া যাবে। 3 নং কোণের চৌহদ্দির মধ্যে মেট্রোমাটি পরিমাপকের ঐ একই

চিত্র 121



জলে নিমগ্ন দর্শকের চোখে আংশিকভাবে ডোবা গাছ কেমন দেখাবে। (120 নং চিত্রের সঙ্গে তুলনা কর।)

অংশের প্রতিবিম্ব পাওয়া যাবে, তবে 'অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন'-এর জন্য প্রতিবিম্বের মাথা হবে নিচের দিকে। আরও একটু উপরে, জলে নিমগ্ন দর্শক পরিমাপকের কিছু অংশ জল থেকে বিচ্ছিন্ন দেখতে পাবে, তবে জলে নিমগ্ন একই

দণ্ডের অংশ হিসেবে নয়, আরও উপরে, মনে হবে দণ্ডটি নিচের অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন। বস্তুত, তার মনেই হবে না, বাতাসে পরিমাপকের যে অংশ দুলছে তা জলের তলার দণ্ডেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ মাত্র। আরও পরিমাপকটি, বিশেষ করে নিচের দিকে, মনে হবে খুবই সংকুচিত, যেখানে পরিমাপকটির বিভিন্ন ভাগগুলো মনে হবে বেশ পুরু।

আমাদের জলে নিমগ্ন দর্শকের চোখে বসন্তের সময় জলে নিমগ্ন তীরভূমির গাছকে 121 নং চিত্রের মত দেখাবে, আর স্নানার্থীকে দেখাবে 122 নং চিত্রের মত। এটাই মাছের কাছে বস্তুপুঞ্জের চেহারা। জলে ডোবা জায়গায় দণ্ডায়মান কোনো মানুষকে মাছ দুটো ভিন্ন মানুষ হিসেবে দেখে ; উপরের অংশের মনে হয় পা নেই ; আর নিচের অংশটি মনে হয় মুণ্ডহীন কিন্তু চার পেয়ে। মাছ যতই

চিত্র 122



বুক পর্যন্ত জলে নিমগ্ন স্নানার্থীকে জলে নিমগ্ন দর্শক কেমন দেখবে। (120 নং চিত্রের সংগে তুলনা কর।)

দর্শকের কাছ থেকে জলের মধ্যে দূরে সরে যায়, দেহের উপরের অংশ ততই সংকুচিত মনে হয়, যতক্ষণ না নির্দিষ্ট কোনো স্থানে পৌঁছে মনে হয় শুধু একটা ভাসমান মাথা রয়েছে।

আমরা কি নিজেরা এটা পরীক্ষা করে দেখতে পারি? কিন্তু জলে নিমজ্জিত অবস্থায় চোখ খুলে রাখলেও আমরা সামান্যই দেখতে পাব। তার কারণ জলের উপরিভাগ ঐ অল্প কয়েক সেকেণ্ডেও স্থির থাকবে না যে, অল্পক্ষণ

জলে নিমজ্জিত অবস্থায় আমরা থাকতে পারব। আর ঢেউ-দোলা জলের উপরিভাগে কিছু দেখা বা বুঝে ওঠা মুশকিল। দ্বিতীয়ত, আমাদের চোখের স্বচ্ছ অংশের প্রতিসরাঙ্ক জলের প্রতিসরাঙ্কের প্রায় সমান হওয়ায়, যা ঘটনাক্রমে পূর্বেই লিপিবদ্ধ হয়েছে, আমাদের অক্ষিপটের প্রতিবিম্ব খুবই ঝাপসা হবে। ডাইভিং বেল, হেলমেট বা সাবমেরিনের হেলমেট কোনো সাহায্যেই আসবে না। জলে নিমজ্জিত থেকেও জলে নিমজ্জিত অবস্থার দৃষ্টি সে পাবে না। পূর্বেই ব্যাখ্যা করেছি, চোখে প্রবেশ করার আগে আলোক রশ্মিকে বাতাসের মধ্য দিয়ে আবার যেতে হবে এবং উল্টো প্রতিসরণের সম্মুখীন হবে—যে অবস্থায় হয় সে পূর্বের দিক ফিরে পাবে অথবা অন্য কৌণিক পথে ঘুরে যাবে যা জলে যেমন ছিল তা থেকে পৃথক। কারণেই সাবমেরিনের কাচের পোর্টহোল থেকে দেখলে জলে নিমগ্ন অবস্থায় দৃষ্টি কি রকম সে সম্বন্ধে কখনই নির্ভুল ধারণা হবে না।

অবশ্য জলে নিমগ্ন অবস্থায় দেখার জন্য জলে ডোবার প্রয়োজন নেই। বিশেষ জলপূর্ণ ক্যামেরার সাহায্যে কাজটা করিয়ে নেওয়া যায়। ক্যামেরাটির সাধারণ লেন্সের জায়গায় একটা ধাতব প্লেট থাকে যার মধ্যে একটি ছিদ্র। স্বভাবতই যদি অ্যাপারচার ও আলোক-স্পর্শকাতর প্লেটের মধ্যেকার অংশ জলপূর্ণ হয়, ফিল্মের উপর বাইরের পৃথিবী জলে নিমগ্ন দর্শকের চোখে যেমন লাগে তেমনই লাগবে। প্রসঙ্গক্রমে এইভাবেই আমেরিকার পদার্থবিদ অধ্যাপক উড এই ধরনের কৌতূহল উদ্দীপক অনেক ছবি তুলেছেন, তার মধ্যে একটি 115 নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। এই চিত্র সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা জানিয়েছি সরল সেতুকে কেন বৃত্তাংশ হিসেবে দেখি।

আর একভাবেও সরাসরি জলের অভ্যন্তর থেকে বিষয়বস্তুর দৃশ্য দেখার ঐ কাজটা করা যায়। হ্রদের নিস্তরঙ্গ জলে একটা আয়না ডুবিয়ে এবং ওকে অভিপ্রেত কোণে নাড়িয়ে এর উপর উপরের বস্তুপুঞ্জের প্রতিবিম্ব পাওয়া যেতে পারে। তত্ত্বগত যে সব যুক্তি আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি এটা তার সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

সংক্ষেপে, ঈষৎ স্বচ্ছ জলের স্তর পরের সমস্ত বস্তুকে বিকৃতভাবে উপস্থাপিত করে, চোখে আকার ও চেহারার অদ্ভুত রূপান্তর ঘটায়। ডাঙার কোনো প্রাণীকে হঠাৎ জলে বাস করতে দিলে—ধরা যাক, সে বাস করতে পারবে—ও ডাঙার পুরাতন বাসস্থান চিনতে সম্পূর্ণ ভুল করবে, যেহেতু স্বচ্ছ জলে সম্পূর্ণ ভিন্ন চেহারার বস্তু প্রতিবিম্বিত হবে।

জলের নিচে রঙের প্যালেট (Palette)

আমেরিকার জীববিদ্যা বিশারদ বীবি জলের নিচের রঙের বর্ণ-বৈচিত্র্যের এক অত্যন্ত সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন।

"সকালে 9টা 41 মিনিটে আমরা জলের তলায় গেলাম এবং প্রায়ই আমি যা উপভোগ করেছি, সোনালী হল্দ পৃথিবী থেকে সবুজ পৃথিবীতে রূপান্তর, তা আমাদের কাছে আশাতীত ছিল। ফেনা ও বুদবুদ কাচ থেকে সরে গেলে আমরা সবুজে অবগাহন করলাম; আমাদের মুখমণ্ডল, ট্যাঙ্ক, ট্রে, কালো দেওয়ালগুলো পর্যন্ত রঙিন হয়ে গেল। তা সত্ত্বেও ডেক থেকে আমরা আপাত দৃষ্টিতে নিচে নামতে লাগলাম……কেবল গভীর জঙ্গল নিখুঁত নীলে…

"……প্রথম দৃশ্য মুছে গেল, দৃষ্টিতে ফুটে উঠল আরামপ্রদ বর্ণালীর উষ্ণ রশ্মিরাজি। লাল এবং কমলা রঙ কোথায় উধাও হয়ে গেল, যেন কখনো ছিলই না এবং শীঘ্রই হল্দ রঙ সবুজে মিশে গেল। পৃথিবীর বুকে এই সমস্ত রঙ আমরা কত না উপভোগ করি এবং যখন তারা 100 ফুট কি তার বেশি সরে গেল, যদিও দৃশ্যমান বর্ণালীর তারা মাত্র এক-ষষ্ঠাংশ, তবুও আমাদের মনে হতে লাগল অবশিষ্ট সমস্তই শীতল রাত্রির এবং মৃত্যুর।

"আমরা বুঝে উঠতে না উঠতেই যতই আমরা নিচে নামতে লাগলাম সবুজ রঙ ফিকে হয়ে এল এবং 200 ফুট নিচের জল সবুজাভ নীল না, নীলাভ সবুজ তা বলা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল।…

"600 ফুট নিচে রঙটা কৃষ্ণবর্ণ রূপ নিল, উজ্জ্বল সবুজ হল।…আরও উজ্জ্বল হল, কিন্তু এর প্রকৃত শক্তি এতই কম যে লেখা-পড়ার কোনো কাজে এলো না।…

"আমি জলের নামকরণ করতে শুরু করলাম: কৃষ্ণাভ সবুজ, ঘন ধূসর সবুজ। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, যখন নীল রঙ সরে গেল, এটা কিন্তু বেগুনীর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হল না—যা দৃশ্যমান বর্ণালীর শেষ বর্ণ। আপাত দৃষ্টিতে তা যেন শোষিত হয়ে গেছে। নীলবর্ণের শেষ ছোপ অনামী ধূসর রঙের ক্ষীণ ধারায় পর্যবসিত হল এবং শেষ পর্যন্ত কালো রঙে। এর পরের স্তরে আর মন রঙের পার্থক্য স্পষ্টভাবে নির্ণয় করতে পারল না। সূর্য পরাস্ত হল এবং রঙ চিরতরে অন্তর্হিত হল, যতক্ষণ না একজন মানুষ শেষ পর্যন্ত প্রবেশ করল এবং এক হল্দ তড়িৎ-রশ্মির ঝলক সৃষ্টি করল লক্ষ লক্ষ বছরের ঘন কালো অন্ধকার গহ্বরে।"

অন্যত্র বীব জলের গভীর তলদেশের অন্ধকার সম্পর্কে নিম্নলিখিত বর্ণনা দিয়েছেন:

"কিছুদিন আগে 2,500 ফুট নিচের জল আরও কালো মনে হল, আর এখন ঐ একই জল মনে হচ্ছে কালোর চেয়েও আরও কালো। মনে হল যেন উপরের পৃথিবীর ভবিষ্যতের সমস্ত রাত্রি যেন এর তুলনায় গোধূলির প্রকার-ভেদ মাত্র। জলের তলের এই কৃষ্ণ বর্ণ দেখার পর 'কৃষ্ণ' বা 'কালো' শব্দটা পৃথিবীর রঙের ব্যাখ্যায় আমি যেন পুনরায় ব্যবহার করতে পারতাম না।"

অন্ধ বিন্দু

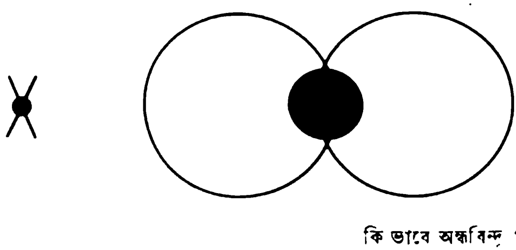
যদি বলা হয় তোমার দৃষ্টিলোকের একটা অংশে তোমার দৃষ্টি পৌঁছয় না, যদিও ওটা তোমার দৃষ্টির মধ্যেই রয়েছে, তবে অবাক হবে নিশ্চয়ই ; ভাববে,— কি অবাস্তর কথা বলছেন ! বস্তুত, আমরা কি আমাদের সারা জীবনে এমন একটা বিশেষ ত্রুটি লক্ষ্য করি নি ? কিন্তু এই সাধারণ পরীক্ষাটা দিয়ে এটা সহজেই দেখানো যায় ।

123 নং চিত্রটি তোমার ডান চোখ থেকে 20 সে.মি. দূরে রাখ । এবার বাঁ চোখ বন্ধ করে বাঁদিকের ক্রুশ-চিহ্নের দিকে তাকাও । তারপর ধীরে ধীরে চিত্রটিকে সামনে আন । এক সময় দুই বৃত্তের সংযোগস্থলের বড় কালো বিন্দুটি বা স্থানটি কোনো চিহ্ন না রেখে অদৃশ্য হয়ে যাবে । ওটা আর তোমার নজরে পড়বে না যদিও ওটা তখনও তোমার দৃষ্টিলোকের সীমার মধ্যে আছে এবং যদিও বাম ও ডান দিকের বৃত্তদ্বয় বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ।

1668 খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত পদার্থবিদ মারিয়োটি (Mariotte)-র দেখানো এই পরীক্ষাটি চতুর্দশ লুই-এর সভাসদদের প্রভূত আনন্দ দান করে । মারিয়োটি 2 মিটার দূরে দুই সভাসদকে মুখোমুখি বসালেন । এবার এক পার্শ্বের একটা বিন্দুর দিকে এক চোখ বন্ধ করে তাকাতে বললেন । প্রত্যেকে মুখোমুখি মাথা নেই দেখলেন ।

সপ্তদশ শতাব্দীতে মানুষ সর্বপ্রথম অক্ষিপটের 'অন্ধ বিন্দু' (Blind spot)-এর কথা জানতে পারে । অক্ষিপটের এই অংশটি অপটিক নার্ভ যেখানে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত নয় অক্ষিগোলকের এরূপ অংশে প্রবেশ করে এবং যেখানে আলোক-সংবেদনশীল পদার্থ নেই সেইখানে অবস্থিত ।

চিত্র 123



কি ভাবে অন্ধবিন্দু পাওয়া যায় ।

তবে এই অন্ধ বিন্দু আমাদের দৃষ্টিগোচরে আসে না কেন ? তার কারণ, আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি এবং আমাদের কল্পনা অজানিতভাবে এই অভাব পূরণ করে নেয় । সেইজন্যই 123 নং চিত্রের ঐ অংশটি যদিও আমাদের চোখে পড়ে

না, আমরা মনে মনে রেখাগুলোর ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখি এবং নিশ্চিত-রূপেই মনে করি যে, আমরা তাদের পারস্পরিক ছেদ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

তুমি কি চশমা পর? নিচের পরীক্ষাটা তাহলে করে দেখতে পার। একটা লেন্সের কেন্দ্রটি ছাড়া চারপাশে কাগজ লাগিয়ে যদি দেখ, দেখবে বেশ কয়েকদিন বাধো বাধো ঠেকছে, তারপর আর তোমার ওটা নজরে পড়বে না। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, তোমার চশমার কাচ যদি ফেটে যায় এবং তুমি ওটা কিছুদিন ধারণ করে থাক তবে তোমার শুধু মনে থাকবে যে, ওটা অর্থাৎ ঐ ফাটল প্রথম প্রথম ক'দিন তোমায় বিরক্ত করেছিল। অভ্যাস, কেবল অভ্যাসই অন্ধ বিন্দুর প্রতি আমাদের 'অন্ধ' করে রাখে। আবার মনে রাখা দরকার, ডান চোখের অন্ধ বিন্দু এবং বাম চোখের অন্ধ বিন্দু দুই চোখের দৃষ্টিলোকের দুই বিভিন্ন ক্ষেত্রে থাকে। ফলে, দ্বি-নৈত্রিক দৃষ্টিতে তারা যে অঞ্চল জুড়ে থাকে সেখানে কোনো দৃষ্টির অসুবিধে হয় না।

'অন্ধ বিন্দু' উল্লেখযোগ্য এমন কিছু নয়, এ রকম মনে করার কোনো কারণ নেই। এক চোখ বন্ধ করে 10 মিটার দূরবর্তী কোনো বাড়ীর দিকে তাকালে, এই অন্ধ বিন্দুর জন্য প্রায় 1 মিটার পরিমিত স্থান তোমার দৃষ্টির আড়ালে থেকে যাবে। আর আকাশের দিকে তাকালে ঐ বিন্দুর জন্য প্রায় 120টি পূর্ণ চন্দ্র পরিমিত স্থান তোমার দৃষ্টিতে আসবে না।

চাঁদকে কত বড় মনে হয়?

প্রসঙ্গক্রমে চাঁদের কতটুকু আমরা দেখতে পাই সে সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা যাক। চাঁদ কত বড়? বন্ধুদের এ প্রশ্ন করলে নানা জন নানা উত্তর দেবে। বেশির ভাগ বন্ধুই বলবে থালার মত, কেউ বলবে আপেলের মত, কেউ বলবে রেকাবির মত, আবার কেউ বলবে জামের মত। একদা আমি একটা স্কুলের ছাত্রকে জানতাম যে সর্বদাই ভাবত চাঁদ প্রায় বারটি একত্রে যা হয় সেই রকম গোল টেবিলের মত বড়। আবার জনৈক লেখক তাঁর এক গ্রন্থে দাবি করেছেন যে চাঁদ আড়াআড়ি ভাবে এক গজ।

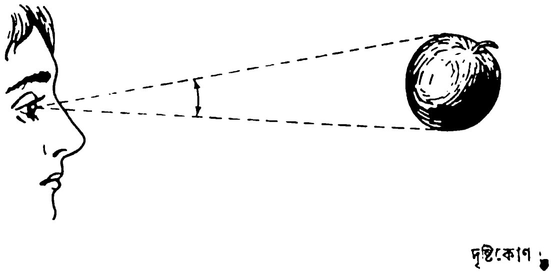
একটি এবং একই জিনিসের আকার নিয়ে মানুষের ধারণার এত পার্থক্য কেন? এর কারণ আমরা নানাভাবে দূরত্ব মাপি এবং অধিকন্তু অবচেতন মনের ধারণা নিয়ে এ বিষয়ে চলি। আপেলের মত বড় বলে যে চাঁদকে ধারণা করে তার কাছে আবার হয়ত, চাঁদকে থালা বা গোলটেবিল বলে যে ভাবে, তার অপেক্ষা অনেক কাছের বলে মনে হয়।

আমি পূর্বে লক্ষ্য করেছি যে, অনেকেই চাঁদকে প্লেটের মত বড় মনে করেন এবং তার উপর গল্প ফেঁদে বসেন। আমরা যদি দূরত্বের পরিমাপ করে দেখি—(পরে আমি বলব কিভাবে এটা করা হয়)—যার উপর ভিত্তি করে চাঁদের এই

উনবিংশ শতাব্দীর রুশ লেখক গ্রিগোরোভিচের 'প্লাউম্যান' ('কৃষক') গল্পের নিম্নলিখিত উদ্ধৃতাংশে যার প্রমাণ মেলে। "গ্রামটিকে মনে হল একজনের হাতের গহ্বরে ধারণ করা যায়। গাছগুলো মনে হল সেতুর অনেক দূরে; আর কুঁড়ে ঘর, পাহাড় এবং বার্চের বনাঞ্চল মনে হল গ্রামের সংলগ্ন। বাড়ী, ফলের বাগান, গ্রাম—সব কিছুই যেন খেলার সামগ্রী, গাছগুলো যেন কাণ্ড এবং নদী যেন দর্পণের রজত শুভ্র তল।"]

গ্রহ-নক্ষত্রদের যে কোণের পরিমাপে দেখা যায় তাই দেখে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা গ্রহ-নক্ষত্রের আপাত-আকার স্থির করেন। যে বস্তু দেখা হচ্ছে তার দুই প্রান্ত থেকে চক্ষু বরাবর সরলরেখা টানলে ঐ দুই সরলরেখা চোখে এসে যে কোণ উৎপন্ন করে তাকে 'দৃষ্টিকোণ' বলে (চিত্র 125)। এখন তোমরা নিশ্চয়ই

চিত্র 125

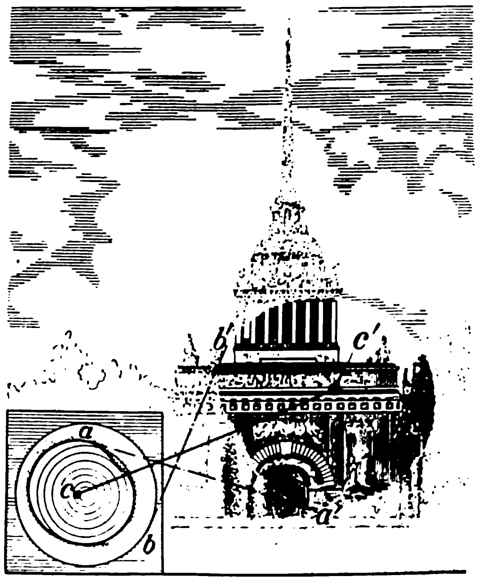


জান, ডিগ্রী, মিনিট ও সেকেণ্ডস্ দিয়ে কোনো কোণের পরিমাপ করা হয়। তাই চাঁদের আকার পরিমাপ করতে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ওকে আপেল বা থালার সঙ্গে তুলনা না করে, বলবেন 'অর্ধ ডিগ্রী', যার অর্থ হল চাঁদের দুই প্রান্ত থেকে দুটি সরলরেখা টানলে ঐ সরলরেখাদ্বয় চোখে এসে মিলন বিন্দুতে 'অর্ধ ডিগ্রী' কোণ উৎপন্ন করে। আপাত-আকার সংজ্ঞাটাই ঠিক, তার কারণ এতে কোনো ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থাকে না।

জ্যামিতি থেকে আমরা জানতে পারি যে, আমাদের চোখ থেকে কোনো বস্তুকে তার ব্যাসের 57 গুণের বেশি কোনো দূরত্বে রাখলে, বস্তুটি 1° কোণে দেখা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কোনো আপেলের ব্যাস যদি হয় 5 সে.মি. তা হলে আপেলটি 5×57 সে.মি. দূরে রাখলে চোখে 1° কোণ করবে। এর দ্বিগুণ দূরে এটাকে $\frac{1}{2}^{\circ}$ কোণে বা চাঁদকে আমরা যে রকম দেখি সে রকম দেখা যাবে। চাঁদকে আপেলের মত বড়ও বলতে পার, অবশ্য যদি আপেলটি 570 সে.মি. দূরবর্তী হয়। প্লেটের সঙ্গে চাঁদের আপাত-আকার তুলনা করতে হলে, প্লেটটিকে আমাদের 30 মিটার দূরে রাখতে হবে, অনেকে ভাববে চাঁদ এত ছোট! ভাল

আপাত আকারের ধারণা করে থাকি, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, আমাদের এই দূরত্ব 30 মিটারের বেশি নয়। (এই সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ের জন্য মিন্যার্ট-এর 'আলোক এবং প্রকৃতির রঙ' সম্পর্কিত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। এইরকম অত্যন্ত পরিমিত দূরত্বেই আমরা আমাদের নৈশ জ্যোতিষ্ককে অবচেতনভাবে সরিয়ে দি।

চিত্র 124



যখন এক চোখ দিয়ে গৃহটিকে দেখি তখন চোখের অন্ধবিন্দু c-র সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ দৃষ্টিলোকের c′ পরিমিত অংশ আমাদের একেবারেই চোখে পড়ে না।

ঘটনাক্রমে দূরত্বের ত্রুটিপূর্ণ পরিমাপের উপরই আমাদের বেশ কিছু দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটে। যখন আমি বালক ছিলাম তখন আমার এমন একটা দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে যা বেশ মনে আছে। এক বসন্তে আমি আমার জীবনে সর্বপ্রথম শহরের বাইরে বেড়াতে যাই। আমি মাঠে একপাল গরু চরছে দেখলাম। আমার কাছে তাদের অত্যন্ত ক্ষুদ্র অবয়ব বিশিষ্ট বলে মনে হল, আমি দূরত্বের পরিমাপে ভুল করেছিলাম। আমি আর কখনো এত ক্ষুদ্র গরু দেখিনি, এবং স্বভাবতই, আর কখনো দেখবও না। [বয়স্করাও অনেক সময় এমন দৃষ্টিবিভ্রমে পড়ে—

কথা, 6 পেনির একটা মুদ্রা ওর ব্যাসের চেয়ে 114 গুণ দূরে রাখ। যদিও এই দূরত্ব কেবল দু'মিটারের মত, এ চাঁদকে ঢেকে দেবে !

চাঁদকে খালি চোখে যে রকম দেখতে

চাঁদের বৃত্ত আঁকতে বললে তোমরা বলবে, যথাযথ আঁকা কি সম্ভব ? বলবে, চোখ থেকে এর দূরত্বের উপর এর আকার স্বভাবতই নির্ভর করবে—এ ছোট হবে, না বড় হবে। সাধারণ দৃষ্টির চৌহদ্দির মধ্যে রাখলে, যে দূরত্বে আমরা বই বা কোনো অংকন রাখি, সাধারণ চোখের পক্ষে যা প্রায় 25 সে.মি. সেই রকম দূরত্ব ধরা যাক। এবার দেখা যাক, দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই রকম বই-এর একটা পৃষ্ঠায় চাঁদের থালার সমান আপাত-আকারের কত বড় বৃত্ত হতে পারে। সমস্যাটা অত্যন্ত সহজ ; আমাদের যা করতে হবে তা হল 25 সে.মি. দূরত্বকে 114 দিয়ে ভাগ করা। আমাদের ফল খুবই ছোট হবে, প্রায় 2 মি.মি.-র মত—এই বই-এর 'O' অক্ষরটির আকারের মত। এত ক্ষুদ্র কোণে চাঁদ ও সূর্য—যা প্রায় সমান আপাত-আকারের—তাদের এত ক্ষুদ্র দেখাবে যে, প্রকৃত পক্ষে বিশ্বাস করাই কঠিন হবে।

তোমরা হয়ত লক্ষ্য করে থাকবে যে, সূর্যের দিকে কিছু সময় চেয়ে থাকলে তোমাদের বেশ কিছুক্ষণের জন্য মনে হবে নানা রঙের কতকগুলো থালা দেখছ। আলোকের এই সব অংকন সূর্যেরই মত কৌণিক মান সম্পন্ন কিন্তু তাদের আপাত-আকার পরিবর্তনশীল। আকাশের দিকে তাকালে, ঐ আলোকের থালাগুলো সূর্যের মত বড় লাগবে, কিন্তু বই-এর পৃষ্ঠায় চোখ নামিয়ে আনলে, সূর্যের আকার ইংরাজী 'O' অক্ষরের মত ছোট দেখাবে, লৈখিক দিক থেকে এটা আমাদের গণনার নির্ভুলতা প্রমাণ করে।

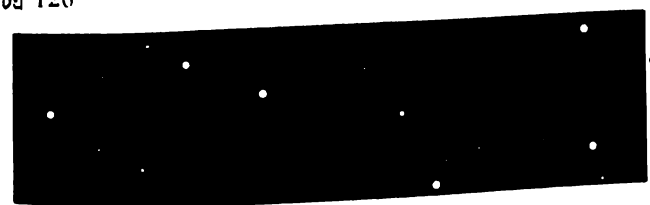
গ্রহ-নক্ষত্রদের আপাত-আকার

কৌণিক মান অনুসারে যদি ছবি আঁকা হয়, তবে Ursa Major, Dipper নক্ষত্রপুঞ্জের ছবি 126 নং চিত্রের মত দেখাবে। সর্বোচ্চ দৃষ্টির দূরত্ব থেকে দেখলে আমাদের চোখে ওটা আমরা আকাশে ওদের যেমন দেখি, তেমন লাগবে। এটাই হবে, কৌণিক মান ঠিক রেখে নক্ষত্রপুঞ্জের মানচিত্র। দৃষ্টিতে ওদের চিত্র দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠলে, এই নক্ষত্রপুঞ্জের শুধু আকারই নয়, দৃষ্টিপথে সরাসরি ওদের চিত্র উপরের চিত্রে যেমন দেখানো হয়েছে ঠিক তেমনটি দেখাবে। সকল নক্ষত্রপুঞ্জের প্রধান প্রধান নক্ষত্রদের মধ্যবর্তী কৌণিক দূরত্ব জেনে—জ্যোতিষ্ক-লোকের বর্ষপঞ্জীতে যা দেওয়া হয়—তুমি সমগ্র জ্যোতিষ্কলোকের পূর্ণ আকারের মানচিত্র আঁকতে পারবে। এর জন্য মিলিমিটার অনুসারে দাগ-কাটা কাগজ

দরকার এবং প্রত্যেক 4·5 মিলিমিটারকে 1 ধরতে হবে (নক্ষত্রদের ঔজ্জ্বল্যের অনুপাত অনুসারে নক্ষত্র প্রদর্শনকারী বৃত্তের ক্ষেত্রফল দেখাতে হবে)।

এবার গ্রহপুঞ্জে আসা যাক। তাদের আপাত-আকার নক্ষত্রের মতই খালি চোখে এত ক্ষুদ্র যে তাদের 'আলোকের বিন্দু' বলে মনে হয়। এতে বিস্ময়ের

চিত্র 126



Dipper নক্ষত্রযুক্ত কৌণিক মান রেখে ! এই চিত্রটিকে দেখার জন্যে চোখ থেকে 25 সে.মি. দূরে রাখতে হবে।

কিছু নেই, কারণ সম্ভবত সর্বাপেক্ষা ঔজ্জ্বল্যের সময়ের শুক্র গ্রহ ছাড়া, অন্য কোনো গ্রহকেই খালি চোখে 1′ কোণের ঊর্ধ্বে কৌণিক মানে কখনও দেখা যায় না, 1′ কোণই দৃষ্টির সংকটমান, যা দিয়ে আমরা আকার-বিশিষ্ট কোনো বস্তুকে সনাক্ত করতে পারি (এর চেয়ে ছোট কৌণিক মান হলে সকল বস্তুই কেবল বিন্দুর মত দেখায়)।

নিম্নে কৌণিক সেকেণ্ডে বিভিন্ন গ্রহের আকারের একটা তালিকা দেওয়া হল ঃ প্রতি গ্রহের বিপরীত দিকে দেওয়া দুটি করে কৌণিক মানের প্রথমটি পৃথিবী থেকে যখন সবচেয়ে কাছে এবং দ্বিতীয়টি পৃথিবী থেকে যখন সবচেয়ে দূরে তা প্রকাশ করছে।

গ্রহ	সেকেণ্ডে কৌণিক মান
বুধ	13—5
শুক্র	64—10
মঙ্গল	25—3·5
বৃহস্পতি	50—31
শনি	20—15
শনির বলয়	48—35

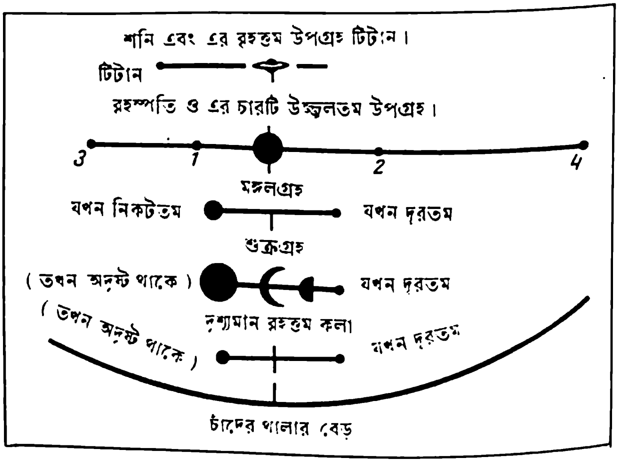
কিন্তু গ্রহ-নক্ষত্রদের 'পূর্ণ' অবয়ব'-এর পরিমাপ তুলে ধরা অসম্ভব ব্যাপার। পূর্ণ কৌণিক মান 60°-র পূর্ণ, 1 মিনিট হলেও তার আকার সর্বোচ্চ দৃষ্টিগ্রাহ্য দূরত্বে 0·04 মি.মি. হবে, যা এত ছোট যে আমাদের সাধারণ চোখে প্রায় দেখা

15-0407

যাবে না। অতএব 100 বিবর্ধক-শক্তিসম্পন্ন দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আমরা গ্রহের আকার তুলে ধরব।

127 নং চিত্রে এইভাবে বিবর্ধিত করা গ্রহপুঞ্জের আপাত-আকার তুলে ধরা হয়েছে। নিচের বৃত্তচাপে 100 শক্তিসম্পন্ন দূরবীক্ষণ যন্ত্রে চাঁদ বা সূর্যকে

চিত্র 127



চোখ থেকে 25 সে. মি. দূরে এই চিত্রটি ধরলে 100 বিবর্ধক শক্তিসম্পন্ন দূরবীক্ষণ যন্ত্রে গ্রহদের কেমন দেখায় তা দেখতে পাবে।

যেমন দেখায় তা দেখানো হয়েছে। এর ঠিক উপরে বুধ যখন পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় তখনকার চিত্র। আরও উপরে শুক্র গ্রহের বিভিন্ন কলা। শুক্র গ্রহের যখন সবচেয়ে অনুকূলের বিপরীত অবস্থান তখন আর পৃথিবী থেকে একে দেখা যায় না, কারণ তখন এর মুখের যে দিক পৃথিবীর দিকে ফেরানো থাকে তা আলোকিত হয় না। (এই অবস্থায় তাকে কেবলমাত্র সেই দুর্লভ ক্ষণে দেখা যায় যখন সূর্যের থালার উপর কালো বৃত্তের আকারে সে প্রক্ষিপ্ত হয়। এটাই তথাকথিত 'শুক্র গ্রহের পথ।') তারপর আসে এর দৃশ্যমান কাস্তে যা সকল গ্রহের থালার মধ্যে সবচেয়ে বড়। তারপরে এর বিভিন্ন কলায় শুক্র গ্রহ ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হতে থাকে এবং সব শেষে পূর্ণ থালার আকার নেয় যার ব্যাস ওর কাস্তের ব্যাসের 1/6 ভাগ মাত্র।

শুক্রের উপরে মঙ্গল গ্রহ। মঙ্গল গ্রহ যখন পৃথিবীর সব চেয়ে কাছে থাকে চিত্রে প্রদর্শিত বাঁদিকের আকার নেয় আর ডানদিকের আকার নেয় যখন পৃথিবী থেকে সব চেয়ে দূরে যায়। মঙ্গল গ্রহের বাঁদিকের থালাটি 100 শক্তিসম্পন্ন বিবর্ধক

দূরবীক্ষণ যন্ত্রে যেমন দেখায় তারই ছবি। এত ক্ষুদ্র থালার চিত্র দিয়ে কি আর বোঝা যাবে? বোঝার জন্য এর আকার দশ গুণ করে ভাবতে হবে, তা হলে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা 1,000 শক্তিসম্পন্ন বিবর্ধক দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মঙ্গল গ্রহকে কেমন দেখেন তা আঁচ করতে পারবে। কিন্তু তা হলেও এত ছোট আকারের মধ্যে কি ঐ অদ্ভুত জগতের খাল, সাগরের বুকের আনুমানিক তৃণলতা, গাছপালা ইত্যাদি ভালোভাবে চেনা যাবে? তাহলে একদল যা দাবি করেন, অপর দল তার প্রতিবাদ করবেন—এতে আর আশ্চর্যের কি আছে? একদল যেটা স্পষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন বলে ভাবেন, অপর দল তাকে নস্যাৎ করে দেন দৃষ্টিবিভ্রম বলে।*

আমাদের তালিকায় বৃহস্পতি ও তার উপগ্রহ বেশ উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে রয়েছে। এর থালা, শুক্রের কাস্তে বা থালাটি ছাড়া অন্যান্য সকল গ্রহদের থালার চেয়ে বড়। আর এর প্রধান চারটি উপগ্রহ চাঁদের থালার প্রায় অর্ধেকের সমান সরলরেখার উপর বিস্তৃত।

যখন বৃহস্পতি পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটে তখন তার এই আকার। সবশেষে রয়েছে শনি গ্রহ এবং তার বলয় ও বৃহত্তম উপগ্রহ টিটান।

তোমাদের কাছে এটা স্পষ্ট হওয়া দরকার যে, প্রতিটি দৃশ্যমান বস্তু ক্ষুদ্রতর মনে হবে যত আমরা তাদের কাছে কল্পনা করব। বিপরীত পক্ষে, দৃষ্টি থেকে বস্তুটি যত দূরবর্তী হবে, বস্তুটিকে তত বড় দেখাবে।

এখন তোমাদের এডগার অ্যালান পো'র বিশেষ করে এই ধরনের দৃষ্টিবিভ্রমের উপর লেখা একটা শিক্ষাপ্রদ গল্পের বর্ণনা দিয়ে আপ্যায়ন করা যাক। যদিও এটা সত্য বলে মনেই হয় না, তবু এটা শুধুমাত্র আজগুবি কল্পনা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আমি নিজেই একবার এই ধরনের দৃষ্টিবিভ্রমে পড়ি এবং তোমাদেরও অনেকের এই ধরনের অভিজ্ঞতা হয়ত স্মরণে আসবে।

নারী-সিংহী মূর্তি (দি স্ফিংকস)

—এড্‌গার অ্যালান পো

(সামান্য কাটাছেড়া করে গল্পটি দেওয়া হয়েছে।)

"নিউ ইয়র্কে কলেরার করাল রাজত্বের সময় আমি একপক্ষকাল 'কটেজ-ওরণী'তে অবসর যাপনের জন্য আমার এক আত্মীয়র নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলাম জনাকীর্ণ শহর থেকে প্রতিদিন সকালে আমাদের কাছে যদি ভয়ঙ্কর সংবাদ না আসত তাহলে আমাদের সময়টা সানন্দে কেটে যেত। আমাদের পরিচিত

* দৃষ্টিগ্রাহ্য তথ্যের উপরই আজ আর মঙ্গল গ্রহ ও অন্যান্য গ্রহের জ্ঞান সীমাবদ্ধ নয়। আরও সংবেদনশীল সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির পরিমাপকে ধন্যবাদ. আমরা গ্রহের ও তাদের উপগ্রহের পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক যথার্থ ও মূল্যবান সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সমর্থ হয়েছি।—সম্পাদক

কোনো না কোনো ব্যক্তির মৃত্যু-সংবাদ বহন করে না এনে একটা দিনও যায় নি। অবশেষে কোনো দূত আসছে দেখলেই আমরা ভয়ে কাঁপতে থাকতাম। দক্ষিণের বাতাস মনে হত মৃত্যুর উগ্র গন্ধযুক্ত। ঐ পঙ্গু করে দেওয়া চিন্তা বস্তুত আমার সমস্ত হৃদয় দখল করে নিল......আমার অতিথি-সেবকটির মেজাজ কিন্তু অনেক ধীর-স্থির ছিল, এবং যদিও তিনি মানসিক দিক থেকে অনেক ভেঙ্গে পড়েছিলেন, তবুও আমাকে সাহস দেওয়ার জন্য তিনি নিজেকে অবিচল রেখে ছিলেন।......

"অত্যন্ত গরম এক দিনের শেষে, একটা বই হাতে সুদীর্ঘ নদীতীরের দূরবর্তী এক পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে খোলা জানলার ধারে বসেছিলাম। ......আমার চিন্তা তখন সম্মুখের গ্রন্থ থেকে বিষণ্ণ-পরিত্যক্ত প্রতিবেশী গ্রামটির দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। গ্রন্থ থেকে আমার দুচোখ উন্মুক্ত পাহাড় ও জীবন্ত এক বিকট আকৃতির দৈত্যের উপর গিয়ে পড়ল। মূর্তিটি পাহাড়ের শীর্ষ থেকে দ্রুত নিচের দিকে নেমে গেল এবং শেষে সানুদেশের গহন অরণ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। যখন এই প্রাণীটি প্রথম দৃষ্টিপথে এল, আমার নিজেরই সন্দেহ হয়েছিল—আমি প্রকৃতিস্থ কি না,—বা অন্ততপক্ষে আমার নিজের চোখই ঠিক দেখছে কি না,—এবং আমি পাগল হয়ে যাইনি বা স্বপ্নের ঘোরে নেই—এটা নিজেকে বোঝাতেই আমার বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। তবুও আমি যখন দৈত্যটির বর্ণনা দিই (যা আমি স্পষ্টই দেখেছিলাম, এবং শান্তভাবে যার সমস্ত গতিবিধি লক্ষ্য করেছিলাম) তখন আমার সন্দেহ হয়, আমার নিজেকে এই সমস্ত বিষয় বোঝাতে যা বেগ পেতে হয়েছে, তার চেয়ে যারা শুনছে, তাদের এই বিষয় বুঝে উঠতে অনেক বেশি কষ্ট হবে।

"যে সমস্ত বড় বড় গাছের গা-ঘেঁষে দৈত্যটা চলে গেল তাদের ব্যাসের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে দৈত্যটির আকার পরিমাপ করতে গিয়ে আমি এই সিদ্ধান্তে এলাম যে, এটা আজকের বৃহদাকার জাহাজের চেয়েও বেশ বড়। জাহাজের উপমাটি টানলাম এই কারণে যে, দৈত্যটির আকারই আমার মনে ঐ ধারণার সৃষ্টি করেছিল—আমাদের চুয়াত্তরটির একটির কাঠামো ওর সাধারণ আকারের একটা মোটামুটি ধারণা দিতে পারে। প্রায় ষাট-সত্তর ফুট দীর্ঘ শুঁড়ের প্রান্তে ছিল জন্তুটির মুখ এবং মুখটি ছিল সাধারণ হাতীর দেহের মতই পুরু। শুঁড়ের মূলে ছিল ঘনকৃষ্ণ প্রভূত লোমশ কেশগুচ্ছ...এবং কেশগুচ্ছ থেকে নিচের দিকে এবং দুপাশে বেরিয়ে ছিল, দুটো উজ্জ্বল দাঁত। দাঁত দুটি বন্য শূকরের মত দেখতে হলেও, আকারে বহুগুণ বড় ছিল। শুঁড়ের সঙ্গে সমান্তরালভাবে সামনে বিস্তৃত এবং ওর দুপাশে প্রায় তিরিশ-চল্লিশ ফুট দীর্ঘ মস্ত এক দণ্ড —মনে হয় খাঁটি স্ফটিকের তৈরী এবং আকারে নিখুঁত প্রিজমের মত। দণ্ডটি

অস্তগামী সূর্যের রশ্মি উজ্জ্বলভাবে বিকিরণ করছিল। শুঁড়টি মাটির সঙ্গে গোঁজের মত আটকানো ছিল। শুঁড়টা থেকে একজোড়া ডানা বেরিয়ে এসেছে—প্রতিটি ডানা দৈর্ঘ্যে প্রায় একশো গজ—একজোড়া আবার অপরটির উপর এবং সবগুলো ধাতব আঁশ দিয়ে ঘনভাবে আবৃত; প্রতিটি আঁশ আপাত দৃষ্টিতে দশ কি কুড়ি ফুট ব্যাসযুক্ত···কিন্তু এই ভয়ংকর বস্তুটির সবচেয়ে আশ্চর্য-জনক জিনিসটি হল ওর 'ডেথস হেড' বা মৃত্যুশির, যা প্রায় তার সমস্ত বক্ষ জুড়ে রয়েছে এবং কালো দেহটির উপর উজ্জ্বল শুভ্রবরণে নিখুঁতভাবে চিত্রিত। মনে হয় যেন কোনো শিল্পী যত্ন সহকারে ওটা ওখানে এঁকে দিয়েছে। যখন আমি প্রচণ্ড ভয়ে ঐ বিকট জন্তুটিকে, বিশেষ করে ওর বক্ষের উপরের আকারটি শ্রদ্ধার চোখে দেখছিলাম, আমি অনুভব করলাম তার শুঁড়ের দুই প্রান্তের দুটো মস্ত চোয়াল হঠাৎ প্রসারিত হল এবং তা থেকে এমন এক তীব্র-ভয়ংকর শব্দ বেরিয়ে এল যে ঘণ্টা ধ্বনির মত তা আমার স্নায়ুর উপর আছড়ে পড়ল এবং দৈত্যাকার জন্তুটি যখন পাহাড়ের পাদদেশে অদৃশ্য হয়ে গেল, আমি অমনি অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে পড়ে গেলাম।

"জ্ঞান ফিরে পাবার পর সর্বপ্রথম আমার চেষ্টা হল আমি কি দেখেছি বা কি শুনেছি তা আমার বন্ধুকে জানানো।···সে আদ্যপ্রান্ত সব শুনল—প্রথমটা প্রাণ খুলে খুব হেসে নিল···এবং তারপর খুব গম্ভীর হয়ে গেল, যেন আমি যে অপ্রকৃতিস্থ এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ। এই মুহূর্তে আমি আবার দৈত্যটিকে স্পষ্ট দেখলাম এবং প্রচণ্ড ভয়ে চীৎকার করে উঠে বন্ধুর মনোযোগ সেদিকে আকৃষ্ট করলাম। সে সাগ্রহে চেয়ে দেখল—কিন্তু জানাল সে কিছু দেখতে পায়নি——যদিও আমি পাহাড়টির গা-বেয়ে জন্তুটির নেমে যাওয়ার পুঙ্খাপুঙ্খ বিবরণ তুলে ধরেছিলাম।·· আমি চরম উত্তেজনায় নিজেকে চেয়ারের উপর নিক্ষেপ করলাম এবং কিছুক্ষণের জন্য মুখটিকে আপন হাতদুটোর মধ্যে ঢেকে রাখলাম। যখন চোখ খুললাম, বিকট মূর্তিটি আর দেখা গেল না।

"আমার অতিথি-সেবক দৃষ্ট জন্তুটির সম্বন্ধে আমায় অত্যন্ত খুঁটিয়ে প্রশ্ন করতে লাগল। আমি যখন এ বিষয়ে তাকে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট করলাম, সে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করল, যেন অসহ্য কোনো বোঝা থেকে মুক্তি পেয়েছে··· তারপর সে একটা বুক-কেসের কাছে এগিয়ে গেল এবং সাধারণ প্রাকৃতিক ইতিহাসের সারাংশের একটা গ্রন্থ নিয়ে এল। গ্রন্থটির সূক্ষ্ম মুদ্রণগুলো যাতে ভালোভাবে দেখতে পায় তার জন্য আমাকে আসন বদলানোর জন্য অনুরোধ করে সে আমার আর্মচেয়ারটা জানালার কাছে নিয়ে গেল এবং বইটা খুলে অনেকটা আগের মত কণ্ঠেই আবার আলোচনা শুরু করে দিল।

"তোমার ঐ পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা ছাড়া দৈত্যটি আদতে কি ছিল, তা

বোঝানো আমার সাধ্যে কুলাত না। প্রথমত, আমি গণ (genus) স্ফিংক্স্, বংশ ক্রেপ্সকুলারিয়া, বর্গ লেপিডোপটেরা, শ্রেণী ইনসেকটার বা পোকামাকড়-দের স্কুলপাঠ্য একটা বিবরণ তোমাকে পড়ে শোনাই। বিবরণটি এই রকম ঃ

" 'সামান্য রঙীন ধাতব চেহারার আঁশযুক্ত চারটি পর্দার পাখা ; মুখটা গোটান শুঁড়ের আকার নিয়েছে ; যে শুঁড় আবার চোয়ালের দীর্ঘায়ত রূপ থেকে সৃষ্ট ;

অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টতর পাখাগুলো উন্নততর পাখার সঙ্গে শক্ত চুল লম্বা দণ্ডের মত অ্যানটেনা দিয়ে সংযুক্ত। দণ্ডটি প্রিজমের মত। উদরটা ছুঁচল। মৃত্যু-শির বিশিষ্ট স্ফিংক্স্ অনেক সময় সাধারণ মানুষের মনে ওর উচ্চারিত বিষম কান্নার স্বরে এবং বহিরাবরণের উপরে পরিহিত মৃত্যুর তকমায় ভয়ঙ্কর ত্রাসের সঞ্চার করেছে।'

"এখানে এসে সে বইটা বন্ধ করল এবং চেয়ারের সামনের দিকে ঝুঁকে, দৈত্যটিকে দেখার সময় আমি যে স্থানটি দখল করেছিলাম, ঠিক সেই স্থানটি দখল করে বসল।

" 'আঃ, এই তো ওটা,' সে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল—'ওটা আবার পাহাড়ের গায়ে উঠছে এবং সত্যিই ওটা বড় অদ্ভুত ধরনের জীব। তবুও, ওটা তুমি যেমন মনে করেছিলে অত বড়ও নয়, অত দূরবর্তীও নয় ; কারণ ঘটনাটি হল···ওটা এই জাল বেয়ে উপরে উঠছে, যা কোনো মাকড়সা জানলার সার্সিটায় বুনে রেখে গেছে···' " (এই প্রজাপতি বর্তমানে অ্যাকেরনটিয়া বংশের সদস্য হিসেবে শ্রেণী-ভুক্ত হয়েছে। অল্প সংখ্যক প্রজাপতিদের মধ্যে এটি একটি যা শব্দ প্রেরণ করতে পারে······এ ক্ষেত্রে ইঁদুরের কিচ্ কিচ্ শব্দের মত তীক্ষ্ন স্বর এবং একমাত্র এ শ্রেণীর প্রজাপতিই মুখের ইন্দ্রিয় দিয়ে এই ধরনের ধ্বনির সৃষ্টি করে। শব্দটা একটু কর্কশ এবং বহু মিটার দূর থেকে শোনা যায়। এই বিশেষ ক্ষেত্রে, এটাকে খুব তীব্র মনে হতে পারে, যেহেতু দর্শক এর উৎস অনেক দূরে বলে মনে করেছে —'পদার্থবিদ্যার মজার কথা' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের দশম অধ্যায়ের 'আমাদের কান যে কারচুপি করে' দ্রষ্টব্য।)

অণুবীক্ষণ যন্ত্র প্রতিবিম্ব বিবর্ধিত করে কেন

এ প্রশ্নের উত্তরে পদার্থবিদ্যার পাঠ্যপুস্তকের বর্ণনা অনুসারে অনেকেই প্রায়ই বলেন, 'কারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্র বিশেষভাবে আলোকরশ্মির দিক পরিবর্তন করে দেয়।' কিন্তু এটা প্রকৃত কারণের কোনো সদুত্তর নয়। তাহলে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রকৃত পক্ষে কি কারণে প্রতিবিম্ব বিবর্ধিত করে ?

স্কুলে পড়ার সময় ঘটনাক্রমে উত্তরটি আমার শেখা হয়ে যায়। বন্ধ জানালার ধারে বসে আমি পথের ওপারের একটা ইঁটের তৈরী বাড়ির দিকে চেয়েছিলাম।

হঠাৎ আমি ভয়ে আঁৎকে উঠলাম। স্পষ্ট দেখতে পেলাম মস্ত বড় একটা চোখ, কয়েক মিটার চওড়া দেওয়াল থেকে আমার দিকে চেয়ে আছে। এড্‌গার অ্যালান পো-র গল্প তখনও আমি পড়ি নি এবং তৎক্ষণাৎ বুঝে উঠতে পারলাম না যে, ঐ মস্ত চোখটা দেওয়ালে আমারই চোখের প্রক্ষিপ্ত প্রতিবিম্ব। দেওয়ালে তারই ছায়া পড়েছে। সেইজন্যই আমি তদনুরূপ বড় মনে করছি।

শেষপর্যন্ত বিষয়টা যখন বুঝতে পারলাম তখন থেকেই আমার চিন্তা শুরু হয়ে গেল এই দৃষ্টিবিভ্রমকে ভিত্তি করে একটা অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি করা যায় না? ভাবনার মধ্যে যতই ত্রুটি থাক না কেন, এটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র প্রতিবিম্ব বিবর্ধিত করে কেন। বস্তুটি বৃহত্তর প্রতীয়মান হচ্ছে এই কারণে মোটেই নয়, এর কারণ অনেক বৃহত্তর বা বিস্তৃততর দৃষ্টিকোণ থেকে বস্তুটি দেখা হচ্ছে এবং এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, এর প্রতিবিম্ব অনেক বেশি অক্ষিপটের ক্ষেত্র দখল করে।

দৃষ্টিকোণ এত গুরুত্বপূর্ণ কেন—এই বিষয়টি তোমাদের বোধগম্য করে তোলার জন্য চোখের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করা যাক। প্রত্যেক বস্তু বা বস্তুর অংশ যা আমরা 1 মিনিটের কম দৃষ্টিকোণে দেখি তা বস্তুটির আকারগত বৈশিষ্ট্য বাদ দিয়ে আমাদের কাছে কেবল মাত্র একটা বিন্দু হিসেবে প্রতিভাত হয়। যখন কোনো বস্তু থাকে অনেক দূরে অথবা বস্তুটি এত ছোট যে একটা বা অংশ বিশেষ 1 মিঃ-এর কম দৃষ্টিকোণে প্রত্যক্ষ হয়, তখন আমরা এর পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপ ধরতে পারি না। এর কারণ এই দৃষ্টিকোণে বস্তুটির বা তার অংশের অক্ষিপটের প্রতিবিম্ব কেবল মাত্র একটি দৃষ্টিকক্ষ জুড়ে থাকে, ফলে আমরা একটি বিন্দুই দেখি, তার বেশি কিছু নয়।

অণুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রত্যক্ষ বস্তু থেকে আলোকরশ্মির দিক পরিবর্তন করে ওকে বৃহত্তর দৃষ্টিকোণে উপস্থাপিত করে। অক্ষিপটের প্রতিবিম্ব বেশি দৃষ্টিকক্ষ দখল করার জন্য ছড়িয়ে পড়ে ফলে আমাদের কাছে পূর্বে বিন্দু হিসেবে যা পর্যবসিত হয়েছিল তাকে আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পূর্ণতর অবয়বে প্রত্যক্ষ করি।

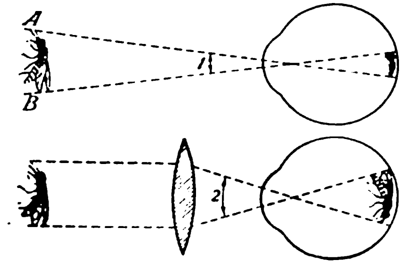
অণুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ক্ষমতা 100 বলতে আমরা বুঝি যে, ঐ যন্ত্র বস্তুকে সাধারণ অবস্থায় যন্ত্র ছাড়া আমরা যেমন দেখি তার থেকে 100 গুণ বর্ধিত করে দেখায়। যদি কোনো আলোকের যন্ত্র দৃষ্টিকোণ না বাড়ায়, তা হলে এটা কোনো বস্তুকে বিবর্ধিতই করবে না, আমরা একটা বিবর্ধিত বস্তু দেখছি এমনটি ভাবলেও। ইঁটের দেওয়ালে চোখটিকে বড় দেখেছিলাম, কিন্তু আয়নায় যেমন দেখি তার চেয়ে ওর অন্য কোনো বিশেষত্ব চোখে পড়ে নি। দিগন্তের কাছে যখন নেমে আসে তখন আমরা চাঁদকে, আকাশে যখন ওটা অনেক

উপরে থাকে তার চেয়ে অনেক বড় দেখি সত্য, কিন্তু এই অবস্থায় আকাশে অনেক উপরে থাকার চেয়ে আমরা রাত্রির চাঁদের বেশি কিছু দেখি না।

এড্গার অ্যালান পো-এর 'স্ফিংক্স্' নামক গল্পে বিবর্ধিত বস্তুর যে বর্ণনা পাই তাতে বিবর্ধিত বস্তুর কোনো বিশেষ বিশেষত্ব আমরা দেখতে পাই না। দৃষ্টিকোণের মান ওখানে একই থাকে এবং দৃষ্ট প্রজাপতিটি জানালার থেকে দূরেই থাক আর জানালার কাছেই থাক একই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা। আর ঐ দৃষ্টিকোণ একই থাকায়, বিবর্ধিত বস্তুটি যতই ভীতিপ্রদ হোক না কেন। একটিও বিশেষ নতুন তথ্য তুলে ধরে না। বিশ্বস্ত বাস্তববাদী হিসেবে এ বিষয়েও এডগার অ্যালান পো প্রকৃতির প্রতি নিষ্ঠাবান ছিলেন। আমার বিস্ময় জাগে অরণ্যের দৈত্যের বর্ণনা যেভাবে তিনি তুলে ধরেছেন তা লক্ষ্য করেছ কি! খালি চোখে দেখলে, মৃত মস্তকের কাছে যেমন ছিল, পোকামাকড়দের বিভিন্ন সদস্যের তালিকায় তার চেয়ে নতুন কিছু সংযোজিত হত না। বিনা কারণে যা তিনি সংযোজিত করেন নি, দুটো বর্ণনা তুলনা করে দেখ, দেখবে কেবল উপমার তফাৎ (দশ ফুট আঁশ—ছোট আঁশ, দৈত্যাকার দাঁত, শক্ত চুল, ইত্যাদি); নতুন কোনো বৈশিষ্ট্য নয়।

যদি অণুবীক্ষণ যন্ত্র শুধু এইভাবে কোনো বস্তুকে বিবর্ধিত করত তাহলে বিজ্ঞানীদের এটা কোনো প্রয়োজনেই আসত না; কৌতূহল উদ্দীপক খেলার সামগ্রী ছাড়া ওটা আর বেশি কিছু হত না। কিন্তু আমরা জানি এটা শুধুমাত্র তাই নয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্র কিন্তু এক নতুন পৃথিবী আমাদের কাছে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে আমাদের দৃষ্টির সীমানাগুলো।

চিত্র 128



লেন্স অক্ষিপটের প্রতিবিম্ব বিবর্ধিত করে।

এখন দেখা যাক, এডগার অ্যালান পো-র পর্যবেক্ষক তার দৈত্যাকার প্রজাপতির মধ্যে যা দেখতে পান নি, অণুবীক্ষণ যন্ত্র তা কেন উন্মুক্ত করে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র কেবলমাত্র বিবর্ধিত প্রতিবিম্বই গড়ে না, বস্তুটিকে বৃহত্তর

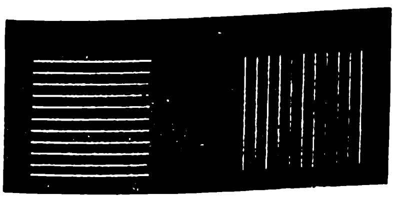
দৃষ্টিকোণে উপস্থাপিত করে। ফলে অক্ষিপটের প্রতিবিম্ব বৃহত্তর হয়, অনেক বেশি দৃষ্টিকক্ষ দখল করে এবং এইভাবে পৃথক পৃথকভাবে অনেক বেশি দৃষ্টির দাগ রাখে। সংক্ষেপে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র বস্তুকে বিবর্ধিত করে না, বিবর্ধিত করে অক্ষিপটের প্রতিবিম্বকে।

দৃষ্টির প্রবঞ্চনা

অনেক সময় আমরা বলি দর্শনেন্দ্রিয় আমাদের প্রবঞ্চনা করছে বা শ্রবণেন্দ্রিয় আমাদের প্রবঞ্চনা করছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার ইন্দ্রিয় কোনো প্রবঞ্চনা করে না। দার্শনিক কান্ট এই প্রসঙ্গে যথার্থই লক্ষ্য করেছেন ঃ "ইন্দ্রিয় আমাদের কোনো প্রবঞ্চনা করে না ; এর কারণ এই নয় যে, এরা সব সময় ঠিক মত বিচার করে ; এর কারণ এই যে, তারা কোনো বিচারই করে না।"

তাহলে আমাদের প্রবঞ্চনা করে কে ? স্বভাবতই যার হাতে বিচারের ভার—আমাদের গুরুমস্তিষ্ক। বস্তুতই আমরা অবচেতন মনে যা ভাবি তাই থেকেই সুবিচার বা অবিচারের জন্ম। আমাদের ইন্দ্রিয় প্রকৃত পক্ষে যা দেখে বা শোনে তা নয়, এই প্রবঞ্চনার উৎপত্তি হয় আমরা দেখছি বা শুনছি বলে যা ভাবি।

চিত্র 129



'কোনটা বেশি চওড়া, ডানদিকের চিত্র না বামদিকের চিত্র ?'

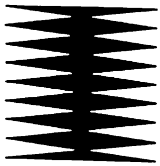
প্রায় দু হাজার বছর আগে লিউক্রেটিয়াস লিখেছিলেন ঃ

"আমাদের চোখ বস্তুর প্রকৃত প্রকৃতি দেখতে অক্ষম, সুতরাং তাদের উপর মনের প্রতারণা চাপিয়ে দিও না।"

দৃষ্টিবিভ্রমের একটা খুব পরিচিত দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। 129 নং চিত্রে বামদিকের ছবি ডানদিকের ছবির চেয়ে সরু মনে হয়, যদিও তারা একই বর্গক্ষেত্র দ্বারা সীমিত। এর কারণ বামপার্শ্বের চিত্রের উচ্চতা পরিমাপ করতে গিয়ে অবচেতন মনে রেখাগুলির মধ্যবর্তী ফাঁকগুলোকেও আমরা যোগ করে বসি। সেইজন্য এটাকে মনে হয় উচ্চতর, যদিও দুটোই সমান। একই কারণে ডান-

দিকের চিত্রের দিকে তাকালে মনে হয় এর উচ্চতার চেয়ে বিস্তার বেশি। একই কারণে 130 নং চিত্রটির বিস্তার-এর চেয়ে উচ্চতা বেশি মনে হয়।

চিত্র 130



কোনটা বড়—উচ্চতা না প্রস্থ ?

দৃষ্টিবিভ্রম যা দর্জিদের কাজে লাগে

অপেক্ষাকৃত বড় কোনো চিত্র দেখার সময় সদ্যবর্ণিত এই দৃষ্টিবিভ্রমকে যখন প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হয়, তখন আমাদের প্রত্যাশা কাজে আসে না। তোমরা সকলেই জান বেঁটে মোটা লোক যদি আনুভূমিকভাবে সরু ডোরা কাটা শার্ট পরে, তবে তাকে আরো মোটা লাগে। অপরপক্ষে ঐ লোকই যদি উল্লম্বভাবে সরু ডোরা কাটা শার্ট পরে, তাকে একটু রোগা লাগে।

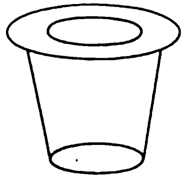
এই আপাত বৈষম্যের কারণ কি ? কারণ আমরা চোখ না সরিয়ে এক নজরে সমস্ত স্যুটটা দেখতে পাই না ; যখন আমরা তা করি, আমরা না জেনে দাগের উপর দিয়ে নজর চালিয়ে দিই। এই প্রক্রিয়ায় আমাদের চোখের পেশীসমূহ অবচেতনভাবে আমাদের বাধ্য করে ডোরা কাটা দাগগুলো যে দিকে গেছে সেই দিকে বস্তুটিকে বিবর্ধিত করতে, যেহেতু আমরা দৃষ্টিক্ষেত্রের পূর্ণ অন্তর্ভূত নয় এমন বৃহত্তর বস্তুসমূহের সঙ্গে দেখার চেষ্টাটা সংযুক্ত করতে অভ্যস্ত। অপরপক্ষে, আমরা যখন ছোট দাগকাটা চিত্রের দিকে তাকাই, আমাদের চোখ নড়ে না, এবং চোখের পেশীসমূহকে কোনো রকম তক্‌লিফ করতে হয় না।

কোন্‌টা বড় ?

131 নং চিত্রের কোন্ উপবৃত্তটি বড়—নিচেরটি না, উপরের ভেতরেরটা ? নিচেরটি সত্যিই বড় মনে হয় উপরেরটির চেয়ে, তাই না ? কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে দুটোই সমান। উপরের বাইরের উপবৃত্তের বেষ্টনীর জন্যই এই দৃষ্টিবিভ্রম। এই বিভ্রান্তি আরও বেড়ে যায় সমগ্র চিত্রটির জন্য—কারণ চ্যাপ্টা না হয়ে ওটা বালতির মত ত্রি-মাত্রিক আকার নিয়েছে। আমরা অবচেতন মনে উপবৃত্তকে

বৃত্ত হিসেবে এ'কে নিই সুবিধামত চাপ দিয়ে এবং পার্শ্বের সরলরেখাগুলো মনে করি বালতির গা-গুলো দেখানোর জন্য হেলানো।

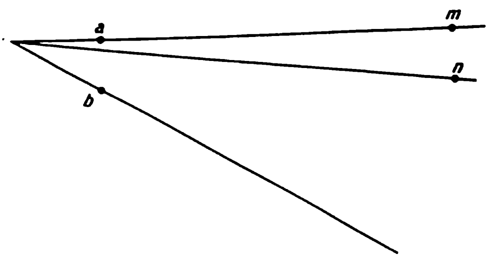
চিত্র 131



কোন উপবৃত্তটি বড় — ওপরের অন্তর্বর্তীটি না নিচেরটি?

132 নং চিত্রে *a* ও *b* বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে দূরত্ব, *m* ও *n* বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে দূরত্ব অপেক্ষা বড় মনে হয়। এর কারণ, একই শীর্ষবিন্দু থেকে উদ্ভূত তৃতীয় সরলরেখাটি।

চিত্র 132



কোন দূরত্বটি বড়, ab না mn?

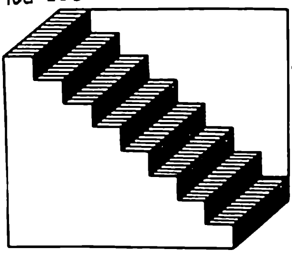
কল্পনা শক্তি

আমি যা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করে দেখেছি, দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে কেবল কি দেখছি তার উপর নয়, কি দেখছি বলে মনে করি তার উপরও। শারীরবিদরা বলে, "আমরা চোখ দিয়ে দেখি না দেখি মস্তিষ্ক দিয়ে।" দেখার সময় যে সব ক্ষেত্রে কল্পনা জাগ্রত ভূমিকা নেয় এমন কয়েকটি দৃষ্টিবিভ্রমের সঙ্গে পরিচিত হবার পর তোমরা নিশ্চয়ই এ বিষয়ে একমত হবে।

133 নং চিত্রটা দেখ। বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করলে, চিত্রটি সম্বন্ধে তারা তিন রকম উত্তর দেবে। কেউ বলবে সিঁড়ি, কেউ বলবে দেওয়ালের উপর কোনো কিছুর কারুকাজ, আবার অপর কেউ বলবে সাদা বর্গাকার কাগজের উপর হারমোনিয়ামের বেলোর মত এক ফালি কাগজ।

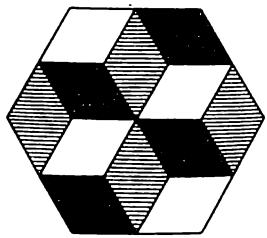
অদ্ভুত লাগলেও তিনটি উত্তরই ঠিক। বিভিন্ন ভাবে দেখলে, তোমাদেরও তিন রকম দৃষ্টিবিভ্রম ঘটবে। প্রথমে ছবিটির বাম অর্ধ দিকে দৃষ্টি দিলে

চিত্র 133



এটা কি : সিঁড়ি, কোন কারুকাজ না কার্নিসটির মত কোন ভাঁজ করা কাগজ ?

চিত্র 134



ঘনকগুলো কিভাবে সাজান ? কোথায় দুটো ঘনক পাশাপাশি আছে উপরে না নিচে ?

তুমি সিঁড়ি দেখবে। ছবিটির উপর দিয়ে ডান থেকে বাঁদিকে চোখটা ঘোরাও, মনে হবে কোনো কারুকাজ। তারপর ছবিটির গা-বেয়ে চোখটা ঘোরাও, কোনা-

চিত্র 135



কোনটা দীর্ঘতর, AB না AC ?

কুনিভাবে ডানদিকের নিচের থেকে উপরের বাঁদিকের কোণে, তুমি দেখবে ভাঁজ

করা কাগজ। ঘটনাক্রমে, অনেকক্ষণ ধরে দেখলে, তোমার মনোযোগ ছড়িয়ে পড়বে এবং পর্যায়ক্রমে তুমি প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছবি দেখবে, কি দেখতে চাও চিন্তা না করেই।

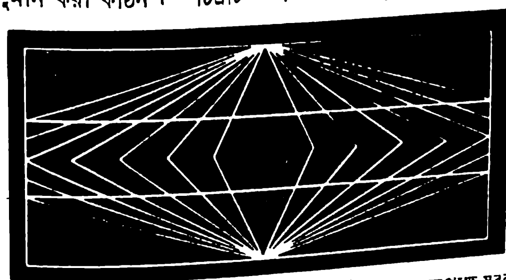
134 নং চিত্র একই ধারণা তুলে ধরে।

135 নং চিত্র যে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটায় তা আরও কৌতূহল উদ্দীপক। ভ্রান্তি-বশতঃ আমরা *AB*-কে *AC* অপেক্ষা ছোট দেখি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে *AB* ও *AC* সমান।

আরও দৃষ্টিবিভ্রমের উদাহরণ

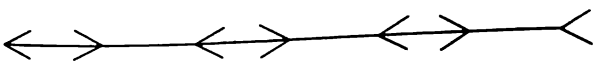
136 নং চিত্রে আমাদের মস্তিষ্ক অবচেতনভাবে কি রকম সিদ্ধান্তে আসবে সে সম্বন্ধে অনুমান করা কঠিন। চিত্রটি স্পষ্টভাবে দুটি বৃত্তের চাপ প্রদর্শন

চিত্র 136



ডানদিক থেকে বাম দিকে প্রসারিত মধ্যের দুটি রেখা প্রকৃতপক্ষে সরল সমান্তরাল রেখা যদিও দৃষ্টিবিভ্রমের দরুন তাদের বৃত্তচাপ বলে মনে হয়, যেন মধ্যভাগে পরস্পর মুখোমুখি স্ফীত হয়ে আছে। দৃষ্টিবিভ্রম কেটে যাবে যখন (1) তুমি চিত্রটিকে চক্ষুতল পর্যন্ত তুলে ধরবে এবং রেখা বরাবর তাকাবে বা যখন (2) তুমি পেনসিলের অগ্রভাগ চিত্রে কোন বিন্দুতে স্থাপন করবে এবং এই বিন্দুটির ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ করবে।

চিত্র 137

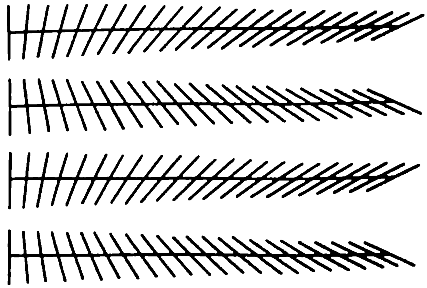


সরলরেখাটি কি ছয়টি সমান অংশে বিভক্ত?

করছে, তাদের স্ফীত অংশ দুটি পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে রয়েছে। বিশ্বাস করা কঠিন, একটা রুলার তাদের উপর রেখে বা চোখের উপর চিত্রটিকে ধরে লম্বালম্বিভাবে দেখে, যে ঐ বৃত্তের চাপদ্বয় সোজা সরল। এমন দৃষ্টিবিভ্রমের কারণ কি? সেটা ব্যাখ্যা করাও সহজ নয়।

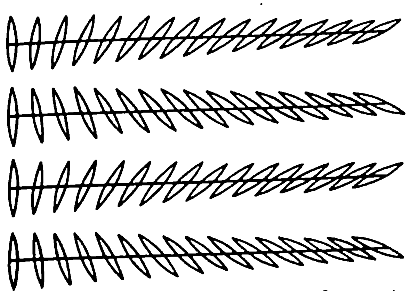
আবার 137 নং চিত্রের সরলরেখার 6টি অংশই পরস্পর সমান কিন্তু দৃষ্টি বিভ্রমের দরুন তাদের মনে হয় পরস্পর অসমান। মেপে দেখলেই বোঝা যাবে তারা পরস্পর সমান।

চিত্র 138



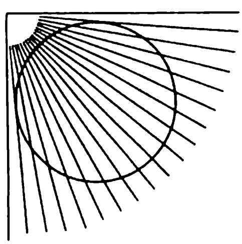
চিত্রের সমান্তরাল রেখাগুলোকে সমান্তরাল বলে মনে হয় না

চিত্র 139



পূর্বের চিত্রের মতই আর একটি দৃষ্টিবিভ্রমের চিত্র

চিত্র 140



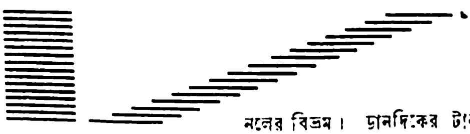
এটা কি বৃত্ত ?

138 এবং 139 চিত্রদ্বয়ের সরল-সমান্তরাল রেখাগুলি মনে হয় বাঁকা। 140 নং চিত্রের বৃত্তটিকে মনে হয় ডিম্বাকৃতি।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, 137, 138 এবং 139 নং চিত্র-ত্রয় আমাদের প্রবঞ্চিত করতে পারবে না যদি বৈদ্যুতিক ঝলকের আলোক দিয়ে আমরা ওদের দেখি। দৃষ্টিবিভ্রম যা ঘটছে তা আমাদের চোখের চলনের সঙ্গে জড়িত। চোখের এই সঞ্চলন হ্রাস পাবে বিদ্যুতের তাৎক্ষণিক ঝলকের সঙ্গে সঙ্গে।

'নল' নামে পরিচিত দৃষ্টিবিভ্রমের আর একটা উপভোগ্য উদাহরণ। 141 নং চিত্র দেখে বল তো কোন্ রেখাগুলো দীর্ঘতর? বাঁদিকের গুলো না,

চিত্র 141



নলের বিভ্রম। ডানদিকের টানগুলো বামদিকের টানগুলোর থেকে ছোট মনে হয়—যদিও তারা সমান।

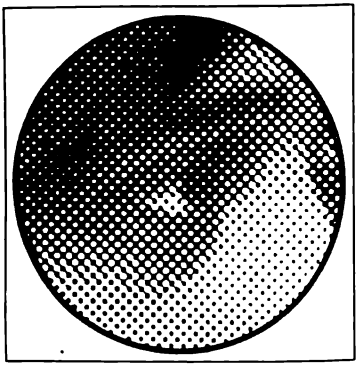
ডানদিকের গুলো? বাঁদিকের গুলোই দীর্ঘতর মনে হয়, যদিও প্রকৃত পক্ষে উভয় দিকের রেখাগুলো পরস্পর সমান। এরকম ভাবার অনেকগুলো কারণ দেখানো হয়েছে, কিন্তু কোনোটাই বিশেষ গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। তবে একটা জিনিস স্পষ্ট যে, এই দৃষ্টিবিভ্রম আমাদের অবচেতন মন থেকে উদ্ভূত যা আমাদের প্রকৃত পক্ষে যা দেখা উচিত তা থেকে আমাদের বঞ্চিত করছে।

এটা কি?

142 নং চিত্রের দিকে তাকালে কি মনে হয়? সম্ভবত তোমাদের মনে হবে কালো গোলাকার একটা জবরজং ছবি। কিন্তু টেবিলের উপর খাড়াভাবে বইটা রেখে, তিন-চার পা পিছিয়ে এসে দেখলে, দেখা যাবে ছবিটা একটা মানুষের চোখের ছবি। আবার খুব কাছে খুব তাড়াতাড়ি ছবিটা নিয়ে এস দেখবে কালো কদাকার গোলাকার বস্তু। তোমাদের মনে হতে পারে এটা কোনো কুশলী খোদাইকারের শিল্প-কৌশল, হাফ্-টোন ছবিতে আমাদের সব সময় যে ধরনের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে এটা তারই একটা স্থূল উদাহরণ। পত্র-পত্রিকা-পুস্তক এরকম নীরেট পশ্চাৎপট তুলে ধরে কিন্তু বিবর্ধক কাচের সামনে ধরলে তোমাদের চোখে 142 নং চিত্রের মতই বিন্দুসমূহের নক্শা চোখে পড়বে। সাধারণ পুস্তকের দশগুণ বিবর্ধিত চিত্র মস্তিষ্ক বিরক্তকারীর অংশ। গেজগুলো যখন সূক্ষ্ম তখন বই পড়ার সময় আমরা সাধারণত যে দূরত্বে বই ধরি সেই দূরত্বে চিত্রের নিরেট পশ্চাদপট একাকার হয়ে যাবে। কিন্তু গেজগুলো যখন মোটা তখন কেবলমাত্র

অধিকতর দূরত্বেই চিত্রটি একটি নিরেট পশ্চাৎপটে মিশে যাবে। ছবিটা ঠিকমত অনুধাবন করার জন্য শুধু দৃষ্টিকোণের বিবরটা সম্বন্ধে আমি যে সব কথা বলেছি তা মনে রাখা দরকার।

চিত্র 142



একটু দূর থেকে দেখলে, দেখবে একটি মেয়ের মুখের চোখ ও নাকের কিছু অংশ তার দিকে ফিরে তাকিয়ে আছে।

অসাধারণ চাকা

কোনো বেড়ার ফাটল দিয়ে বা আরও ভালভাবে বলা যায়, চলচ্চিত্রের পর্দায় দ্রুতগামী কোনো গাড়ি বা মটর-গাড়ির চাকার স্পোকগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখেছ কি? মটর গাড়ি যাচ্ছে, কিন্তু ওর চাকাগুলো মনে হবে নড়ছেই না। কখন কখন এমনও মনে হতে পারে যে, চাকাগুলো উল্টো দিকে ঘুরছে। এক্ষেত্রে দৃষ্টিবিভ্রম এতই অদ্ভুত যে, প্রথম দর্শনে এটা সবাইকে খুবই বিব্রত করবে।

কারণটা হল এই: বেড়ার ফাটল দিয়ে দেখার সময় তুমি এর স্পোকগুলো নিরবিচ্ছিন্নভাবে দেখছ না, দেখছ নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর, যেহেতু বেড়াটা সবগুলো দেখার পথে বাধার সৃষ্টি করছে। অনুরূপভাবে চলচ্চিত্র 24টি করে ফ্রেম সেকেণ্ডে দেখায়। এটা তিনটি বিভিন্ন ঘটনা ঘটাতে পারে, যেগুলো আমরা একের পর এক আলোচনার জন্য অগ্রসর হচ্ছি।

প্রথম ক্ষেত্রে, প্রথম সময়ান্তরে চাকা কতকগুলো পূর্ণ আবর্তন করে, সে দুটোই হোক আর কুড়িটাই হোক—তাতে কিছু যায় আসে না। এক্ষেত্রে, চাকার স্পোকগুলো পরবর্তী ফ্রেমেও আগেরটির মতই একই অবস্থানে থাকবে। পরের সময়ান্তরে চাকা আবার একই সংখ্যক পূর্ণ আবর্তন করবে এবং স্পোক-গুলো একই অবস্থানে থাকবে (সময়ের অন্তর ও গাড়ির গতিবেগ একই হওয়ায়)

আমরা যেহেতু স্পোকগুলোকে একই অবস্থানে দেখি, আমরা এই সিদ্ধান্তে আসি যে চাকা ঘুরছেই না (143 নং চিত্রের মাঝের কলম)

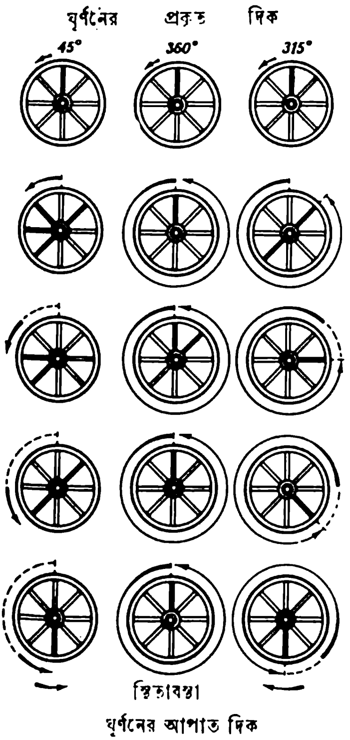
দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, চাকা প্রতি সময়ান্তরে কিছু সংখ্যক পূর্ণ আবর্তন এবং এক পূর্ণ আবর্তনের কিছু অংশ আবর্তন করে। আমরা যখন প্রতিবিম্বের সারির দিকে লক্ষ্য করি, আমরা সম্পূর্ণ সংখ্যক আবর্তন দেখি না, প্রতি সময়ে দেখি কেবল ধীরে চাকাটির আবর্তন—পূর্ণ আবর্তনের সামান্য এক ভগ্নাংশ মাত্র। ফলে আমরা সিদ্ধান্ত করে বসি, চাকা ধীরে ধীরে আবর্তন করছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মটর গাড়ি হয়ত খুব দ্রুতই ঘুরছে।

তৃতীয় ক্ষেত্রে, চাকা এক অসম্পূর্ণ আবর্তন করছে দুটি ফ্রেমের মধ্যবর্তী সময়ান্তরে—একটি সম্পূর্ণ আবর্তনের সামান্য ভগ্নাংশমাত্র কম (315°, যেমন 143 নং চিত্রের তৃতীয় কলমে দেখনো হয়েছে)। এক্ষেত্রে চাকার স্পোকগুলো মনে হবে বিপরীত দিকে ঘুরছে—চাকাটি দ্রুততর বা আরও ধীরে না নড়লে যে দৃষ্টিবিভ্রম থাকবে।

আর সামান্যই বলা প্রয়োজন। প্রথম ক্ষেত্রে, সরলতার খাতিরে আমরা কয়েকটি পূর্ণ আবর্তন দিয়েছিলাম। কিন্তু চাকার স্পোকগুলি একই রকম দেখতে, চাকাকে স্পোকগুলোর মধ্যে পূর্ণসংখ্যক বৃত্তাংশ আবর্তন করলেই হবে অপর দুই ক্ষেত্রেও এটা সত্য।

আরও উৎসাহ-উদ্দীপক নিম্নলিখিত বিষয়গুলো। চাকার রিমের উপর কোনো স্থলে যদি দাগ দিয়ে নেওয়া যায়, আমরা দেখব রিম একদিকে ঘুরছে আর স্পোকগুলো যা সবগুলোই একই রকম দেখতে বিপরীত দিকে ঘুরছে। যদি কোনো স্পোকের উপর দাগ দিয়ে নেওয়া

চিত্র 143



চলচ্চিত্রের পর্দায় চাকার রহস্যজনক গতির চাবিকাঠি

16-0407

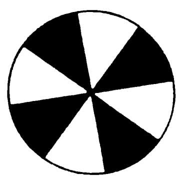
হয়, আমরা দেখব দাগের বিপরীত দিকে স্পোকগুলো ঘুরছে। দাগটা মনে হবে স্পোক থেকে সরে যাচ্ছে।

চলচ্চিত্রে কোনো বিষয়ের ছবি বা সংবাদ-বিচিত্রা দেখার সময় এটা হয়ত তোমাকে বিব্রত করবে না। কিন্তু চলচ্চিত্রের প্রযোজক যদি কোনো যন্ত্রের কাজ কিভাবে হয় তা এই দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেন তাহলে আলোকের এই বিভ্রান্তি যথেষ্ট ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করবে। সময় সময় যন্ত্র প্রকৃত পক্ষে কিভাবে কাজ করে সে সম্বন্ধে বিকৃত ধারণারও সৃষ্টি করতে পারে।

মনযোগী সিনেমার-দর্শক একটা চাকা সেকেণ্ডে কতবার ঘুরছে তা স্পোকগুলো গণনা করে বলে দিতে পারে। সিনেমার প্রক্ষেপণের গতিবেগ সাধারণত সেকেণ্ডে 24টি ফ্রেম। 12টি স্পোক সম্বলিত চাকার ক্ষেত্রে আবর্তনের সংখ্যা হবে $24 : 12 = 2$ অথবা প্রতি অর্ধ সেকেন্ডে এক পূর্ণ আবর্তন। এটাই লঘিষ্ঠতম আবর্তন সংখ্যা। এটা পূর্ণসংখ্যক আবর্তন সংখ্যায় বৃহত্তর হতে পারে—দ্বিগুণ, তিনগুণ, প্রভৃতি। চাকার ব্যাস পরিমাপ করে আমরা এমন কি গাড়িটিও কত দ্রুতবেগে চলছে তাও হিসেব করতে পারি। 80 সে.মি. ব্যাস হলে, গাড়ির গতিবেগ হবে গড়ে ঘণ্টায় 18 কি.মি. বা 36 কি.মি. বা 54 কি.মি.…ইত্যাদি।

ইঞ্জিনীয়াররা দ্রুত আবর্তনশীল দণ্ডের (shaft) আবর্তন সংখ্যা গণনার জন্য আলোকের এই বিভ্রান্তির সুযোগ নেন। তারা এইভাবে এটা করেন।

চিত্র 144



ইঞ্জিনের আবর্তন-গতি নির্ণয়ের জন্য যে ডিস্ক ব্যবহার করা হয়।

এ.সি. কারেন্টে বাতির প্রভার দীপ্তি সবসময় সমান থাকে না। সেকেণ্ডের প্রতি 100 ভাগের এক ভাগ সময় অন্তর অন্তর আলোকের দীপ্তি কমে আসে, যদিও এই মিটি মিটি ভাব আমরা সাধারণত লক্ষ্য করি না। এখন মনে কর 144 নং চিত্রের ঘূর্ণায়মান ডিস্কটি অনুরূপ একটি বাল্ব দ্বারা আলোকিত করা হয়েছে। মনে করা যাক ডিস্কটি সেকেণ্ডের একশ ভাগের এক ভাগ সময়ে $\frac{1}{6}$ ভাগ আবর্তন করছে। আমরা দেখব সম ধূসর বর্ণের বৃত্তের পরিবর্তে কালো এবং সাদা বৃত্তাংশ, যেন ডিস্কটি স্থিতিশীল। চাকার দৃষ্টিবিভ্রমের ব্যাপারটা যারা

বুঝতে পেরেছে তারা এটাও বুঝতে পারবে। এবং বুঝতে পারবে আবর্তনশীল দণ্ডের আবর্তন সংখ্যা গণনার ক্ষেত্রে এটা কিভাবে ব্যবহার করা যায়।

প্রযুক্তিবিদ্যায় 'ধীর-গতিশীল অণুবীক্ষণ যন্ত্র'

পদার্থবিদ্যার মজার কথা-র প্রথম খণ্ডে আমি ধীর-গতি ক্যামেরার কথা বলেছি। ইতিপূর্বে বর্ণিত ঘটনার ভিত্তিতে একই ফল লাভ করা যায়। 144 নং চিত্রের ডিস্কটি সেকেণ্ডে 25 বার যদি আবর্তন করে এবং প্রতি সেকেণ্ডে যদি 100টা ফ্লাশ দ্বারা আলোকিত হয় তাহলে ডিস্কটি মনে হবে স্থিতিশীল। এখন মনে করা যাক, সেকেণ্ডে 100-র পরিবর্তে 101টা ফ্লাশ হচ্ছে। তাহলে দুটি পর পর ফ্লাশের মধ্যবর্তী সময়ে ডিস্কটি পূর্বের মত অংশ ঘুরবে না এবং ফলে সংশ্লিষ্ট বৃত্তাংশ তার প্রাথমিক অবস্থায় পেঁছবে না। বৃত্তের পরিধির একশ ভাগের এক ভাগ মত অংশ পশ্চাতে পড়ে থাকবে। পরবর্তী ফ্লাশে ডিস্কটি আরও একশ ভাগের এক ভাগ পেছনে পড়বে ইত্যাদি। ডিস্কটি মনে হবে প্রতি সেকেণ্ডে পূর্ণ একটি আবর্তন করে পেছনে যাচ্ছে। এইভাবে গতি 25 গুণ হ্রাস পাবে।

এবার পেছনে নয় সামনে কিভাবে ধীর-গতি সম্পন্ন অনুরূপ আবর্তন সম্ভব তা অনুধাবন করা মোটেই কঠিন নয়। তা করতে হলে, ফ্লাশের সংখ্যা বৃদ্ধি করার পরিবর্তে হ্রাস করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ প্রতি সেকেণ্ডে 99টি ফ্লাশে সেকেণ্ডে পূর্ণ এক আবর্তন করে ডিস্কটি মনে হবে সামনে যাবে।

এরূপ অবস্থায় আমরা একে বলতে পারি, 'ধীর-গতি সম্পন্ন অণুবীক্ষণ যন্ত্র' যার সময় হ্রাস করার ক্ষমতা 25। আমরা এই গতিকে আরও হ্রাস করতে পারি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রতি দশ সেকেণ্ডে যদি 999 ফ্লাশ বা প্রতি সেকেণ্ডে 99·9টি ফ্লাশ দেওয়া যায়, তাহলে আমাদের ডিস্ক মনে হবে প্রতি দশ সেকেণ্ডে একবার আবর্তন করছে। তখন আমাদের সময় কমানোর শক্তি হবে 250।

কোনো দ্রুত, নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর ঘূর্ণায়মান গতি প্রয়োজন অনুসারে কমানো যেতে পারে। খুব দ্রুত যান্ত্রিক ক্ষমতার গতির বিশেষ বিশেষ দিক পর্যালোচনা করার জন্য এটা একটা সহজলভ্য প্রক্রিয়া।*

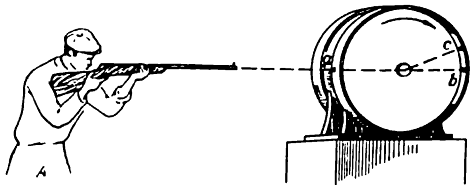
পরিশেষে, ধাবমান বন্দুকের গুলির গতিবেগ কিভাবে পরিমাপ করা হয়, সে সম্বন্ধে আলোচনা করব। একটি ঘূর্ণায়মান ডিস্ক পূর্ণসংখ্যক কতগুলো আবর্তন করে তা নির্ণয়ের সম্ভাব্যতার উপর ভিত্তি করেই এটা করা হয়। একটা কার্ডবোর্ড ড্রাম (145 নং চিত্র) দ্রুত আবর্তনশীল দণ্ডের উপর রাখা

---

* সদ্য আলোচিত পদ্ধতিটি স্ট্রোবোস্কোপ-এর, যার সাহায্যে দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়ার গুণাঙ্ক নির্ণয় করা হয়। এটা অত্যন্ত নির্ভুলতার সঙ্গে কাজ করে—দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ইলেকট্রনিক স্ট্রোবোস্কোপ-এর মাত্র 0·001 শতাংশ ভুল হতে পারে।—সম্পাদক।

হয়। বন্দুকধারী বন্দুক ছুঁড়ে বুলেটের সাহায্য ড্রামের দেওয়াল ড্রামের ব্যাস বরাবর এ ফোঁড়-ও ফোঁড় করে। ড্রামটা যদি স্থিতিশীল হত, তাহ'লে বুলেটের গর্ত একই ব্যাস বরাবর দু'দিকে হ'ত। কিন্তু ড্রামটা আবর্তনশীল.

চিত্র 145



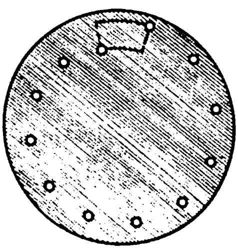
ধাবমান বুলেটের গতি কিভাবে পরিমাপ করা হয়।

তাই বুলেট একদিকে ফুঁড়ে অন্যদিকে যাবার সময় *b* বিন্দুর পরিবর্তে *c* বিন্দুতে আঘাত করবে। ড্রামের আবর্তন-সংখ্যা ও ব্যাস জানা থাকলে, আমরা *bc* চাপের মানের উপর ভিত্তি করে বুলেটের গতি নির্ণয় করতে পারি। গণিতের সামান্য জ্ঞান থাকলেই জ্যামিতিক দিক থেকে এই প্রশ্নের সমাধান সহজসাধ্য।

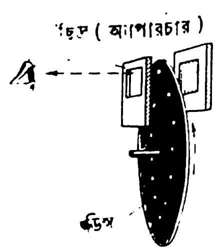
দি নিপ্‌কভ্ ডিস্ক

প্রথম টেলিভিশন সেটে ব্যবহৃত তথাকথিত নিপ্‌কভ্ ডিস্ক আলোকের ভ্রান্তির যান্ত্রিক দিক থেকে প্রয়োগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 146 নং চিত্র এরকম

চিত্র 146



চিত্র 147

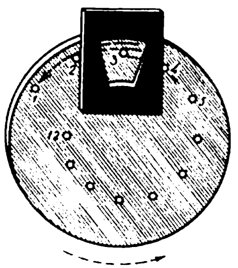


একটা ডিস্ক যার গায়ের প্রান্তদেশে এক ডজন কি তারও বেশি 2 মি.মি. ব্যাস বিশিষ্ট ছিদ্র আছে। বাইরের প্রান্তের এক পাকানো পথে প্রতি ছিদ্র এর অগ্রবর্তী

আগের প্রতিবেশী ছিদ্রটির চেয়ে কেন্দ্রের 2 মি.মি. নিকবর্তী। এখন একটা দণ্ডের উপর ওটা রেখে, ডিস্কের সামনে একটা ছোট জানালা বসিয়ে পশ্চাতেও অনুরূপাকারে একটা ছবি রাখ (149 নং চিত্র)। এবার ডিস্কটিকে দ্রুত ঘোরাও। যে ছবিটি, এতক্ষণ ডিস্ক থাকায়, দৃষ্টির আড়ালে ছিল তা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে ও দেখা যাবে। ডিস্কটি যত ধীর-গতি সম্পন্ন হবে ছবিটা তত ঝাপসা হয়ে আসবে, তারপর ডিস্কটা থামার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাবে। এখন ততটুকুই ছবি দেখবে যা ছোট্ট 2 মি.মি. ছিদ্র দিয়ে করা সম্ভব।

এই রহস্যজনক ডিস্কের চাবিকাঠিটি কি? ডিস্কটি ধীরে ধীরে ঘোরানো যাক আর প্রতিটি পর পর ছিদ্র জানালার পথে চলে যাবার সময় লক্ষ্য করা যাক। কেন্দ্র থেকে সবচেয়ে দূরের ছিদ্রটি জানালার উপরের রিমের কাছ দিয়ে যাবে। দ্রুত যাবার সময়, ছবির উপরের প্রান্তে ও একটা সম্পূর্ণ পাড় বা ফালি দৃষ্টি-পথে তুলে ধরবে। পরবর্তী ছিদ্রটি, যা প্রথমটির ঠিক নিচে আছে, দ্রুত যাবার পথে অনুরূপ একটা ফালি প্রথমটির নিচে তুলে ধরবে, তৃতীয়টি অনুরূপভাবে ঠিক ওর নিচে, এবং এইভাবে পর পর সবগুলো। যখন ডিস্কটিকে খুব দ্রুত ঘোরানো হয়, আমরা সম্পূর্ণ ছবিটাই দেখি। আমাদের জানালার বিপরীত দিকে ডিস্কের মধ্যেই, মনে হয়, একই আকারের অন্য একটি অ্যাপারচার।

চিত্র 148



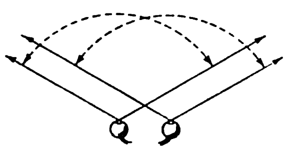
এই রকম ডিস্ক খুব সহজেই তৈরি করা যায়। একে ঘোরানোর জন্য দণ্ডের সঙ্গে একটা তার জড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে। সবচেয়ে ভালো হয় যদি একটা ছোট বৈদ্যুতিক মোটরকে কাজে লাগানো হয়।

খরগোস পার্শ্বদৃষ্টি সম্পন্ন কেন ?

মানুষ সেই সব স্বল্প প্রাণিগোষ্ঠীর একটি যার চোখ জোড়া একই সঙ্গে একটি বস্তু দেখে। কেবল ডান চোখের দর্শনক্ষেত্র বাম চোখের দর্শনক্ষেত্রের

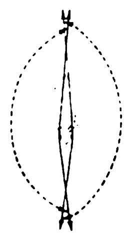
সঙ্গে ন্যূনতম মাত্রায় মিশে যায় না। অধিকাংশ প্রাণী কিন্তু প্রত্যেকটি চোখ দিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে দেখে। কিন্তু আমরা কোনো বস্তু একবারে দু'চোখ দিয়ে দেখে যে স্বস্তি পাই তারা তা পায় না। তবে এই সব প্রাণীর ক্ষেত্রে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি বিস্তৃত দর্শনক্ষেত্রের দ্বারা এটার ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়।

চিত্র 149



মানুষের চোখের দর্শন-ক্ষেত্র।

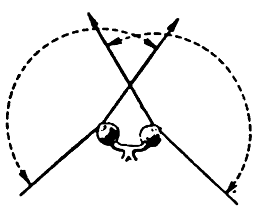
চিত্র 150



খরগোসের চোখের দর্শন-ক্ষেত্র।

149 নং চিত্রে মানুষের দর্শনক্ষেত্র দেখানো হয়েছে। প্রতিটি চোখ 120° কোণের মধ্যে অনুভূমিকভাবে সবকিছু দেখে এবং দু চোখের দুটি কোণই

চিত্র 151



ঘোড়ার চোখের দর্শন-ক্ষেত্র।

পরস্পর সমাপতিত হয়, যদি না অবশ্য চোখ দুটো নড়ে। এখন এই চিত্রের সঙ্গে 150 নং চিত্রের খরগোসের চোখের দর্শনক্ষেত্র তুলনা করা যাক। খরগোস মাথা না নাড়িয়ে তার আয়ত চোখ দুটি দিয়ে শুধুমাত্র সামনে নয় পেছনেও কি ঘটছে দেখতে পায়। দুটি চোখের দর্শনক্ষেত্র সংযুক্ত হয়, সামনে এবং পেছনে। এই কারণেই আহত না করে পেছন থেকে খরগোসকে ধরা কঠিন। বিপরীত

পক্ষে, চিত্র থেকে এটা স্পষ্ট যে, পাশে মাথা না ঘুরিয়ে নাকের ডগায় কি আছে তা খরগোসের চোখেই পড়ে না।

প্রায় সব খুর-যুক্ত ও জাবর-কাটা প্রাণীর এই চতুর্দিকের দৃষ্টি আছে। 151 নং চিত্রে ঘোড়ার দর্শনক্ষেত্র দেখানো হয়েছে। যদিও দর্শণক্ষেত্রদ্বয় পশ্চাতে মেশে না, তবু মাথা সামান্য নাড়িয়েই ঘোড়া পেছনের সব কিছু দেখতে পায়। যদিও দর্শন অনুভূতিটা খুব স্পষ্ট হয় না, তবুও তারা সামান্যতম নড়াচড়াও সনাক্ত করতে অসমর্থ হয় না। ক্ষিপ্র শিকারী প্রাণীদের এই চতুর্দিকের দৃষ্টির পরিবর্তে দ্বি-নেত্রিক দৃষ্টি থাকে। এর ফলেই তারা তাক-করার বা ছোঁ-মারার সঠিক দূরত্ব নির্ণয় করতে পারে।

আলো নিভলে সব বেড়ালকেই ধূসর দেখায় কেন?

পদার্থবিদ বলবেন, বাতি নিভলে সব বেড়ালই কালো, কারণ আলোর অভাবে সাধারণত কিছুই দেখা যায় না। এই প্রবাদ কিন্তু সম্পূর্ণ অন্ধকার বোঝায় না, বরং বোঝায় আলোকের অভাবে আমরা বর্ণ-বৈষম্য ধরতে পারি না এবং সব কিছুই আমাদের চোখে ধূসর বর্ণের দেখায়।

এটা কি প্রকৃত পক্ষে সত্য? একটা লাল পতাকা ও একটা সবুজ পাতা কি আধো অন্ধকারে ধূসর দেখাবে? তোমরা নিজেই এটা পরখ করে দেখতে পার। গোধূলিলগ্নে বর্ণ পরখ করার চেষ্টা করে দেখলে দেখবে, প্রতিটি বস্তুই অল্প-বিস্তর কালচে ধূসর ছোপ ধারণ করে—নিজের বর্ণ যাই হোক না কেন—তা সে লাল চাদরই হোক, নীল কাগজই হোক, বেগুনি ফুলই হোক বা সবুজ পত্রই হোক। চেকভ-এর 'দি লেটার' গল্পে আছে, "টেনে-দেওয়া খড়খড়িগুলো সূর্যালোক প্রবেশে বাধা দিচ্ছিল। এবং এটা ছিল আধো ছায়া। বিরাট সভাগৃহের সমস্ত গোলাপগুলোই মনে হচ্ছিল একই বর্ণের।"

বাস্তবের পরীক্ষা-নিরীক্ষায়ও এ পর্যবেক্ষণ সত্য প্রমাণিত হয়েছে। রঙিন কোনো তলের উপর যদি আবছা সাদা আলো ফেলা যায়, বা সাদা তলের উপর যদি ঈষৎ রঙিন আলো ফেলা যায় এবং তারপর ধীরে ধীরে বাতির শক্তি যদি বাড়ানো হয়, তাহলে প্রথমে দেখা যাবে কেবল ধূসর বর্ণ এবং অন্য কোনো বর্ণ নয়। বাতির ক্ষমতা ঘনীভূত হলে তবেই আমরা বর্ণ দেখতে পাই। বিজ্ঞানে একে বলা হয় বর্ণবোধের চরম চৌকাঠ।

সুতরাং নানা ভাষায় যে প্রবাদটি চালু আছে সেটা আক্ষরিকভাবে সত্য। কারণ বর্ণবোধের চৌকাঠের নিচে সবকিছুই ধূসর বর্ণের দেখায়।

বর্ণবোধের আর একটা পারাপারও আছে। যখন আলোক খুব উজ্জ্বল, চোখ বর্ণবিভেদ দেখতে পায় না এবং সব রঙিন তলই সাদা দেখায়।

শীতল আলোক রশ্মি বলে কিছু আছে কি ?

এমন কথা প্রায়ই শোনা যায় যে, আলোক রশ্মি যেমন উত্তাপ বহন করে, তেমন আলোক রশ্মি শৈত্যও বহন করে। একতাল বরফ, মনে হয়, স্টোভ যেমন উত্তাপ বিকিরণ করে, তেমন শৈত্য দান করে। তাহলে এটাই কি বোঝায় না যে, বরফ, স্টোভ যেমন উত্তাপ বিকিরণ করে, তেমন শৈত্য বিকিরণ করে ?

ধারণাটা সর্বৈব মিথ্যা। শৈত্যের রশ্মি বলে কিছুর অস্তিত্ব নেই। বরফের পাশে কোনো বস্তু শীতল হয় শৈত্য-রশ্মির জন্য নয়, উষ্ণ বস্তু বরফের কাছ থেকে যে উত্তাপ পায় তার চেয়ে অনেক বেশি উত্তাপ বিকিরণ করে বলে উষ্ণ বস্তু ও শীতল বস্তু উভয়ই উত্তাপ বিকিরণ করে। বরফের চেয়ে উষ্ণ কোনো বস্তু উত্তাপ যা পায় তার চেয়ে অনেক বেশি উত্তাপ ত্যাগ করে। যেহেতু যে উত্তাপ আসছে তা, যে উত্তাপ চলে যাচ্ছে তার চেয়ে কম, বস্তুটি ঠাণ্ডা হয়।

একটা ফলপ্রসূ পরীক্ষা আছে যা সত্যি সত্যি শৈত্য রশ্মি আছে বলে আমাদের ভাবতে প্রবৃত্ত করতে পারে। একটা লম্বা হল-ঘরে বড় বড় অবতল দর্পণ মুখোমুখি করে ঝোলানো। একটা দর্পণের ফোকাস (focus)-এ যদি একটা উচ্চ শক্তিসম্পন্ন তাপের উৎস ধরা যায় এটা যে রশ্মি বিকিরণ করবে তা এই দর্পণ থেকে প্রতিফলিত হয়ে দ্বিতীয় দর্পণে যাবে, যা আবার তা প্রতিফলিত করবে ; একটা কালো কাগজ এই ফোকাসে ধরলে তা তৎক্ষণাৎ অগ্নিশিখায় জ্বলে উঠবে। লৈখিকভাবে এটা তাপ-সংবাহক রশ্মির অস্তিত্ব প্রমাণ করে। কিন্তু আমরা যদি প্রথম দর্পণের ফোকাসে একতাল বরফ রাখি, তা হলে দ্বিতীয় দর্পণের ফোকাসে রক্ষিত তাপমান যন্ত্র তাপমাত্রার হ্রাস সূচিত করবে। তা হলে বরফ কি শৈত্য-রশ্মি ছড়ায় যা দর্পণ প্রতিফলিত করে এবং তাপমান যন্ত্রে সূচিত হয় ?

মোটেই না। এই রহস্যজনক 'শৈত্য-রশ্মি' যে বস্তুত অবাস্তব তাও বুঝিয়ে দেওয়া যায়। তাপ বিকিরণের জন্য তাপমান যন্ত্র তাপ গ্রহণ করার চেয়ে বরফকে বেশি উত্তাপ দেবে ; এই কারণেই তাপ হ্রাস পায়। তাহলে শৈত্য-রশ্মি বলে কিছু আছে এমন বিশ্বাস করার কারণ নেই। প্রকৃতিতেও এমন কিছুর অস্তিত্ব নেই। সকল রশ্মিই শোষক বস্তুকে শক্তি দান করে। ইত্যবসরে যে সকল বস্তু রশ্মি ছড়ায় তারা শীতল হয়ে পড়ে।

পরিচ্ছেদ 10

শব্দ । তরঙ্গ গতি

শব্দ ও বেতার-তরঙ্গ

শব্দের গতিবেগ আলোক তরঙ্গের গতিবেগের তুলনায় দশ লক্ষ গুণ কম। যেহেতু যে গতিবেগে বেতার-তরঙ্গ ধায় তা আলোকের দোলনের গতিবেগের সমান, তাই শব্দের গতিবেগ বেতার-সংকেতের চেয়ে দশ লক্ষ গুণ কম। এ থেকে আমরা অদ্ভুত এক সিদ্ধান্তে উপনীত হই। পিয়ানো-বাজিয়ের প্রথম স্বর-ধ্বনি কে প্রথম শুনবে—কনসার্ট হলে দশ মিটার দূরে উপবিষ্ট কোন শ্রোতা না, হল থেকে একশ কিলোমিটার দূরে উপবিষ্ট কোনো বেতার শ্রোতা? অদ্ভুত শোনালেও, বেতার-শ্রোতাই আগে শুনবে, যদিও সে দশ হাজার গুণ দূরে রয়েছে।

বস্তুত বেতার-তরঙ্গ 100 কি.মি. যায় $\frac{100}{300000}=\frac{1}{3000}$ সেকেণ্ডে। ইত্যবসরে শব্দ যায় দশ মিটার $\frac{10}{340}=\frac{1}{34}$ সেকেণ্ডে। তাহলে দেখা যাচ্ছে বেতারের সাহায্যে বাতাসের চেয়ে 100 গুণ দ্রুতবেগে শব্দকে প্রেরণ করা যায়।

শব্দ ও বুলেট

প্রোজেক্টাইলে বা উৎক্ষেপক যন্ত্রে জুল ভার্নের যাত্রীরা যখন চন্দ্রাভিযানে যাত্রা করে, শূন্যে যে ভয়ংকর বন্দুকের গর্জন হচ্ছে তারা শুনতে পায়নি। কিন্তু অন্যথা হওয়া সম্ভব ছিল না। যতই বধির-করে-দেওয়া হোক সে শব্দ, শব্দের গতিবেগ যা বাতাসে সাধারণত যেমন হয়, সেকেণ্ডে 340 মিটার, তা উৎক্ষেপক যন্ত্রের গতিবেগের তুলনায় অনেক কম। উৎক্ষেপণ যন্ত্রের গতিবেগ সেকেণ্ডে ছিল 11,000 মিটার। অতএব যন্ত্রটি শব্দ অপেক্ষা দ্রুতগামী হওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই যাত্রীরা বন্দুকের শব্দ শুনতে পায় নি।*

প্রকৃত উৎক্ষেপক যন্ত্র এবং বুলেটের ব্যাপারটা কি? তারা কি শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী? অথবা, বিপরীত পক্ষে শব্দ কি এদের চেয়ে দ্রুতগামী হয়ে মারণ উৎপেক্ষক থেকে এর শিকারকে সাবধান করে দেয়? আধুনিক রাইফেল বুলেটকে বাতাসে শব্দের গতির চেয়ে তিনগুণ গতিবেগ দেয়। বুলেটের এই গতিবেগ

---

* আধুনিক উড়োজাহাজ শব্দের চেয়েও অনেক বেশি দ্রুতগামী—সম্পাদক।

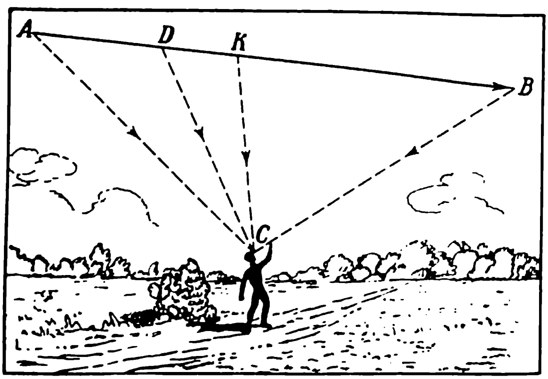
সেকেণ্ডে 900 মিটার (0°-তে শব্দের গতিবেগ সেকেণ্ডে 332 মিটার মাত্র তবে, এও ঠিক শব্দ সমবেগে বিস্তার লাভ করে আর বুলেটের গতিবেগ হ্রাস পায়। তা সত্ত্বেও তার সঞ্চারপথে বুলেট শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী হবে। তাই বন্দুকের শব্দ শুনলে বা বুলেটের শব্দ শুনলে তোমার দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নেই, বুঝতে হবে বুলেট ইতিমধ্যেই তোমায় অতিক্রম করে গেছে। শিকারকে বুলেট শিকারের কানে শব্দ পেঁছনোর আগেই আঘাত করবে।

ভুল বিস্ফোরণ

উড়ন্ত বস্তু ও তার শব্দের গতিবেগের পাল্লা অনেক সময় আমাদের সম্পূর্ণ ভুল সিদ্ধান্তে এনে হাজির করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উর্ধ্বে সঞ্চরণশীল কামানের গোলার কথা ভাবা যায়। যে সব অগ্নিপিণ্ড আমাদের বহির্লোক থেকে ভৌম বায়ুমণ্ডলে এসে পড়ে তাদের গতিবেগ শব্দের গতিবেগের প্রায় কয়েক ডজন গুণ যদিও বায়ুমণ্ডলের বাধায় ঐ গতিবেগ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

বাতাসের মধ্য দিয়ে আসার সময় ঐ সব অগ্নিপিণ্ড প্রায়ই এমন শব্দ করে যে, মনে হয় বজ্রের ধ্বনি। মনে করা যাক আমরা *C* বিন্দুতে আছি (চিত্র 152)।

চিত্র 152



অগ্নিপিণ্ডের কাল্পনিক বিস্ফোরণ

অনেক উর্ধ্বে একটা অগ্নিপিণ্ড *AB* প্রক্ষেপ পথে যাচ্ছে। *A* বিন্দুতে এটা যে শব্দ তুলবে তা *C* বিন্দুতে কানে পেঁছবে যখন অগ্নিপিণ্ডটি নিজে *B* বিন্দুতে পেঁছবে। যেহেতু অগ্নিপিণ্ড শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী, এটা কোনো *D* বিন্দুতে পেঁছতে পারে, যেখান থেকে আমরা এর শব্দ শুনব, *A* বিন্দুতে ওটা যে শব্দ করেছে তা শোনার আগে। সুতরাং আমরা *D* বিন্দু থেকে প্রথম শব্দ

শুনি এবং তারপর *A* বিন্দু থেকে শব্দ পাই। যেহেতু *B* বিন্দু থেকে শব্দও, আমাদের কাছে *D* বিন্দু থেকে শব্দের পরে পৌঁছয়, আমাদের ঊর্ধ্বে কোনো স্থানে, *K* বিন্দুতে, আমরা অগ্নিপিণ্ডের শব্দ অধিকতর আগে শুনব। অগ্নিপিণ্ডের গতিসমূহ ও শব্দের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারলে, গণিতপ্রিয় যে কেউ ঠিকমত অবস্থানটি সনাক্ত করতে পারবে।

ফলে আমরা যা শুনি আর আমরা যা দেখি তার মধ্যে কোনোক্রমেই সামঞ্জস্য হবে না। আমাদের দৃষ্টির সীমানায় অগ্নিপিণ্ডটি সর্বপ্রথম দেখা দেবে A বিন্দুতে যেখান থেকে এটা *AB* পথে অগ্রসর হবে। কিন্তু কানে অগ্নিপিণ্ডটি আমাদের উপরে কোনো স্থানে *K* বিন্দুতে প্রথমে মনে হবে। তারপর আমরা যুগপৎ দুটি শব্দ শুনব যারা পরস্পর বিপরীত মুখে *K* থেকে *A*-তে এবং *K* থেকে *B*-তে ক্ষীণতর হয়ে আসবে। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, অগ্নিপিণ্ডটি যেন দুটি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পরস্পরের বিপরীত দিকে চলেছে।

প্রকৃতপক্ষে কিন্তু কোনো বিস্ফোরণই ঘটে নি—তাহলেই বোঝ আমাদের শ্রুতি কত ত্রুটিপূর্ণ। এই শ্রুতি-বিভ্রম থেকেই, সম্ভবত, অনেক ঊর্ধ্বাকাশের অগ্নিপিণ্ডের বিস্ফোরণের 'প্রত্যক্ষদর্শীর' বিবরণের উদ্ভব হয়েছে।

যদি শব্দের গতিবেগ কম হত

শ্রুতিবিভ্রম বারে বারে ঘটত যদি বাতাসে শব্দের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে 340 মিটারের অনেক কম হত।

ধরা যাক, শব্দের গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে 340 মিটার না হয়ে 340 মিলিমিটার, যা মানুষের হাঁটার গতিবেগের চেয়েও কম। আরও ধরা যাক, চেয়ারে বসে তুমি এক বন্ধুর কাছে গল্প শুনছ। গল্প বলতে বলতে বন্ধু ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে। এতে কোনো বাধা হবে না। কিন্তু শব্দের গতিবেগ যদি খুবই কম হয়, তুমি বন্ধুর গল্পের মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝবে না। তাঁর প্রাথমিক উচ্চারণগুলো পরের উচ্চারণগুলোর সঙ্গে মিলেমিশে জট পাকিয়ে যাবে।

ঘটনাক্রমে, যখন তোমার বন্ধু এগিয়ে আসছে তাঁর স্বর তোমার কাছে উল্টোভাবে পৌঁছবে। প্রথমে তুমি তিনি এইমাত্র যা বললেন তাই শুনবে। তারপর একটু আগে যা বলেছেন, তারপর তারও আগে যা বলেছেন এবং তারপর আরও আগে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এমন ঘটবে, তার কারণ বন্ধু কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছেন এবং সব সময় যে শব্দ উচ্চারণ করলেন তার আগে আছেন।

সবচেয়ে ধীর কথাবার্তা

কিন্তু তুমি যদি সর্বদাই ভাব বাতাসে শব্দের প্রকৃত গতিবেগ সেকেণ্ডে এক কিলোমিটারের $\frac{1}{3}$ ভাগ, তাহলে তোমার মত পরিবর্তন করতে হবে। মনে কর

বৈদ্যুতিক টেলিফোনের পরিবর্তে বাষ্পীয় জলযানে ইঞ্জিন কক্ষের সঙ্গে কথা বলার জন্য স্কীপার যেমন ব্যবহার করেন সেইরকম 'স্পীকিং টিউব' দিয়ে মস্কো ও লেনিনগ্রাড যুক্ত। 650 কিলোমিটার দীর্ঘ এই রকম টিউবের এক প্রান্তে লেনিনগ্রাডে তুমি আছ আর তোমার বন্ধু আছে মস্কো প্রান্তে। তুমি একটা প্রশ্ন করে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছ। 5 মিনিট, 10 মিনিট, 15 মিনিট সময় চলে গেল কিন্তু তবু কোনো উত্তর নেই। তুমি ব্যস্ত হয়ে পড়লে এবং মনে করলে কিছু নিশ্চয়ই ঘটে গেছে। তোমার প্রশ্ন তখন পর্যন্ত মস্কোয় পেঁছয় নি। প্রশ্নটা অর্ধেক পথ গিয়েছে মাত্র। প্রায় 15 মিনিট সময় আরও বয়ে যাবে তোমার বন্ধু প্রশ্নটা শোনার আগে। কিন্তু যেহেতু তাঁর উত্তরও আবার ঐ অর্ধঘণ্টা সময় নেবে মস্কো থেকে লেনিনগ্রাডে আসতে, তুমি তোমার প্রশ্নের উত্তর পাবে একঘণ্টা পরে।

এটা যাচাই করা খুব সহজ। লেনিনগ্রাড থেকে মস্কো 650 কিলোমিটার। শব্দ যাচ্ছে ঘণ্টায় $\frac{1}{3}$ কিলোমিটার বেগে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এইভাবে কথা বললে এক ডজনের বেশি প্রশ্ন করা যাবে না।*

আগের দিনের সবচেয়ে দ্রুত শব্দ-প্রেরণ ব্যবস্থা

এক সময় ছিল, যখন এইভাবে শব্দ-প্রেরণ ব্যবস্থাই দ্রুততম ব্যবস্থা বলে মনে করা হত। একশ বছর আগেও কেউ বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ বা টেলিফোনের কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। কয়েক ঘণ্টা ধরে 650 কিলোমিটার দূরে যদি শব্দ প্রেরণ করা হত তাহলেও তাই মেনে নেওয়া হত আদর্শ প্রেরণ ব্যবস্থা বলে।

যখন জার প্রথম পলের অভিষেক হয় তখন, কথিত আছে, অভিষেকের খবর নিম্নলিখিতভাবে অভিষেক স্থান মস্কো থেকে উত্তরের রাজধানী সেণ্ট পিটার্স-বার্গে প্রেরণ করা হয়। দুই রাজধানীর মধ্যবর্তী পথের উপর 200 মিটার অন্তর অন্তর সৈন্য দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। গীর্জার ঘণ্টা যেই বাজল, সবচেয়ে নিকটবর্তী সৈন্যটি গুলি ছুঁড়ল। পরবর্তী সৈন্যটি ঐ গুলির আওয়াজ শোনামাত্রই গুলি ছুঁড়ল। তৃতীয় সৈন্যটিও অনুরূপভাবে গুলি ছুঁড়ল—ইত্যাদি। দেখা গেল, 650 কিলোমিটার দূরবর্তী সেণ্ট পিটার্সবার্গে এইভাবে খবরটা পেঁছাতে তিন ঘণ্টা সময় লেগে গেল।

মস্কো থেকে ঘণ্টার ধ্বনি যদি সরাসরি সেণ্ট পিটার্সবার্গে শোনা যেত, তাহলে এই শব্দ, যা আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি, উত্তরের রাজধানীতে অর্ধ ঘণ্টা

* গ্রন্থকার ইচ্ছে করেই দূরত্বের সঙ্গে সঙ্গে শব্দের ক্ষীণ হয়ে যাওয়ার বিষয়টা এড়িয়ে গেছেন। এইভাবে কথাবার্তাই বলা যাবে না যেহেতু টিউবের অপরপ্রান্তের বন্ধুটি তোমার কথা শুনতেই পাবে না।—সম্পাদক।

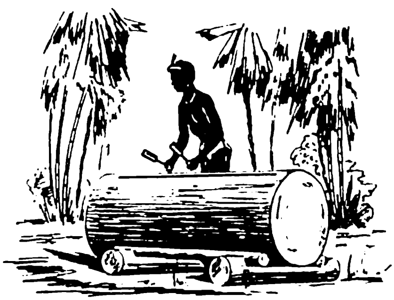
পরে পৌঁছত। এর অর্থ শব্দ প্রেরণের তিন ঘণ্টার মধ্যে আড়াই ঘণ্টাই অতিবাহিত হয়ে গেছে সৈন্যদের পূর্ববর্তী সৈন্যের গুলির শব্দ শোনা, প্রস্তুত হওয়া ও বন্দুক ছোঁড়ার জন্য। যত কমই হোক এই বিলম্ব, হাজার হাজার এই ক্ষুদ্র কালক্ষেপ সংযুক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে আড়াই ঘণ্টা।

প্রাচীন আলোকের টেলিগ্রাফ ব্যবস্থাও অনুরূপ নিয়মানুসারে গড়ে ওঠা। ঐ ব্যবস্থায় নিকটবর্তী দণ্ডে আলোক সংকেত পাঠানো হত, যা আবার পরবর্তী দণ্ডে পাঠাত এবং এইভাবে পরপর পাঠানো হত।

টম্-টম্ টেলিগ্রাফ

শব্দ সংকেতের সাহায্যে সংবাদ প্রেরণ আজও আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া এবং পোলিনেশিয়ার উপজাতিদের মধ্যে প্রচলিত আছে। এই উদ্দেশ্যে বিশেষ টম্-টম ব্যবহার করা হয় যা দূর-দূরান্তে শব্দ-সংকেত প্রেরণ করতে পারে। সংকেতটা 'রিলে' করার সময় পুনরাবৃত্তি করা হয় এবং অতি শীঘ্র একট বৃহৎ অঞ্চলের জনগণ খবরটা জানতে পারে।

চিত্র 153



জনৈক ফিজি অধিবাসী টম টম টেলিগ্রাফ ব্যবহার করছে।

আবিসিনিয়ার সঙ্গে ইতালী যখন যুদ্ধরত, নিগাসরা খুব শীঘ্রই ইতালী বাহিনীর গতিবিধি জেনে ফেলত। এটা ইতালীয়দের বিব্রত করে তোলে কারণ শত্রুদের টম্-টম্ সম্বন্ধে তাদের কোনো জ্ঞান ছিল না। ইতালী যখন আবার আবিসিনিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, আদ্দিস আবাবায় যে সৈন্য চলাচলের নির্দেশ দেওয়া হয় তা অনুরূপভাবেই জনগণকে জানান হয় এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সুদূর গ্রামে গ্রামে তা প্রেরণ করা হয়।

অ্যাংলো-বোয়ের যুদ্ধেও টম্-টম আবার ব্যবহার করা হয়। এই ব্যবস্থা কাফেরদের সামরিক সংবাদ খুব শীঘ্র প্রেরণে সহায়তা করে। অন্তরীপ বাহিনী সরকারীভাবে সংবাদ পাওয়ার কয়েকদিন আগেই সব কিছু জেনে ফেলত।

আবিষ্কারকেরা দাবি করেন যে, কোনো কোনো আফ্রিকার উপজাতিদের এইভাবে শব্দ-সংকেত প্রেরণের সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানের বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা চালু হবার আগে, ইউরোপের আলোক সংকেতের ব্যবস্থার চেয়ে এই ব্যবস্থা ছিল উন্নততর।

একটা পত্রিকায় টম্-টম্ টেলিগ্রাফ সম্বন্ধে পড়া গেছে। ব্রিটিশ যাদুঘরের প্রত্নতত্ত্ববিদ আর. হাসেলডন নাইজেরিয়ার মধ্যবর্তী ইবাদা শহর পরিদর্শন করছিলেন। টম্-টমের এক নাগাড়ে একঘেয়ে ধ্বনি-তরঙ্গের ছন্দ দিবারাত্রি শোনা যেত। একদিন সকালে বিজ্ঞানী শুনলেন নিগ্রোরা নিজেদের মধ্যে খুব পাখীর মত কিচ্ কিচ্ করছে। প্রশ্ন করে সার্জেন্টের কাছ থেকে জানলেন যে, শ্বেতাঙ্গদের একটা বড় জাহাজ ডুবে গেছে এবং বহু শ্বেতাঙ্গ মারা পড়েছে। হাসেলডেন প্রথমটা তাদের গুজবে কান দিলেন না। কিন্তু তিন দিন পরে তিনি লুসিতানিয়ার ধ্বংসের খবর পেলেন টেলিগ্রামে (বিপর্যস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য সংবাদ পৌঁছতে দেরি হয়েছিল)। কেবল তখনই তিনি বুঝতে পারলেন নিগ্রোদের গুজবটা সত্য এবং তারা নিজেদের খবর 'ড্রামের ভাষায়' কায়রো থেকে ইবাদায় প্রেরণ করেছে। এটা আরও বিস্ময়কর এই কারণে যে, যে উপজাতিরা সংবাদ প্রেরণ করেছিল তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষায় সংবাদ পাঠায় এবং কেউ কেউ এমন কি পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল।

শাব্দিক (Acoustic) মেঘ ও বায়বীয় প্রতিধ্বনি

শব্দ শুধু যে কঠিন বস্তুতে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে তাই নয়, আকাশের মেঘে প্রতিহত হয়েও ফিরে আসে। এমন কি একেবারে স্বচ্ছ বাতাসও কোনো কোনো ক্ষেত্রে শব্দ-তরঙ্গ প্রতিফলিত করতে পারে। এই রকম অবস্থায় কতিপয় কারণে বাতাসের অবশিষ্ট ভরের তুলনায় এই বাতাসের শব্দ বয়ে বেড়ানোর ক্ষমতাও ভিন্ন হয়। 'আলোকের পূর্ণ প্রতিফলন' বিষয়টি এই ব্যাপারে স্মরণীয়। শব্দ অদৃশ্য কোনো বাধার দ্বারা প্রতিসরিত হয় এবং আমরা রহস্যজনক এক প্রতিধ্বনি শুনি। এর উৎসও অজানা।

টিন্ডাল (Tyndall) এই অদ্ভুত ব্যাপার সমুদ্র তীরে শব্দ-সংকেত নিয়ে পরীক্ষা চালাতে গিয়ে দৈবক্রমে আবিষ্কার করেন।

"প্রতিধ্বনি আমাদের কাছে পৌঁছল," তিনি লিখলেন, "যেন যাদুবলে, অদৃশ্য শব্দময় মেঘপুঞ্জ থেকে যা দিয়ে আলোক-বিজ্ঞানসম্মত স্বচ্ছ বাতাস ছিল পূর্ণ।"

বিখ্যাত ব্রিটিশ পদার্থবিদ স্বচ্ছ বাতাসের সেই সমস্ত অঞ্চলকে শাব্দিক মেঘ বলে অভিহিত করেন যা শব্দ প্রতিফলিত করে এবং এইভাবে 'বায়বীয় প্রতিধ্বনি'-র সৃষ্টি করে। এই সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য হল ঃ

"শাব্দিক মেঘ, বস্তুতঃ বাতাসের মধ্য দিয়ে অবিরত ভেসে বেড়াচ্ছে বা উড়ে বেড়াচ্ছে। সাধারণ মেঘ বা কুয়াশা বা হিমের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। সবচেয়ে স্বচ্ছ বাতাস তার দ্বারা পূর্ণ হতে পারে। অসাধারণ আলোক বিজ্ঞান-সম্মত স্বচ্ছ দিনগুলোকে প্রায় সমগোত্রীয় শব্দ-বিজ্ঞানসম্মত স্বচ্ছ দিনে রূপান্তরিত করে……

"এই বায়বীয় প্রতিধ্বনির অস্তিত্ব পর্যবেক্ষণে এবং পরীক্ষায় ধরা পড়েছে এবং প্রমাণিত হয়েছে। তারা হয় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহ দ্বারা সৃষ্ট, না হয় ভিন্ন ভিন্ন বাষ্পদ্বারা সংপৃক্ত বায়ুপ্রবাহ দ্বারা সৃষ্ট।"

শব্দহীন শব্দ

ঝিঁঝিঁ পোকার শব্দ বা বাদুড়ের শব্দ অনেকে শুনতে পায় না। সাধারণভাবে বধির না হলেও এবং দোষমুক্ত শ্রবণেন্দ্রিয়ের অধিকারী হয়েও, তারা খুব তীক্ষ্ম শব্দ শুনতে পায় না। টিনডাল দাবি করেন যে, কোনো কোনো লোক চড়াই পাখীর কিচির মিচিরও শুনতে পায় না।

সাধারণভাবে আমাদের কান সামনের সমস্ত শব্দ-কম্পন ধরতে পারে না। শব্দের কম্পন প্রতি সেকেণ্ডে 16-র কম বা 15,000 থেকে 22,000-এর বেশি হলে আমরা কোনো শব্দ শুনতে পাই না। শ্রবণ ক্ষমতার চৌকাঠ বিভিন্ন লোকের পক্ষে বিভিন্ন, প্রতি সেকেণ্ডে বৃদ্ধের ক্ষেত্রে এত কম যে প্রায় 6,000-এর মত। তাইতো কর্কশ তীক্ষ্ম শব্দ কেউ স্পষ্ট শোনে, কেউ বা শোনে না।

মশা, ঝিঁঝি প্রভৃতি পোকামাকড় সেকেণ্ডে 20,000 কম্পনবিশিষ্ট তীক্ষ্ম শব্দ প্রেরণ করে, যা কারুর শ্রুতিগোচর হয়, কারুর বা হয় না। শান্ত নিরিবিলি পরিবেশ শেষোক্ত লোকের কাছে আরামদায়ক, আবার তীক্ষ্ম শব্দবিশিষ্ট পরিবেশ প্রথমোক্ত লোকের কাছে বেশি পছন্দসই। টিনডাল তাঁর বন্ধুর সঙ্গে সুইজারল্যাণ্ডে একবার বেড়ানোর সময় পর্যবেক্ষণ করেন ঃ

"আল্পস্-এর হিমবাহিকায়, বন্ধুর সঙ্গে পশ্চিমের আল্পস্ পার হবার সময় আমি একটা ঘটনা লক্ষ্য করি যেখানে শ্রুতির সীমানা খুব ছোট। পথের দু'-পাশের ঘাস পোকামাকড়ে ভর্তি ছিল, যাদের কর্কশ শব্দে বাতাস ভরে উঠেছিল। কিন্তু বন্ধুর কিছুই শ্রুতিগোচর হল না। পোকামাকড়দের গান তাঁর শ্রুতির সীমানার বাইরে ছিল।"

বাদুড়ের স্বর পোকামাকড়দের কর্কশ ধ্বনির পূর্ণ এক অষ্টক (Octave) নিচে, যেহেতু ওরা যে কম্পনের সৃষ্টি করে তার কম্পাঙ্ক সেকেণ্ডে মাত্র অর্ধেক। কিন্তু এমন লোকও আছে যাদের শ্রুতির সীমানা আরও কম এবং যাদের কাছে বাদুড়রা হল শব্দহীন প্রাণী। বিপরীত পক্ষে, বিখ্যাত সোভিয়েত অ্যাকাডেমি-

সিয়ান পাভলভ পরীক্ষা দ্বারা যেমন দেখিয়েছেন, কুকুরেরা সেকেণ্ডে স্বরের 38,000 কম্পন পর্যন্ত শোনে।

প্রযুক্তিবিদ্যায় শব্দোত্তর (Ultra sounds) **শব্দ**

আধুনিক পদার্থবিদরা এবং ইঞ্জিনীয়াররা 'শব্দহীন শব্দ' সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন যার কম্পাঙ্ক (Frequency) আমাদের উপরে বর্ণিত শব্দের কম্পাঙ্কের চেয়ে অনেক অনেক বেশি। 'শ্রুতিপারের শব্দ' (Ultra sounds)-এর কম্পন সেকেণ্ডে 100,000,000,000,000 পর্যন্ত হতে পারে।

শব্দোত্তর শব্দ-কম্পন সৃষ্টি পাইজোইলেকট্রিসিট (Piegoelectricity) প্রক্রিয়ায় বৈদ্যুতীকরণের জন্য কোয়ার্জ ক্রিস্টাল থেকে একভাবে পাত সংনমিত অবস্থায় কেটে নেওয়ার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এই ক্রিস্টাল পর্যায়ক্রম তড়িতের প্রভাবে একবার সংকুচিত ও একবার প্রসারিত হবে। অন্য কথায়, এই ক্রিস্টাল কম্পিত হবে এবং শব্দ সৃষ্টি করবে। এই ক্রিস্টালকে রেডিও-টিউব জেনারেটর দিয়ে নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কে তড়িতাহত করা হয় যাতে ক্রিস্টালের নিজস্ব কম্পনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা হয়।[১]

শব্দোত্তর শব্দ যদিও আমাদের শ্রুতিগোচর হয় না, এটা অন্যান্য নানাভাবে নিজেকে প্রকাশ করে। আমরা যদি একটা কম্পমান প্লেটকে তেলের জারে ডোবাই তেলের উপরিভাগে 10 সে.মি. মত 'কুঁজ' সৃষ্টি হবে, এই শব্দোত্তর শব্দের জন্য এবং তেলের ফোঁটাগুলো 40 সে.মি. উচ্চ পর্যন্ত উৎক্ষিপ্ত হবে। আবার আমরা যদি 1 মিটার দীর্ঘ কাচের দণ্ড এই তৈলাধারে ডোবাই, দণ্ড-ধৃত হাতটা খুব মারাত্মকভাবে পুড়ে যাবে। শব্দোত্তর শব্দের শক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ায় কম্পমান দণ্ডটির প্রান্ত কাঠকে ছিদ্র করে দেবে।

সোভিয়েত দেশের ও অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীরা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে শব্দোত্তর শব্দ নিয়ে পর্যবেক্ষণ চালাচ্ছেন। এই শব্দ সজীব প্রাণীদের ও উদ্ভিদের মধ্যে ক্রিয়া করে, জলজ উদ্ভিদের ভাঙন ধরায়, প্রাণিকোষ ফাটিয়ে দেয়, রক্ত-কোষের বিভাজন ঘটায়। দুই-এক মিনিটের শব্দোত্তর শব্দের প্রয়োগে ছোট মাছ বা ব্যাঙ মারা পড়ে, প্রাণিদেহের, উদাহরণ স্বরূপ ইঁদুরদের, তাপমাত্রা প্রায় 45° সেণ্টিগ্রেড বৃদ্ধি করে। অশ্রাব্য শব্দোত্তর শব্দ, অদৃশ্য অতি বেগুনী রশ্মির মত, চিকিৎসকদের রুগ্ন মানুষদের চিকিৎসার কাজে সাহায্য করছে।

---

১ কোয়ার্জ ক্রিষ্টালে খরচ বেশি হওয়ায় এবং যেহেতু কোয়ার্জ ক্রিষ্টাল অত্যন্ত স্বল্প পরিমাণ শব্দোত্তর শব্দ প্রেরণ করে এই কারণে এই ক্রিষ্টাল প্রধানত গবেষণাগারেই বেশি ব্যবহৃত হয়। ইঞ্জিনীয়াররা কারিগরী ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য বেরিয়াম টিটানেট সিরামিক জাতীয় সিনথেটিক পদার্থের উদ্ভব করেছেন

শব্দোত্তর শব্দ ধাতুবিজ্ঞানে (Metallurgy) ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এর দ্বারা ধাতুর অপবস্তু (Impurities), অভ্যন্তরস্থ বুদ্‌বুদ্‌ ছিদ্র, গহবর ইত্যাদি সনাক্ত করা হয়। শব্দোত্তর শব্দের সাহায্যে ধাতুর দোষ দেখার জন্য ধাতুটাকে তৈলাক্ত করে শব্দোত্তর শব্দ-কম্পনে ধরা হয়। দোষযুক্ত স্থানটি শব্দ ছড়িয়ে দেয় যেন শব্দের ছায়া ফেলে যা তেলের সমতরঙ্গের উপর স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং ছবিতে ধরা যায়।[২]

এমন কি এক মিটারের বেশি পুরু ধাতুদণ্ডের দোষ-সন্ধান, যা 'এক্স-রে'-র প্রবেশাধিকারের বাইরে, তাও এই শব্দোত্তর শব্দের সাহায্যে অনায়াসে করা যায়। এ ছাড়াও এক মিলিমিটার প্রস্থচ্ছেদ বিশিষ্ট অতি ক্ষুদ্র ছিদ্রসম সামান্য ত্রুটিও এই শব্দোত্তর শব্দের সাহায্যে করা যায়। এই শব্দ আয়ত্তে আসার সঙ্গে সঙ্গে আগামী দিনের সম্ভাবনা যে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।[৩]

কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন

সোভিয়েত চলচ্চিত্র 'দি নিউ গ্যালিভার'-এ লিলিপুটেরা খুব তীক্ষ্ণস্বরে কথা বলে তাদের ক্ষুদে গলায় আর বালক গ্যালিভার, পেটিয়া কথা বলে ভরা গলায়। যদিও, ছবিটি তোলার সময় বয়স্ক চিত্র-তারকারাই লিলিপুটদের হয়ে কথা বলেছে এবং প্রকৃত একজন বালকই পেটিয়ার কথা বলেছে। কিভাবে স্বরের এই তীক্ষ্ণতার পরিবর্তন সাধন করা হল? চিত্র-পরিচালক টুস্‌কেচ আমাকে বলেছিলেন যে, চিত্র-তারকারা তাদের কণ্ঠস্বর পরিবর্তনের কোনো চেষ্টাই করেন নি। একটা মূল প্রক্রিয়ায় ঐ পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে যা শব্দের ভৌতিক প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

লিলিপুটদের কণ্ঠস্বরে উচ্চ তীক্ষ্ণতা আনার জন্য এবং গ্যালিভারের কণ্ঠস্বরে ভরাট গলা আনার জন্য, লিলিপুটদের হয়ে অভিনয় করা তারকাদের কথা ধীর চক্রে এবং বালক পেটিয়ার কথা, বিপরীত পক্ষে, দ্রুত চক্রে রেকর্ড করা হয়। শব্দ-চিত্র অবশ্য সাধারণ গতিতেই পরে পুনর্মুদ্রিত হয়। এবার কি হবে তাহলে, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। কম্পন যখন নিবিড় তখনই লিলিপুটদের কণ্ঠস্বর শ্রোতারা শুনল অর্থাৎ যখন তার তীক্ষ্ণতা বেশি, আর বিপরীত পক্ষে সাধারণ গলার চেয়ে নিচে বা নিম্নস্বরে পেটিয়ার গলার স্বর পরিস্ফুটিত হল, ফলে গলার স্বর হল ভরাট। ফলে 'দি নিউ গ্যালিভার'-এ লিলিপুটেরা কথা বলে

---

২ শব্দোত্তর দোষ সনাক্তকরণ প্রক্রিয়া 1928 খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েত বিজ্ঞানী এস. ইয়া. সোকোলভ উদ্ভাবন করেন। আজকে ব্যবহৃত বিশেষ শব্দোত্তর কম্পন সংগ্রাহক যন্ত্র তৈলবিহীন এবং তা প্রক্রিয়াটিকে সহজতর করেছে। —সম্পাদক।

৩ প্রকৃতির রাজ্যেও শব্দোত্তর শব্দ রয়েছে। বাতাসের শব্দে, সমুদ্র-তরঙ্গে এরকম হচ্ছে। প্রজাপতি প্রভৃতি কীট-পতঙ্গ শব্দোত্তর শব্দ গ্রহণ ও প্রেরণ করে। বাদুড়েরা এই শব্দোত্তর শব্দ ওড়ার সময় রাডার-এর মত ব্যবহার করে পথের বাধা বোঝার জন্য ও কাটাবার জন্য।

সাধারণ বয়স্কদের গলার চেয়ে উঁচু গলায় আর বালক গ্যালিভার সাধারণ গলার স্বরের চেয়ে নিচু গলায় কথা বলে।

এইভাবে শব্দগ্রহণের সময় ধীর-গতি প্রক্রিয়ার সাহায্যে শব্দের তারতম্য সাধন করা হয়েছে। গ্রামোফোন রেকর্ড নির্দেশিত সূচকের চেয়ে দ্রুত বা ধীর গতিতে চালিয়ে এই স্বরের পরিবর্তন অনেক সময়ই শোনা যায়।

দিনে দুবার দৈনিক কাগজ পাঠ

যে প্রশ্নটি নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করতে যাচ্ছি প্রথম দৃষ্টিতে মনে হতে পারে তার সঙ্গে শব্দের বিশেষ করে কোনো সম্পর্ক নেই এবং সাধারণভাবে পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গেও কোনো সম্পর্ক নেই। তৎসত্ত্বে আমার ইচ্ছা তোমরা এর প্রতি কর্ণপাত কর, কারণ এটা পরবর্তীকালে আমরা যা নিয়ে আলোচনা করব তা বুঝতে সাহায্য করবে। সম্ভবত তোমরা পূর্বে ঐ একই প্রশ্নের অন্য এক ব্যাখ্যার সম্মুখীন হয়েছ।

প্রশ্নটা এই। প্রতিদিন, দুপুর বেলা, একটা ট্রেন মস্কো থেকে ব্লাডিভস্টক যাচ্ছে। এবং প্রতিদিন, দুপুর বেলায়ই আর একটা ট্রেন ব্লাডিভস্টক ছেড়ে মস্কো যাত্রা করে। ধরা যাক, সমস্ত যাত্রাটা দশ দিনের। এখন প্রশ্ন হল ঃ কতগুলো ট্রেন তুমি পথে দেখবে ব্লাডিভস্টক থেকে মস্কো যেতে? তাড়াহুড়ো করে অধিকাংশ লোকই উত্তর দেবে—দশটি। কিন্তু উত্তরটা ভুল। পথে ব্লাডিভস্টক থেকে তোমার প্রস্থানের পর মস্কো থেকে যে দশটি ট্রেন ছেড়েছে তাদের সাক্ষাৎ করা ছাড়াও, তুমি তোমার প্রস্থানের সময় যে সমস্ত ট্রেন পথে ছিল তাদেরও সাক্ষাৎ করবে। অতএব নির্ভুল উত্তর হবে ঃ কুড়িটা, দশটা নয়।

এবার আর একটু এগিয়ে যাওয়া যাক। প্রত্যেকটি মস্কোর ট্রেনে প্রতিদিনের দৈনিক সংবাদপত্র আছে। মস্কোর সংবাদ সম্বন্ধে উৎসাহী হলে তুমি স্টপে একটা করে টাট্‌কা পত্রিকা কিনবে। তাহলে দশদিনের যাত্রাপথে কটা নতুন সংবাদপত্র তুমি কিনবে? এবার তুমি নিশ্চয়ই ঠিক উত্তর দেবে—কুড়িটা। নতুন যে ট্রেনের সঙ্গেই তোমার সাক্ষাৎ হচ্ছে, প্রত্যেকে একটা করে প্রত্যেক দিনের নতুন সংবাদপত্র আনছে এবং তোমার যেহেতু কুড়িটা ট্রেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হচ্ছে, সেহেতু তুমিও কুড়িটা টাটকা সংবাদপত্র পড়বে। কিন্তু তুমি দশ দিনের যাত্রা করছ, তা হলে তুমি দিনে দুবার টাটকা সংবাদপত্র পড়বে।

বিস্ময়কর বৈপরিত্য? তাই না? বাস্তবে নিজে না পরীক্ষা করে দেখলে, তুমি বোধ হয় এটা বিশ্বাসই করবে না।

ট্রেনের বাঁশীর সমস্যা

তোমার যদি সঙ্গীতের কান ভাল হয়, তুমি হয়ত লক্ষ্য করে থাকবে শব্দের প্রাবল্য (Loudness) নয়, ট্রেনের বাঁশীর শব্দের তীক্ষ্নতা কিভাবে পরিবর্তিত

হচ্ছে একটা অগ্রগামী ট্রেন যখন চলে যায়। যখন দুটো ট্রেন কাছাকাছি আসছে, শব্দের তীক্ষ্ণতা ট্রেন দুটি সাক্ষাৎ করার আগে, এবং চলে যাবার পরের চেয়ে লক্ষণীয়ভাবে বেশি হয়। যদি দুটি ট্রেনই ঘণ্টায় 50 কি.মি. বেগে যায় তাহলে শব্দের তীক্ষ্ণতার পার্থক্য প্রায় পূর্ণ এক সুরে পৌঁছায়।

কেন এমনটি ঘটে? উত্তরটা আবিষ্কার করা মোটেই কঠিন না যদি জানা থাকে যে, শব্দের তীক্ষ্ণতা নির্ভর করে শব্দের প্রতি সেকেণ্ডের কম্পাঙ্কের উপর এবং যদি বুঝতে পার এর সঙ্গে পূর্বের দৈনিকের প্রশ্নটির সামঞ্জস্য আছে। অগ্রগামী ট্রেনটির বাঁশী একটা এবং একই নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের শব্দ দেয়। তোমার কান, অবশ্য, বিভিন্ন সংখ্যার কম্পাঙ্ক লাভ করবে যা নির্ভর করবে তুমি অগ্রবর্তী হচ্ছ, না স্থির দাঁড়িয়ে আছ, না পশ্চাদগামী হচ্ছ।

মস্কোয় ট্রেনে যাত্রার সময় যেমন তুমি দিনে দুবার দৈনিক কাগজ পড়েছ ঠিক সেই রকমভাবেই শব্দের উৎসের অগ্রবর্তী হবার সময় তুমি গাড়ির বাঁশীর শব্দের সাধারণ কম্পাঙ্ক অপেক্ষা অধিকতর কম্পাঙ্কের সম্মুখীন হবে। এটা অবশ্য কোনো শ্রুতি-বিভ্রম নয়, তোমার কানই অধিক সংখ্যক কম্পন গ্রহণ করছে এবং তুমি প্রত্যক্ষভাবে উচ্চতর তীক্ষ্ণতার স্বর শুনছ। তুমি যত সরে যাবে, তত কম সংখ্যক কম্পন পাবে এবং অপেক্ষাকৃত কম তীক্ষ্ণ স্বর শুনবে।

আমার এই ব্যাখ্যা যদি তোমাদের মনঃপূত না হয় তাহলে ট্রেনের বাঁশীর শব্দ-তরঙ্গ কিভাবে যাচ্ছে মনের চোখে তা এঁকে দেখতে পার। 154 নং চিত্রের স্থির ট্রেনটা কল্পনা কর। এর বাঁশী তরঙ্গমালা প্রেরণ করছে। সরলতার খাতিরে আমরা চার রকম তরঙ্গমালার উল্লেখ করব (উপরের তরঙ্গ-রেখা দেখ)। স্থির অবস্থায় শব্দ-তরঙ্গ নির্দিষ্ট সময় অন্তর একই পথ বা দূরত্ব যাচ্ছে। *O* তরঙ্গ *A* ও *B* দর্শকের কাছে একই সময় পৌঁছবে। তারপর *A* এবং *B* উভয়েই 1, 2, 3 ইত্যাদি তরঙ্গসমূহ একই সঙ্গে শুনবে। সমসংখ্যক তরঙ্গ উভয় দর্শকের কানেই লাগবে প্রতি সেকেণ্ডে। এই কারণেই দুজনে একই স্বর শোনে।

কিন্তু এটা পৃথক হবে যদি বাঁশী দিতে দিতে যাওয়া ট্রেনটি *B* থেকে *A*-র দিকে যায় (চিত্রে নিচের ঢেউ খেলান রেখা)। মনে করা যাক, কোনো নির্দিষ্ট মুহূর্তে বাঁশী C' বিন্দুতে আছে। এবং 4টি তরঙ্গ প্রেরণ করতে করতে বাঁশী *D* বিন্দুতে পৌঁছেছে। এখন শব্দ-তরঙ্গের তারতম্য তুলনা করা যাক। C' বিন্দু থেকে *O* তরঙ্গ যুগপৎ A' ও B' দর্শকদ্বয়ের কাছে পৌঁছবে। কিন্তু *D* বিন্দু থেকে নির্গত চতুর্থ তরঙ্গ যুগপৎ তাদের কাছে পৌঁছবে, যেহেতু DA' দূরত্ব DB' দূরত্বের চেয়ে কম; ফলে তরঙ্গ B'-এর আগে A'-এ পৌঁছবে। মধ্যবর্তী 1 ও 2 তরঙ্গও A'-র পরে B'-এ পৌঁছবে, কিন্তু এক্ষেত্রে সময়ের অন্তর হবে কম। ফলে A', B'-এর চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি শব্দ-তরঙ্গ পাবে এবং

বেশি তীক্ষ্ম স্বর শুনবে। একই সময়ে, চিত্রে যেমন পরিষ্কারভাবে দেখান হয়েছে, *A'* দিকে গমনশীল তরঙ্গের দৈর্ঘ্য, বিপরীত *B'*-এর দিকে গমনশীল তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের চেয়ে ছোট হবে।

চিত্র 154



ট্রেনের বাঁশীর সমস্যা। **A—B :** স্থিতাবস্থায় কোন ট্রেন থেকে নির্গত শব্দ তরঙ্গ। **A'—B' :** চলমান অবস্থায় কোন ট্রেন থেকে নির্গত শব্দ তরঙ্গ।

(চিত্রের তরঙ্গায়িত রেখাগুলি শব্দ-তরঙ্গের আকার চিত্রিত করে না। বাতাসের কণা শব্দের দিকে অনুদৈর্ঘ্যভাবে কম্পন করে এবং অনুপ্রস্থভাবে করে না। তরঙ্গগুলো লৈখিক চিত্র দেখানোর জন্য অনুপ্রস্থভাবে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি তরঙ্গশীর্ষ সর্বোচ্চ অনুদৈর্ঘ্য কম্পন বোঝাচ্ছে।)

ডপ্‌লার ক্রিয়া (The Doppler effect)

উপরের ঐ ক্রিয়া পদার্থবিদ ডপ্‌লার আবিষ্কার করেন এবং তদবধি তাঁর নামানুসারে 'ডপ্‌লার প্রক্রিয়া' নামে খ্যাত। আলোকের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ক্রিয়া দেখা যায়, যেহেতু আলোক তরঙ্গের আকারে যায়। আলোকের ক্ষেত্রে বর্ধমান কম্পাঙ্ক চোখে বর্ণের পরিবর্তন ঘটায়, আর শব্দের ক্ষেত্রে বর্ধমান কম্পাঙ্ক তীক্ষ্মতার পরিবর্তন হিসেবে শ্রুত হয়।

এই ডপ্‌লার ক্রিয়া, এটা যে নামে পরিচিত, জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের শুধু যে কোনো নক্ষত্র 'আমাদের কাছে আসছে, না দূরে সরে যাচ্ছে'—তাই জানতে সাহায্য করে তাই নয়, অবস্থানের এই পরিবর্তনের গতিবেগ জানাতেও সহায়তা করে। এই ক্ষেত্রে বর্ণালীর উল্লম্ব অদীপ্ত রেখার পার্শ্ব-পরিবর্তনই আমাদের সাহায্য করে। জ্যোতিষ্কলোকের কোনো বস্তুর বর্ণালীর পরিবর্তনের দিক ও পরিমাণ ভালোভাবে নিরীক্ষণ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অভাবনীয় সব আবিষ্কার

করতে সমর্থ হয়েছেন। এইভাবে ডপ্‌লার ক্রিয়া থেকে আমরা জানতে পারি যে, সীরিয়াসের উজ্জ্বল নক্ষত্র প্রতি সেকেণ্ডে 75 কি.মি. দূরে সরে যাচ্ছে। এ সব বস্তু আমাদের থেকে এত দূরে যে, ডপ্‌লার প্রক্রিয়া ছাড়া, এরা কোটি কোটি কিলোমিটার সরে গেলেও এদের ঔজ্জ্বল্যের তেমন কিছুই পরিবর্তন না হওয়ায়, এদের সরণ আমরা ধরতে পারতাম না।

এই ঘটনাই আজ পদার্থবিদ্যাকে সর্বব্যাপী 'সর্বগ্রাহী' বিজ্ঞানে পরিণত করেছে। কয়েক মিটার দীর্ঘ 'শব্দ' তরঙ্গের নিয়ম জেনে, পদার্থবিজ্ঞান সেটাকে অসীম ক্ষুদ্র 'আলোক' তরঙ্গের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে, যা মাত্র $\frac{1}{10}$ মাইক্রন দীর্ঘ এবং এইভাবে বহুদূরের মহাশূন্যের অতিকায় নক্ষত্রের দ্রুতগতি নির্ণয় করতে সক্ষম হয়।

জরিমানার ঘটনা

(1842 খ্রীষ্টাব্দে) ডপলার যখন সর্বপ্রথম সিদ্ধান্তে এলেন যে, শব্দ ও আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য পরিবর্তিত হয় নিঃসারণ উৎস (Source of emission) নিকটবর্তী বা দূরবর্তী হলে, তিনি দৃঢ়ভাবে অনুমান করেন যে, এই কারণেই নক্ষত্রদের বর্ণ বর্ণময় দেখায়। সকল নক্ষত্রই প্রকৃতপক্ষে সাদা কিন্তু আমাদের সাপেক্ষে এদের দ্রুত গতির জন্যই এদের রঙীন দেখায়। দ্রুত অগ্রসরমান সাদা নক্ষত্র আমাদের কাছে ক্ষুদ্রতর আলোক-তরঙ্গ পাঠায় যা নীল, সবুজ বা বেগুনী বর্ণের আভাযুক্ত। বিপরীত পক্ষে, দ্রুত পশ্চাদগামী সাদা নক্ষত্র হলুদ বা লাল দেখায়।

নিঃসন্দেহে এটা একটা মৌলিক চিন্তাধারা কিন্তু প্রশ্নাতীতভাবে ভুল! তা যদি হত তা হলে নক্ষত্রদের লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার বেগে ধাবমান হতে হত—এবং তা হলেও লাভ হত না, কারণ ইতিমধ্যে সাদা অগ্রসরমান নক্ষত্র বেগুনী হত, সবুজ নীল হত আর বেগুনী হয়ে উঠত অতি-বেগুনী বা লাল হয়ে উঠত অতি-লাল। সংক্ষেপে, সাদা আলোর সেই আগের সব কটি বিভিন্ন রঙই থাকত, এবং বর্ণালীর সকল রঙের পরিবর্তন সত্ত্বেও আমরা সাদা নক্ষত্রকে সাদাই দেখতাম, সাধারণ বর্ণের কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করতাম না।

নক্ষত্রের বর্ণালীর অদীপ্ত রেখার পরিবর্তন, দ্রষ্টার নিকটবর্তী হলে বা দূরে সরে গেলে, সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। সূক্ষ্ম সংবেদনশীল যন্ত্রপাতি তাদের সনাক্ত করতে পারে এবং দৃষ্টিরেখার বেগ নির্ণয়ে আমাদের সাহায্য করে। ভালো বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্র (Spectroscope) সেকেণ্ডে 1 কিলোমিটার বেগও ধরতে পারে।

বিখ্যাত পদার্থবিদ রবার্ট উড ট্রাফিকের লাল নিশানা অতিক্রম করার ফলে পুলিসের জরিমানার কবলে পড়ার সময় ডপ্‌লারের ভুলটা স্মরণ করেন।

গল্পটা এই রকম ঃ উড আইন ও শৃঙ্খলার অভিভাবককে নিশ্চিত করেন যে, খুব দ্রুত গাড়ি চালানোর সময় লাল ট্রাফিক আলোকে সবুজ দেখাবে। পুলিশের যদি পদার্থবিদ্যার সামান্য জ্ঞান থাকত, তাহলে সে হয়তো উড্‌কে জানাতো লাল আলোর পরিবর্তে সবুজ আলো দেখতে হলে তাঁর গাড়িটাকে অন্তত পক্ষে ঘণ্টায় 13·5 কোটি কিলোমিটার বেগে ছুটতে হবে—সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য গতি।

এইভাবে এটা গণনা করা হয়। ধরা যাক l হল ট্রাফিক লাইট থেকে উৎসারিত আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য, l' উড কর্তৃক লব্ধ গাড়িতে যে আলোক-তরঙ্গ আসছে তার দৈর্ঘ্য, v গাড়ির গতিবেগ এবং c আলোকের বেগ। তাহলে সমীকরণটি দাঁড়ায় ঃ $\frac{l}{l'} = 1 + \frac{v}{c}$। ক্ষুদ্রতম লাল আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 0·0063 মি.মি. জেনে এবং দীর্ঘতম সবুজ আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 0·0056 মি.মি. জেনে এবং আলোকের গতিবেগ সেকেণ্ডে 300,C00 কি.মি. ধরে, আমরা পাই $\frac{0{\cdot}0063}{0{\cdot}0056} = 1 + \frac{v}{300{,}000}$ অর্থাৎ গাড়ীর গতিবেগ $v = \frac{300{,}000}{8}$ = সেকেণ্ডে 37,500 কি.মি. বা ঘণ্টায় 13·5 কোটি কি.মি.। এই গতিবেগে, 1 ঘণ্টার মত সময়ে উড পৃথিবীর থেকে সূর্যের দূরত্ব অপেক্ষা নিজের ও ট্রাফিক পুলিসের মধ্যে অধিকতর দূরত্ব যেত। তৎসত্ত্বেও, পদার্থবিদের জরিমানা হয়ে গেল কেবল জোরে গাড়ি চালাবার অপরাধে।

শব্দের গতিতে

একটা ব্যাণ্ড পার্টির কাছ থেকে শব্দের গতিতে সরে গেলে তুমি কি শুনবে? স্বভাবতই অর্কেস্ট্রা যে স্বর তোমার ঠিক প্রস্থানের সময় শুরু করেছিল তুমি অবিকল সেই স্বরই শুনবে আগের ট্রেনের উদাহরণের স্টেশনে একই দৈনিক কেনার মত।

কিন্তু ভুল কথা। যেহেতু তুমি শব্দের গতিবেগে সরে যাচ্ছ, ব্যাণ্ড যে শব্দ-তরঙ্গ পাঠাবে তা তোমার সাপেক্ষে স্থির অবস্থায় থাকবে এবং তোমার কর্ণকুহরে মোটেই প্রবেশ করবে না। তুমি আদতে কিছুই শুনবে না এবং মনে করবে ব্যাণ্ডের বাজনা থেমে গেছে।

আমাদের তুলনাটা তা হলে ভুল উত্তর দিল কেন? কারণ এই যে, আমরা সাদৃশ্যটা ভুল প্রয়োগ করেছি। প্রকৃতপক্ষে যাত্রী ভাবতে পারত, যদি সে ভুলে যেত যে সে ভ্রমণ করছে, যে মস্কো ত্যাগ করে যাবার পর, নতুন কোনো দৈনিক সংবাদপত্র বেড়োয় নি, যেহেতু সে সমস্ত রাস্তায় একটিই সংবাদপত্র দেখছে। তার দিক থেকে তাহলে তার যাত্রার পর সংবাদপত্রের অফিস বন্ধ আছে—

ঠিক যেমন শব্দের গতিতে গেলে ব্যাঙের আওয়াজ তার কাছে বন্ধ হয়ে গেছে মনে হত।

খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার যে, বিজ্ঞানীরাও ব্যাপারটা অনেক সময় গুলিয়ে ফেলেন, যদিও ঘটনাটা মোটেই অত গোলমেলে নয়। আমার মনে পড়ে স্কুলে থাকা কালীন আমি এই সমাধান আমার এক শিক্ষককে জানাই, যিনি ওটা মানতে চান নি এবং দাবি করেন যে, আমরা যখন শব্দের গতিতে যাই তখন একই স্বর বরাবর শুনব। তিনি নিম্নলিখিত যুক্তি খাড়া করেন:

"ধরা যাক, নির্দিষ্ট তীক্ষ্ণতা বিশিষ্ট একটা স্বর নিয়েছ।—তিনি আমায় লিখলেন। "এটার সর্বদাই সেই শব্দই হবে এবং সেই শব্দই থাকবে। ধরা যাক, এক সারি শ্রোতা শূন্যে এই শব্দ পর্যায়ক্রমে শুনবে এবং যুক্তির খাতিরে ধরা যাক, একই তীক্ষ্ণতায় শুনবে। আমরা তাহলে কেন শুনব না, যদি আমরাও শব্দের গতিতেই এগোই এবং আরও মনে করি, ঐ শ্রোতাদের পাশেই যাই?"

একই ভাবে তিনি যুক্তি দেন যে, আকাশের বিদ্যুৎ দেখছে এমন কোনো দ্রষ্টা যদি বিদ্যুৎ থেকে আলোকের গতিতে সরে যায় তাহলে সে সর্বদাই বিদ্যুৎ-চমক দেখবে।

"মনে কর" তিনি লিখেছেন, "শূন্যে অসীম এক সারি চোখ রয়েছে। প্রত্যেকটি পর পর চোখ বিদ্যুৎ চমক আনুপূর্বিকভাবে দেখবে। এখন ধরা যাক, তুমিও পর পর প্রত্যেক সারিবদ্ধ চোখ দর্শন করছ। স্বভাবতই তুমিও তাহলে সব সময়ই বিদ্যুৎ চমক লক্ষ্য করবে।"

বলাই বাহুল্য, কোন যুক্তিই ঠিক নয়। উপরের দেওয়া শর্তে তুমি স্বরও শুনবে না, বিদ্যুৎ চমকও দেখবে না। একটু আগের সমীকরণ থেকেই দেখা যায় যে, $v = -c$ হলে, l'-এর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অসীম হবে। অর্থাৎ বলা যায় ওটা ওখানে নয়।

* * *

আমরা 'পদার্থবিদ্যার মজার কথা' উপসংহারে এসে দাঁড়িয়েছি। যদি তোমরা এটা পড়ে থাক, তোমরা বোধ করবে যে, এই অসীম জ্ঞানরাজ্যের যে মুষ্টিমেয় ঘটনা এখানে বিধৃত হয়েছে তার আরও অনেক কিছু তোমরা জানতে চাও। তাহলেই আমার প্রয়াস সার্থক হয়েছে বলে জানব এবং তোমাদের জ্ঞানের তৃষ্ণায় সন্তুষ্ট হয়ে আরও লিখব।।

নিরানব্বইটি প্রশ্ন

১। বেলুন থেকে পৃথিবী কিভাবে ঘুরছে তা কি দেখা যায় ?

২। উড়োজাহাজ থেকে কোনো ভার কি লম্বভাবে পড়ে ?

৩। সবচেয়ে নিরাপদে চলন্ত ট্রেন থেকে কিভাবে নামা যায় ?

৪। আইসব্রেকার যখন বরফের উপর দিয়ে কর্ষণ করে, তখন এর প্রযুক্ত বল কি বরফের রোধের সমান ?

৫। রকেট উপরে ওঠে কেন ? এবং সেটা কি শূন্যে যেতে পারবে ?

৬। রকেটের মত কি কোনো প্রাণী যেতে পারে ?

৭। বস্তুসমূহের বিভিন্ন দিকে বল যদি প্রযুক্ত হয় তাহলে কি সবসময়ই বস্তুটিকে নড়াতে তারা অসমর্থ হবে ?

৮। ধনুকাকৃতির ছাদ সমতল ছাদের চেয়ে শক্ত বা পাকাপোক্ত কেন ?

৯। বাতাস কিভাবে yacht-কে যেতে সাহায্য করে ?

১০। আলম্বে একটা অবস্থান খুঁজে পেলেও আর্কিমিডিস কি কখনো পৃথিবীকে তুলে ধরতে পেরেছিলেন ?

১১। গিঁট কিভাবে সেলাইকে পাকাপোক্ত করে ?

১২। ঘর্ষণ ছাড়া গিঁট কি কোনো সাহায্য করে ?

১৩। ঘর্ষণ না থাকলে আমাদের কি উপকার হত এবং আমরা কি হারাতাম ?

১৪। চেয়ারের পিঠের উপর একটা ঝাঁটা সাম্যাবস্থায় থাকলে ঝাঁটার কোন্ অংশটা বেশি ভারী হবে—ছোটটা না বড়টা ?

১৫। ঘুরন্ত টিটোটাম পড়ে যায় না কেন ?

১৬। জলপূর্ণ উল্টানো গ্লাস থেকে জল পড়ে যায় না কেন ?

১৭। মুক্ত কোনো গোলক নততলে কখন গড়াবে না ?

১৮। অভিকর্ষ কোথায় বেশি—লণ্ডনে, না কায়রোয় ?

১৯। ঘরে আমরা বস্তুসমূহের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া লক্ষ্য করি না কেন ?

২০। চন্দ্রে তুমি কতখানি লাফাতে পারবে ?

২১। সেকেণ্ডে ৯০০ কি.মি. বেগে ঊর্ধ্বে উল্লম্বভাবে উৎক্ষিপ্ত বুলেট চন্দ্রে কতখানি যাবে ?

২২। পৃথিবীর কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে ওর ব্যাস বরাবর কোনো চোঙের মধ্যে কোনো ভার নিক্ষেপ করলে তা কি বাতাসের প্রতিরোধের অনুপস্থিতিতে থেমে যাবে ?

২৩। পর্বতের মধ্য দিয়ে বৃষ্টির দ্বারা যাতে প্লাবিত না হয় এমন সুড়ঙ্গ কিভাবে খনন করা যায়?

২৪। শূন্যে কি প্রচণ্ড বেগে কোনো কিছু নিক্ষেপ করা যায় যা আর কখনো ফিরে আসবে না?

২৫। সাঁতার জানে না-এমন মানুষ কোথায় ডোবে না?

২৬। বরফ-ছেদক কিভাবে বরফের ভেতর দিয়ে যায়?

২৭। ডোবা-জাহাজ কি সাগরের তলায় পেঁছায়?

২৮। নিমজ্জিত জাহাজের উত্তোলন পদার্থবিদ্যার কোন্ নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত?

২৯। চৌবাচ্চার সমস্যাটা কি এবং গণিতের পুস্তক কি নির্ভুল সমাধান দেয়?

৩০। একই রকম ধারায় কি পাত্রের জল বার করা যায়?

৩১। ৮টি ঘোড়ার পরিবর্তে ৮টি হাতি কি ম্যাগডেবার্গের অর্ধগোলক দুটি বিচ্ছিন্ন করতে পারত? (একটি হাতি, একটি ঘোড়ার তুলনায় প্রায় পাঁচ গুণ শক্তিশালী।)

৩২। 'অ্যাটোমাইসার'-এর কার্যবিধি কি?

৩৩। সমান্তরাল পথে গমনশীল জাহাজ পরস্পরকে আকর্ষণ করে কেন?

৩৪। মাছের পটকার কাজ কি?

৩৫। পদার্থবিদ্যায় দুটি বিভিন্ন তরল পদার্থের প্রবাহ বলতে কি বোঝায়?

৩৬। চিমনী থেকে নির্গত ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকায় কেন?

৩৭। বাতাসে পতাকা পত্ পত্ করে কেন?

৩৮। মরুভূমির বালিতে ঢেউ খেলে কেন?

৩৯। বাতাসের চাপ এক-সহস্রাংশ কমানোর জন্য মানুষকে কত উপরে উঠতে হবে?

৪০। ৫০০ অ্যাটমস্ফিয়ার চাপের বাতাসে কি মেরিওটির নিয়ম প্রযোজ্য হবে?

৪১। বাতাসহীন আবহাওয়ার তুলনায় ঝোড়ো আবহাওয়ায় তাপমানযন্ত্র কি অধিক উষ্ণতা প্রদর্শন করবে?

৪২। ঝোড়ো আবহাওয়ার তুষারপাত শান্ত আবহাওয়ার তুষারপাতের চেয়ে নিকৃষ্টতর কেন?

৪৩। উষ্ণ আবহাওয়ায় বাতাস কি সব সময় আমাদের উজ্জীবিত করে?

৪৪। 'কুলার'-এর কার্যকারিতা কিসের উপর নির্ভর করে?

৪৫। বরফ ছাড়া কি 'কুলার' তৈরি করা যায়?

৪৬। আমরা কি 100° সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতা সহ্য করতে পারি?

৪৭। মধ্য এশিয়ার 36° সেণ্টিগ্রেড উষ্ণপ্রবাহ না লেনিনগ্রাডের 24° সেণ্টিগ্রেড উষ্ণপ্রবাহ—কোন্‌টা সহ্য করা অধিকতর সহজ?

৪৮। প্যারাফিন বাতির কাচের কাজ কি?

৪৯। দহনের ফলে সৃষ্ট বস্তু প্যারাফিন বাতির বা মোমবাতির শিখা নেভায় না কেন?

৫০। অভিকর্ষ না থাকলে অগ্নিশিখা কিভাবে জ্বলত?

৫১। যদি অভিকর্ষ না থাকে প্রাইমাস স্টোভে জল কিভাবে গরম হবে?

৫২। জল আগুন নেভায় কেন?

৫৩। আগুন দিয়ে আগুন নেভানো যায় কিভাবে?

৫৪। ফুটন্ত জলে উত্তপ্ত কোনো পাত্রে বিশুদ্ধ জল কি কখনো ফুটবে?

৫৫। জল ও বরফের মিশ্রণে নিমজ্জিত কোনো বোতলে জল কি কখনো জমবে?

৫৬। ঘরের তাপমাত্রায় আমরা কি জল ফোটাতে পারি?

৫৭। থার্মোমিটার বা তাপমান যন্ত্র ব্যবহার করে আমরা কিভাবে বাতাসের চাপ পরিমাপ করতে পারি?

৫৮। উত্তপ্ত বরফ বলে কিছু আছে কি?

৫৯। প্রাকৃতিক না মনুষ্য-কৃত—কোন্‌ চুম্বক বেশি শক্তিশালী?

৬০। লোহা ছাড়া অন্য কোন্‌ কোন্‌ ধাতু চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয়?

৬১। শক্তিশালী চুম্বক দ্বারা বিকর্ষিত হবে এমন কোনো ধাতু আছে কি?

৬২। তরল বা গ্যাসীয় পদার্থকে কি চুম্বক প্রভাবিত করবে?

৬৩। পৃথিবীর কোন্‌স্থানে চুম্বক শলাকা উভয় প্রান্ত দিয়েই উত্তর দিক নির্দেশ করবে?

৬৪। লোহা চুম্বককে না চুম্বক লোহাকে বেশি জোরে আকর্ষণ করে?

৬৫। কোন্‌ ইন্দ্রিয় চুম্বক বল দ্বারা অভিভূত হয়?

৬৬। তড়িৎ-চুম্বকের ক্রেন কি গলিত ধাতু উত্তোলন করতে পারে?

৬৭। শক্তিশালী চুম্বক সোনার ঘড়ির পক্ষে বিপজ্জনক কেন?

৬৮। রেডিয়াম-ঘড়ি কি?

৬৯। তেজস্ক্রিয় ক্ষয় থেকে আমরা কিভাবে পৃথিবীর ও খনিজ পদার্থের বয়স নির্ধারণ করতে পারি?

৭০। তড়িতাহত না হয়ে পাখী কেন বৈদ্যুতিক তারে বসে থাকতে পারে?

৭১। বিদ্যুতের চমকানি কতক্ষণ স্থায়ী হয়?

৭২। সাতটি প্রতিফলন পাবার জন্য আমরা দুটি দর্পণকে কত কোণে স্থাপন করব?

৭৩। সৌর-শক্তি চালিত মটর ও সৌর-শক্তি চালিত হিটার-এর মধ্যে প্রভেদ কি?

৭৪। 'হেলিও-ইঞ্জিনীয়ারিং' বলতে কি বোঝ?

৭৫। মাছের চোখের স্ফটিকময় পর্দা গোলকাকার কেন?

৭৬। জলে মাথা ডুবিয়ে তুমি কি বই পড়তে পারবে?

৭৭। হেলমেট পরিহিত ডুবুরী না গগ্‌লস-বিহীন লোক—কে জলের নিচে অধিকতর ভালো দেখতে পাবে?

৭৮। উভাবতল (Bi-concave) লেন্সকে কি বিবর্ধক হিসেবে তৈরি করা যায়? বিপরীতক্রমে বিবর্ধক কাচকে কি উভাবতল লেন্সে পরিণত করা যায়?

৭৯। পুকুরের তল চোখে উপরে আছে বলে মনে হয় কেন?

৮০। সংকট কোণ কি?

৮১। পূর্ণ প্রতিফলন কি?

৮২। মাছের রুপালি আঁশ মাছকে কি কোনো প্রকারে সাহায্য করে?

৮৩। অন্ধ-বিন্দু কি এবং আমরা কিভাবে ওটা দেখতে পারি?

৮৪। দৃষ্টিকোণ কি?

৮৫। পূর্ণচন্দ্রকে ঢাকতে হলে আমরা ছয় পেনি মুদ্রাকে কতদূরে ধারণ করব?

৮৬। শীর্ষবিন্দু থেকে 10 মিটার দূরে 1 মিনিট কোণের বাহুদুটির মধ্যে দূরত্ব কত?

৮৭। বৃহস্পতি গ্রহের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় দশগুণ। বৃহস্পতি গ্রহকে যখন 40 সেকেন্ড কোণে দেখা যায় তখন বৃহস্পতি পৃথিবী থেকে কত দূরে?

৮৮। "অণুবীক্ষণ যন্ত্র কোনো বস্তুকে 300 গুণ বড় করে তোলে" বা "দূরবীক্ষণ যন্ত্র বস্তুকে 500 গুণ নিকটবর্তী করে তোলে"—বলতে কি বোঝায়?

৮৯। মটরগাড়ির চাকা পর্দায় প্রায়ই উল্টো দিকে ঘুরছে বলে মনে হয় কেন?

৯০। দ্রুত ঘূর্ণায়মান কোনো বস্তুকে চোখে স্থির বলে দেখতে পারি কি?

৯১। খরগোস কি মাথা না ঘুরিয়ে ওর চারপাশে কি ঘটছে দেখতে পায়?

৯২। বাতি নেভালে সব বিড়ালই ধূসর বর্ণের—কথাটা কি সত্য ?
৯৩। কোন্‌টা বেশি বিস্তৃত হয়—বেতার সংকেত না বাতাসে শব্দ ?
৯৪। কোন্‌টা বেশি দ্রুতগামী—বন্দুকের গুলি না গুলির শব্দ ?
৯৫। কোন্ শব্দ-স্পন্দন আমরা শুনতে পাই না ?
৯৬। ইঞ্জিনীয়াররা 'শব্দহীন শব্দ'কে কোন্ ব্যবহারে লাগিয়েছেন ?
৯৭। 'শব্দময় মেঘ' কি ?
৯৮। অগ্রবর্তী ইঞ্জিনের বাঁশীর তীক্ষ্ণতা কিভাবে পরিবর্তিত হয় ?
৯৯। শব্দের গতিতে বাদ্য-দল দূরে সরে গেলে আমরা কি শুনব ?

পাঠকের প্রতি

'মির পাবলিশার্স' এই গ্রন্থটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ এবং পরিকল্পনার উপর আপনার সমালোচনা কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করবে। গ্রন্থটি সম্পর্কে অন্য কোনো প্রকার পরামর্শও সাদরে গৃহীত হবে।

আমাদের ঠিকানা: মির পাবলিশার্স, ২, পার্ভিরিজস্কি পেরেউলোক, মস্কো, ইউ. এস্. এস্. আর.।

শীঘ্রই বেরুচ্ছে

মির প্রকাশনের নতুন বই

আ. কিতাইগারোদস্কি

'সকলের জন্য পদার্থবিজ্ঞান'
(৩য় ও ৪র্থ খণ্ড)

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

USSR, 129820, MOSCOW, I-110,
GSP, PERVY RIZHSKY PEREULOK, 2.
MIR PUBLISHERS

FOR ACQUIRING MIR BOOKS, PLEASE CONTACT

MANISHA GRANTHALAYA (P) LTD.
4|3B, BANKIM CHATTERJEE STREET.
CALCUTTA 700 006